পঙ্ক-তিলক

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
৯০/২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

দেড়টাকা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, বি-এ
পক্ষে
রায় এম সি সরকার বাহাদুর এণ্ড সন্স
পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা
৯০/২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ ১০০০
১৩২৫ মাঘ

মুদ্রণকার
শ্রীবিনোদবিহারী দে
দি মডার্ণ প্রিন্টিং হাউস
২৬ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রসিদ্ধ চিত্রকর স্নেহভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বি-এস্‌সি এই এর মলাটের ছবির পরিকল্পনা ও চিত্র করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-শে বদ্ধ করিয়াছেন। মলাটের পরিকল্পনায় চিত্রকর আখ্যায়িকার কথাটি পরিস্ফুট করিয়াছেন—পঙ্কজ জীবনের সার্থকতা খুঁজিতে নাড় হইতে মাথা তুলিতেই তাকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য চন্দ্র সাধনা করিল, উজ্জ্বল নক্ষত্র স্তুতি করিল, কিন্তু শশাঙ্ক ও নক্ষত্রকে কাটাইয়া পঙ্কজ সূর্য্যের কাছে আপনাকে দান করিয়া জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিল।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট গানগুলির অধিকাংশই প্রাচীন বাউলদের, কটি মীরাবাঈর, এবং সেগুলি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতী

সতীলোকে বসি আছে কত পতিব্রতা,
পুরাণে উজ্জ্বল আছে যাঁহাদের কথা।
আরো আছে শত লক্ষ অজ্ঞাত-নামিনী,
খ্যাতিহীনা কীর্ত্তিহীনা কত না কামিনী :
কেহ ছিল রাজসৌধে, কেহ পর্ণঘরে,
কেহ ছিল সোহাগিনী, কেহ অনাদরে :
শুধু প্রীতি ঢালি দিয়া মুছি লয়ে নাম,
চলিয়া এসেছে তারা ছাড়ি মর্ত্তধাম।
তারি মাঝে বসি আছে পতিতা রমণী,
মর্ত্ত্যে কলঙ্কিনী, স্বর্গে সতী-শিরোমণি।
হেরি তারে সতীগর্ব্বে গরবিনী যত,
সাধ্বীগণ লাজে শির করে অবনত।
তুমি কি জানিবে বার্ত্তা, অন্তর্যামী যিনি
তিনিই জানেন তার সতীত্ব-কাহিনী।

(চৈতালী) —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁরা প্রণয়গর্ব্বে নিন্দাপঙ্কের তিলক সগৌরবে ধারণ করেন
সেইসব সচেতন শক্তিমতী সতীদিগকে
সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত এই সামান্য পুস্তক উৎসর্গ করিলাম

এই লেখকের লেখা

উপন্যাস

১। হেরফের	...	১৸৹
২। স্রোতের ফুল	...	২৲
৩। পরগাছা	...	১৷৹
৪। দুই তার	..	১৷৷৹
৫। আগুনের ফুল্‌কি	...	১৲
৬। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী		৸৹
৭। চোরকাঁটা	...	(যন্ত্রস্থ)

ছোটগল্প

১। চাঁদমালা	...	১৲
২। সওগাত	...	৷৷৹
৩। ধূপছায়া	...	৷৷৹
৪। মণিমঞ্জীর	...	৷৷৹
৫। কনকচুর	...	৷৷৹
৬। পুষ্পপাত্র	} ছাপা নাই	
৭। বরণডালা		

শিশুপাঠ্য

১। ভাতের জন্মকথা (পদ্য, সচিত্র)	...	৷৷৹
২। রবিন্‌সন ক্রুশো (সচিত্র)	..	১৷৹
৩। ঈশপের গল্প (সচিত্র)	... ...	১৲
৪। পারস্য উপন্যাস (সচিত্র)	... ...	৸৹
৫। বিষ্ণুপুরাণ (সচিত্র)	... ...	৷৷৵৹
৬। মহাভারত (কাশীরাম দাসের, পদ্য, সচিত্র)		৩৷৷৹
৭। কাদম্বরী (সচিত্র)	... ...	৷৷৵৹
৮। রত্নাবলী	... .	৷৵৹
৯। রাবেয়া	... ...	৷৹

পঙ্ক-তিলক

এক

গোবিন্দ মেসে থাকিয়া বি-এ পড়িত। গোবিন্দর গ্রামেরই দুজন
ল, মন্মথ আর হারাধন, সেই মেসে থাকিয়া ফার্ষ্ট আর্ট্স্ পড়িত।
বিন্দর চেয়ে তারা বয়সে বড় হইলেও বারবার ফেল হইয়া হইয়া
না গোবিন্দর চেয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছিল; তাদের গাঁয়ের গবাটা তাদের
নে ফেলিয়া অনায়াসে এবার ডিগ্রি লইয়া যাইবে, এই ঈর্ষাতে তারা
বিন্দকে সুনজরে দেখিত না।

একদিন সকাল বেলা সকলে খাইতে বসিয়াছে। হারাধন হাঁকিল—
কুর আর-একটু ডাল দাও।

ঝি বলিল—ঠাকুর নেই বাবু, এখুনি আস্ছে।

গোবিন্দ বলিল—তুমিই ডাল এনে দাও না ঝি।

ঝি অবাক্ হইয়া গোবিন্দর মুখের দিকে চাহিয়া ঠাট্টা মনে করিয়া
সিল। মন্মথ আর হারাধনও মনে করিল ঠাট্টা, তারাও হাসিতে
গিল।

গোবিন্দ আবার বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে ঝি? হারাধন-বাবুকে একটু
ল দাও, আর আমায় চারটি ভাত দাও এনে। যাও……

মন্মথ এবার চটিয়া বলিয়া উঠিল—দেখ গোবিন্দ, তোমার ঠাট্টা-

গুলোও ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। কোনো লোক যদি শোনে ভাববে সত্যিই আমরা বুঝি ঝিএর ছোঁয়া খাই।

গোবিন্দ সহজ ভাবেই বলিল—খাওই ত তোমরা। যে কাজ করো তা স্বীকার করতে ভয় কেন?

হারাধন চটিয়া উঠিয়া বলিল—খাই আমরা? মিথ্যেবাদী!

গোবিন্দ একটুও না চটিয়া হাসিয়া বলিল—মিথ্যেবাদী আমি না তোমরা? ঝি দোকান থেকে লুচি কচুরী শিঙাড়া ডালপুরী ডাল আলুর দম চপ মাংসের ডিমের তরকারী কিনে এনে ছায়, খাও না?

গোবিন্দর কথার জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া মন্মথ বলিল—দোকানের আর বাড়ীর রান্না কি এক হল?

হারাধন বলিল—দ্রব্য মূল্যেন শুদ্ধতি!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—শাস্ত্র তোমার যাই বলুন, যুক্তি আমার দিকে। আরো, যে লোকটিকে ব্রাহ্মণ বলে পাকে নিযুক্ত করেছ, সে ত ব্রাহ্মণ নাও হতে পারে। সে মিথ্যা কথা বলেছে বলে তার হাতে খাচ্ছ, আর ঝি সত্যি কথা বলেছে বলে ওর হাতে খাবে না?

হারাধন চটিয়া উঠিয়া বলিল—ঠাকুর যদি মিথ্যে কথা বলে আমাদের জাত মারে তার পাপের ভোগ ওকে ভুগতে হবে।

গোবিন্দ বলিল—পাপের ভোগ পরে না হয় ভুগবে, কিন্তু তোমাদের জাত ত গেছে। জাত যখন নেই, তখন ঝি এনে দিক ডাল ভাত। ও ঝি······ তুমি আনো, আমি বলছি।

মন্মথ বলিল—তোমাকে নিয়ে এক বাসায় থাকা আমাদের পোষাব না গোবিন্দ। আমরা তোমায় নোটিশ দিচ্ছি, তুমি সাত দিনের মধ্যে বাসা ছেড়ে যাবে।

এমন সময় একটি ছেলে সেই মেসের উঠানে আসিয়া কুণ্ঠিত স্বর

জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের মেম্বর চাই দেখ্‌লাম, আমাকে কি থাক্‌তে দেবেন ?

হারাধন বলিয়া উঠিল—থাক্‌তে দেবো বলেই ত লোক চাচ্ছি ; আপনি স্বচ্ছন্দে এসে থাকুন।

সেই ছেলেটি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে আমরা জাতে ডোম।

মন্মথ বলিয়া উঠিল—আরে রাম রাম! ডোম-ফোমের জায়গা ভদ্রলোকের মেসে হবে না।

ছেলেটি মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল—মেসের সাম্‌নে 'বিশ্বমৈত্রী মেস' লেখা আছে দেখেই সাহস করে এসেছিলাম। নইলে·····

তারপর সে ফিরিয়া চলিল।

গোবিন্দ খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া এঁটো মুখে এঁটো হাতেই তাড়াতাড়ি গিয়া পিছন হইতে ছেলেটির কাঁধে তার বাঁ হাত রাখিল।

তাকে স্পর্শ করে এমন কে লোক, দেখিবার জন্য ছেলেটি মুখ ফিরাইতেই গোবিন্দ বলিল—আপনি কি করেন?

মন্মথ আর হারাধন চীৎকার করিয়া উঠিল—গোবিন্দ! এঁটো মুখে ডোমকে ছুঁলে। তোমার আর এ বাসায় থাকা চল্‌বে না ; তুমি এখনি মেস ছেড়ে বেরোও, নয়ত ভালো হবে না বল্‌ছি।

গোবিন্দ সে কথায় কান না দিয়া ছেলেটির কাঁধে হাত রাখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি করেন ?

ছেলেটি গোবিন্দর ব্যবহারে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া কাতর স্বরে বলিল—আমি ফাষ্ট আর্ট্‌স্ পড়্‌ছিলাম, কিন্তু আমি কোথাও থাক্‌বার জায়গা পাচ্ছি না—আমার লেখা-পড়া ছেড়ে দিতে হবে দেখ্‌ছি।

ছেলেটির চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

গোবিন্দ বলিল—আপনি যাবেন না। আপনি এই মেসে যদি জায়গা

না পান, তবে আমাতে আপনাতে পৃথক মেস করে থাক্‌ব। আপনার নাম কি?

—আমার নাম শ্রীচন্দ্রকান্ত ডোম।

—আপনি 'দাস' পদবী নেন নি কেন?

—নিয়েছিলাম, কিন্তু ছেড়ে দিয়েছি। দাস শুনে লোকে ভাবে আমি হয়ত সৎ জাত, কিন্তু যখন জাত টের পায় তখন আমি প্রবঞ্চনা করেছি ভেবে চটে; আর দাস বা গোলাম বলে স্বীকার করার চেয়ে ডোম বলে পরিচয় দেওয়াটা বেশী লজ্জার মনে করি না। আমার বাব দাদা সবাই ডোম, আমি মাঝে থেকে দাস হয়ে কি কর্‌ব?

গোবিন্দ মনে মনে খুসী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনার বাবা কি কাজ করেন?

চন্দ্রকান্ত একটুও কুণ্ঠিত না হইয়া বলিল—তিনি রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন। বাবার ইচ্ছে যে আমি সেই ব্যবসাই করি, কিন্তু আরও ভালো রকমে—ইঞ্জিনিয়ার যদি না হতে পারি ত অন্তত ওভারসিয়ার হই। কিন্তু কল্‌কাতায় কোথাও জায়গা পাচ্ছি না, লেখাপড়া এইবার ছাড়্‌তে হবে।

চন্দ্রকান্তর চোখ আবার জলে ভরিয়া উঠিল।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন আপনি কোথায় আছেন?

চন্দ্রকান্ত দিব্য সপ্রতিভ ভাবে বলিল—ডোমপাড়ায়, খোলার ঘরে থাকি। কিন্তু সংসর্গ বড় অভদ্র, পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, তাই একটু ভদ্রলোকের আশ্রয় খুঁজছিলাম।

গোবিন্দ বলিল—আপনি একটু দাঁড়ান, আমি আঁচিয়ে আসি, তারপর দুজনে একসঙ্গে একটা বাসা খুঁজতে বেরুব।

গোবিন্দ আঁচাইতে যাইতেছে দেখিয়া মেসের কালীবাবু চীৎকার

করিয়া বলিল—গোবিন্দবাবু, আপনি চৌবাচ্চার জল ছোঁবেন না যেন। ঝি, গোবিন্দ-বাবুর হাতে আল্‌গোছে জল ঢেলে দাও; কলে জল থাকে ত কলটা খুলে দাও।

গোবিন্দ কালীবাবুর দিকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে হাসিতে আঁচাইতে গেল।

দুই

গোবিন্দ খুঁজিয়া একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া করিয়াছে। ইচ্ছা ছিল সে আর চন্দ্রকান্ত এই বাসাতে একসঙ্গে থাকিবে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত আসিয়া বলিয়া গিয়াছে, তার জাতের লোকেরা তাঁকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না; ডোম-পাড়াতেই সে একটি স্বতন্ত্র নিরাবিল ঘর পাইয়াছে। কাজেই গোবিন্দ এখন একলাই এই বাড়ীতে থাকিবে ঠিক করিয়াছে।

এই ভাড়াটে ছোট বাড়ীতে মেস্ হইতে উঠিয়া আসিয়া গোবিন্দ আপনার জিনিসপত্র গুছাইয়া ঘরকন্না পাতিতেছিল। একটা ঘরের একটা জান্‌লা বন্ধ ছিল। সেই জান্‌লাটি খুলিয়া দিয়াই গোবিন্দ আপন মনে বলিয়া উঠিল—বাঃ!

সেই জান্‌লাটা একটা গলির উপর। রাস্তার ধারের একটা কদম-গাছের একটা ডাল সেই জান্‌লাটার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলের ঝুম্‌কা ফুলগুলি জান্‌লার সাম্‌নে নিবিড় হইয়া ফুটিয়া ছিল, আর সেই ডালের পাতা ও ফুলের জালের ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছিল সরু গলির ও-পারের একটি বাড়ীর ছাদের কোলে ঘরের সাম্‌নের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে একটি সুন্দরী তরুণী। বর্ষাকালের সজল মেঘের ছায়ায় স্নিগ্ধ বিকাল-বেলার আলোয় কদম-গাছের পাতা-ফুলের জালের ফাঁকে সুন্দরী তরুণীটিকে দেখিয়া গোবিন্দ মুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ!

কড়াৎ করিয়া জান্‌লা খোলার শব্দে তরুণীও সেই জান্‌লার দিকে চাহিল। চাহিয়াই যখন দেখিল একটি তরুণ যুবকের গৌর মুখের উপর দুটি বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষুর মুগ্ধ দৃষ্টি তারই মুখের দিকে নিবদ্ধ হইয়া আছে, তখন সে লজ্জিত হইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। তখন গোবিন্দও তাড়াতাড়ি সেদিক হইতে চোখ নামাইয়া আপনার জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল।

হেঁট হইয়া ঝুঁকিয়া জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ কোমর ছাড়াইবার জন্য যতবার সোজা হইয়া দাঁড়াইতেছিল ততবারই তার দৃষ্টি সেই জান্‌লার দিকেই ফিরিতেছিল। সে একবার দেখিল কেহ নাই; একবার দেখিল সেই তরুণীটি বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে একবার চট করিয়া তার জান্‌লার দিকে চাহিয়া তখনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল; আর একবার দেখিল সেই তরুণীটি বারান্দা হইতে ছাদে আসিবার পথের উপর একখানা টুল পাতিয়া ছাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে.

গোবিন্দ আস্তে আস্তে জান্‌লার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ জান্‌লার গরাদের ফাঁকের ভিতর দিয়া হাত বাড়াইয়া কদমের কোমল কেশরের উপর হাতের মৃদু স্পর্শ দিয়া দিয়া ফুলগুলিকে নাচাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে তরুণীটি মুখ ফিরাইয়া কাঁধের উপর দিয়া একবার পিছন দিকে দেখিয়াই আবার বই পড়িতে লাগিল। কৌতুকে গোবিন্দর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

একটি বছর-পাঁচেকের ছোট ছেলে ডান-হাতে একখানা লাল রঙের ঘুড়ি আর বাঁ-হাতে একটা চেপ্‌টা নাটাই লইয়া নাচিতে নাচিতে আসিয়া সেই পাঠে নিরত তরুণীটিকে বলিল—দিদি, আমার ঘুড়িটায় ধর্‌তা দেবে এছো না।

তার দিদি চট করিয়া ঘাড় ঘুরাইয়া পিছনে একবার দেখিয়া লইল। গোবিন্দ তখনো জান্‌লায় দাঁড়াইয়া কদম ফুল দুলাইয়া খেলা করিতেছে। সে ভাইটিকে বলিল—দাঁড়া, একটু পরে যাচ্ছি।

দিদির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ছোট ছেলেটি ছাদের দিকে তাকাইয়াই দেখিল গলির ওপারের বাড়ীব জান্‌লায় একজন লোক দাঁড়াইয়া কদম-ফুল লইয়া খেলা করিতেছে। সে অমনি ছুটিয়া ছাদে আসিয়া ঘুড়ি-নাটাই মাটিতে ফেলিয়া ছাদের আল্‌সের ধারে আসিল এবং ছাদের ঘেরা পাঁচিলের উপর কোনমতে কষ্টেসৃষ্টে মাথাটি উঁচু করিয়া তুলিয়া চেঁচাইয়া বলিল—ছুমুন ছুমুন, ও মছায়,··· ·· আমায় একটা কদম-ফুল দিন না।

তার দিদি বই হইতে মুখ ফিরাইয়া ভ্রূকুটি করিয়া ভাইকে ধম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিল—এই খোকা, এদিকে আয় বল্‌ছি।

গোবিন্দ দেখিল তরুণীর কপট ভ্রূকুটির তলে তার চোখে মুখে কৌতুকের হাসি চাপা পড়িয়া ফুটি-ফুটি করিতেছে। গোবিন্দ পাতা-সুদ্ধ এক থোকা ফুল ছিঁড়িয়া খোকার ছাদে ছুড়িয়া দিয়া বলিল—এই নাও খোকা।

খোকা পাঁচিল হইতে তুড়ুক করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া গিয়া ফুল তুলিয়া লইল এবং তার নাক মুখ সেই ফুলের থোকার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া গোবিন্দর দিকে চাহিয়া বলিল—আরো।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—একদিনে সব নিতে নেই, আবার কাল দেবো। এখন তুমি ঘুড়ি ওড়াও।

অমনি খোকা ছুটিয়া গিয়া দিদির আঁচল ধরিয়া টানিয়া বলিল—দিদি, ঘুড়ির ধর্‌তা দেবে এছো।

দিদি তার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—আমি এখন যেতে পার্‌ব না, যাঃ।

গোবিন্দ বুঝিল ঐ আপত্তির কারণ সে। সে তখন খুব শব্দ করিয়া জানলাটা বন্ধ করিয়া দিল। জানলার ছিদ্র দিয়া সে দেখিতে লাগিল, তরুণী সেই জানলা বন্ধ করার শব্দ শুনিয়া একবার ফিরিয়া দেখিল এবং তখনই উঠিয়া বই বন্ধ করিয়া টুলের উপর বই রাখিয়া ছাদে খোকার ঘুড়ি উড়াইয়া দিতে আসিল। মেয়েটির বয়স বড়-জোর ষোলো; তার আধুনিক ধরণের বেশভূষা— পেটিকোট ব্লাউজ ঘিরিয়া ব্রাহ্মধরণে বাঁ কাঁধের উপর সেফ্‌টি-পিন আঁটিয়া শাড়ী পরা, মাথায় এলোচুলের শিথিল খোঁপা, ফাঁপা চুলের তলে কান দুটি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, শুধু কানের পাতায় ছোট দুটি সোনার টব চুলের ভিতর হইতে চক্‌চক্‌ করিতেছে; তার গায়ের রং সুগৌর, মুখখানি কমনীয়, গড়ন সুন্দর; তার কপালে একটি ছোট সিঁদূরের টিপ, পায়ে আল্‌তা; তার হাতে মাত্র একগাছি করিয়া সোনার চুড়ি আছে; হাতে লোহা নাই, সিঁথিতেও সিঁদূর নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়াই গোবিন্দর মনটা কেন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; আবার পরক্ষণেই দমিয়া গেল এই মনে করিয়া যে, উহারা যদি ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান হয়, যদি উহারা লোহা সিঁদূর এয়োতের লক্ষণ বলিয়া না মানে। এই কথা মনে হইতেই গোবিন্দর মনে হইল লুকাইয়া পরের বাড়ীর মেয়েকে দেখা তার অন্যায় হইতেছে। অমনি সে জানলাটা খুলিয়া দিল। সেই তরুণী তখন শ্বেতপদ্মের দুখানি পাপ্‌ড়ির মতন শুভ্র পাত্‌লা ছোট্ট দুখানি হাতে লাল ঘুড়ির দুইধার ধরিয়া বাহু বিস্তার করিয়া উড়াইয়া দিতে যাইতেছিল, জানলা খোলার সঙ্গে-সঙ্গে সে ঘুড়ি ছাড়িয়া দিয়া হাসিয়া মাথা নত করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। ঘুড়িটা ঠক করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল, আর খোকা সুতোতে হেঁচ্‌কা টান দিতে দিতে চেঁচাইতে লাগিল —দিদি, ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে এছো।...... দিদি .....ও দিদি.....

খোকার ডাকাডাকিতেও খোকার দিদি আর ছাদে আসিল না। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। গোবিন্দ তখনো জান্‌লা হইতে সরিল না।

গোবিন্দর বাসা-বাড়ীটা দুটো গলির মোড়ের কোণে। একটা গলি বাড়ীর সাম্‌নে দিয়া, অপরটা পাশ দিয়া গিয়াছে। সেই পাশের গলিতে তরুণীদের বাড়ী। তাদের পরিচয় জানিবার জন্য গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইল। তরুণীদের বাড়ীর সামনেটা একতলা, পিছনটা দোতলা; সাম্‌নের ঘরে একটা ছোট ডিস্‌পেন্সরী আছে, আর দরজার সাম্‌নে দেওয়ালে একটা পিতলের পাটায় ইংরেজিতে লেখা আছে—ডাক্তার দ্বারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ডি-এস্‌সি, এম-ডি, মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জ্জন ও ভৈষজ্যতত্ত্বের অধ্যাপক।

ডাক্তারের নাম পড়িয়াই গোবিন্দর কেমন মনে হইতে লাগিল লোকটা নিশ্চয় ব্রাহ্ম। সে তার অনুমানের সঙ্গত কারণ কি হইতে পারে তাই ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

গোবিন্দ বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া আসিয়া হাসিয়া ভাবিল—ডাক্তার দ্বারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মই হোন আর খ্রীষ্টানই হোন বা পরম নিষ্ঠাবান হিন্দুই হোন তাতে আমার কি?

গোবিন্দ যে-বাসাটি ভাড়া লইয়াছিল তার দোতলায় দুটি মাত্র ঘর। একতলাতেও দুটি ঘর—তার একটি রান্নাঘর, আর বাহিরের ঘরটায় একটা মুদির দোকান। সেই মুদিরই এই বাড়ী, সে নিজে থাকে খোলার ঘরে; রাস্তার ধারে বলিয়া এই বাড়ীর নীচের ঘরে সে দোকান ফাঁদিয়াছে, বাকী অংশটা সে কুড়ি টাকায় ভাড়া দ্যায়।

গোবিন্দ উপরতলায় উঠিয়া সঙ্কল্প করিল, যে-ঘরটি হইতে দ্বারকেশ্বর-বাবুর বাড়ী দেখা যায় সে-ঘরে সে আর শোবার ব্যবস্থা করিবে না, সে-ঘরে ভাঁড়ার করিয়া অন্য ঘরেই সে বাস করিবে।

বিছানা তুলিয়া আনিতে গিয়া সে দেখিল সেই ফুলন্ত কদম-ডালের আড়াল থেকে পূর্ণিমার চাঁদ পাত্লা মেঘের প্রলেপ ভেদ করিয়া স্নিগ্ধ ম্লান জ্যোৎস্না তার পাতা বিছানার উপর ছড়াইয়া দিয়াছে—জ্যোৎস্নার আলোয় কদম-ডালের পাতা ফুলের ছায়া তার সাদা বিছানার উপর আল্পনার মতন্ দেখাইতেছে, ঝির্ঝিরে বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া সেই ফুলপাতা ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন নক্সায় ছায়া রচিতেছে। ইহা দেখিয়া গোবিন্দব অন্য ঘরে যাওয়ার সঙ্কল্প টিকিল না, সে লাফাইয়া গিয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। শুইয়াই দেখিতে পাইল সেই তরুণীটি একটা ডিট্জ্ হ্যারিক্যান লণ্ঠন মুখের কাছে উঁচু করিয়া ধরিয়া আলোর শিখা উস্কাইয়া উজ্জ্বলতর করিতে করিতে ছাদে আসিতেছে। গোবিন্দ নড়িল না। তরুণী একবার গোবিন্দর জান্লার দিকে চাহিয়া দেখিল—সেখানে সেই লোকটি এখনও দাঁড়াইয়া আছে কি না; তারপর সে ছাদের কোণে মাটির টবে আজ্জানো একটি তুলসীগাছের কাছে সেই লণ্ঠন রাখিয়া সেফ্টি-পিনে আবদ্ধ আঁচল-খানিকে গলায় দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গোবিন্দ শুইয়া শুইয়া ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল—হায়রে দুর্দ্দশা! সুবিধার কাছ থেকে সৌন্দর্য্যকে কি এমন করিয়াই বিদায় দিতে হয়! তুলসীতলায় সুন্দর মাটির প্রদীপের বদলে কুশ্রী হ্যারিক্যান ল্যাম্প! আর কল্যাণী রমণীব ভক্তির নিশান আঁচলখানি সেফ্টি-পিনের বজ্র-আঁটুনিতে বন্ধ!

তরুণী ফিরিয়া যাইবার সময় আর-একবার ভৈরব-মুদির বাড়ীর নূতন ভাড়াটের সন্ধানে সেই জান্লার দিকে তাকাইল এবং কেউ সেখানে আছে কি'না কদম-ডালের আবছায়ায় ঠিক করিতে না পারিয়া একবার চোখ মেলিয়া থম্কিয়া দাঁড়াইয়া একটু উঁকিঝুঁকি মারিয়া চলিয়া গেল।

প্রভাতে ঘুম ভাঙিতেই গোবিন্দর প্রথমে মনে হইল সেই মেয়েটিরই কথা—সে বোধ হয় এতক্ষণে ছাদে কি বারান্দায় আসিয়াছে। চোখ মেলিয়া বালিশ হইতে মাথা একটু তুলিয়া গোবিন্দ দেখিল, সেই তরুণী একখানি বই খুলিয়া বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে পড়িতেছে। গোবিন্দ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া চোখ মুছিয়া জান্‌লার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, সেই তরুণী তার দিকে ফিরিয়া চায় কি না দেখিবার জন্য। পড়িতে-পড়িতে সেই তরুণী ভৈরব-মুদির নূতন ভাড়াটের জান্‌লার দিকে একবার ফিরিয়া তাকাইল, তাকে সেই লোকটা দেখিতেছে কি-না দেখিবার জন্য। দুজনের চোখে চোখে দেখা হইয়া গেল। তরুণী সরিয়া ঘরে চলিয়া গেল। গোবিন্দ স্নান করিতে গেল।

গোবিন্দ আসিয়া দেখিল দ্বারকেশ্বর-বাবুর সদর-দরজার চৌকাঠের উপর তরুণীর ভাই সেই খোকা চুপটি করিয়া বসিয়া আছে। গোবিন্দ তাড়াতাড়ি নামিয়া তার কাছে গিয়া হাসিয়া বলিল—কি খোকা-বাবু, কি হচ্ছে ?

একজন অপরিচিত লোক তাকে প্রশ্ন করিতেছে দেখিয়া খোকা চোখ বিস্ফারিত করিয়া অবাক হইয়া গোবিন্দব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দ হাসিয়া তার ফুলো ফুলো নরম গালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছ না ? সেই কাল—আমি তোমাকে কদম-ফুল পেড়ে দিলাম !

গোবিন্দ কথা শেষ করিয়া ফুলন্ত কদম-গাছটির দিকে হাত দিয়া দেখাইল।

খোকা অমনি উৎসাহিত হইয়া বলিল—আমায় আজকে আবার ফুল তুলে দিন না।

—চল আমার সঙ্গে. অনেক ফুল পেড়ে দেবো।

খোকা নিমন্ত্রণ পাইয়া লাফাইয়া উঠিল। গোবিন্দ তাকে লইয়া নিজের ঘরে আসিয়া পাতা-সুদ্ধ অনেকগুলি ফুল পাড়িয়া দিল। নিজের হাতে ফুল পাড়িবার আনন্দের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া খোকাও গরাদের ফাঁক দিয়া তার ছোট ছোট হাত দুখানি বাড়াইয়া ফুলগুলি বিদলিত করিয়া পাতাগুলিকে চিরিয়া চিরিয়া দুহাতে ছিঁড়িতে লাগিল। গোবিন্দ তাকে বাধা দিয়া বলিল—এক দিনে সব তুলো না খোকা, আবার কাল নিয়ো।

খোকা সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই না আনিয়া তার জামার ধার উল্‌টাইয়া কোঁচড়ে ফুল তুলিতে লাগিল।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নাম কি খোকা?

খোকা ঢোক গিলিতে গিলিতে বলিল—ছিরি অলুন চন্দরূঅ চক্কডোবত্তী।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—অরুণচন্দ্র! খাসা নাম ত তোমার!

তারপর একটু ইতস্তত করিয়া গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—তোমার দিদির নাম কি অরুণ-বাবু!

খোকাকে সবাই খোকা বলে বলিয়া তার মনের কোণে একটু দুঃখ লজ্জা সঙ্কোচ জমিতেছিল; এই তার নূতন বন্ধুটি তাকে একেবারে অরুণ-বাবু বলিয়া সম্বোধন করাতে, এবং তার নাম যে খুব ভালো তা স্বীকার করাতে, সে খুব খুসী হইল; তাড়াতাড়ি দিদির নাম বলিতে গিয়া থামিয়া থামিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অরুণ বলিল—আমাল্‌ দিদির নাম ছিরিমতী আবামই দেবী।

গোবিন্দ উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ বাঃ! অরুণের দিদি আভা! ঠিক মিল-করা নাম দুটি!

তাদের দুই ভাইবোনের নাম যে উৎকৃষ্ট তার সার্টিফিকেট নূতন বন্ধুর কাছে পাইয়া খোকা বেশ একটু গর্ব্বিত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—অরুণ-বাবু, তুমি পড়ো?

অরুণ-বাবুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, সে তাড়াতাড়ি বলিল—এই রথের দিন আমার হাতে-খড়ি হবে! আমার দিদি বেতুন কলেজের ফাট্টো কেলাছে পড়ে! রোজ গাড়ী চড়ে ইছ্‌কুলে যায়। মস্ত বড় গাড়ী আছবে! আপনি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেই দেখতে পাবেন—এইখানে এছে গাড়ী দাঁড়াবে, ছহিচ এছে ডাক্‌বে—গাড়ী আছ্‌লো বাবা!

এই বলিয়া অরুণ হাসিয়া কুটিকুটি। গোবিন্দ শিশুর অনর্গল কথা আর উচ্ছ্বসিত হাসি তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল ও দেখিতেছিল। হঠাৎ খোকা চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিল—দিদি দিদি, ছাখো আমি কোথায় এসেছি।

আভা ভাইয়ের বাঁশীর মতন মিহি আর মিঠে ডাকে চকিত হইয়া চারিদিকে মুখ ফিরাইয়া তাকে খুঁজিতে লাগিল। অরুণ অমনি খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল—দেখ্‌তে পাচ্চ না? এই যে আমি কদম-ফুলের বাবুর বাড়ী......

গোবিন্দ হাসিয়া তাড়াতাড়ি অরুণের কানের কাছে বলিল—আমার নাম গোবিন্দ-বাবু।

অরুণ অমনি চেঁচাইতে লাগিল—এই যে আমি গোবিন্দ-বাবুর বাড়ীতে। গোবিন্দ-বাবু আমাকে কত ফুল দিয়েছে ছাখো।

অরুণ জামার আঁচল উঁচু করিয়া দিদিকে ফুলগুলি দেখাইবার চেষ্টা করিল।

আভা ভাইএর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, গোবিন্দর দিকে চাহিয়া হাসি চাপিয়া সরিয়া গেল।

এমনি সহজে অরুণের মধ্যস্থতায় গোবিন্দ আভার, আর আভা গোবিন্দর নাম জানিয়া গেল।

সাড়ে নটার সময় আভা সাজিয়া-গুজিয়া একপাঁজা বই বাঁ-হাতে আর ডান-হাতে একটা পেন্সিল লইয়া একবার ছাদে আসিল, আল্‌সের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া গেল স্কুলের গাড়ী আসিয়াছে কি না। গোবিন্দ মনে মনে হাসিল, স্কুলের বাস্ ত চুপিচুপি আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার কথা নয়।

গাড়ী আসিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় আভা একবার চকিতে চোখ তুলিয়া গোবিন্দর জান্‌লার দিকে চাহিল, গোবিন্দ সেখানে স্মিতমুখে ঠিক দাঁড়াইয়া আছে।

বিকালে স্কুল হইতে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াই আভার প্রথম দৃষ্টি চকিত হইয়া সেই জান্‌লার উপরই গিয়া পড়িল, এবং তখনও সেখানে দেখা গেল, গোবিন্দর সুশ্রী বলিষ্ঠ হাসিমাখা গৌর মুখ!

এমনি করিয়া প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত আভা দেখিত গোবিন্দ তাকে দেখিতেছে কি না, এবং গোবিন্দ দেখিত আভা তাকে দেখিতেছে কি না. ফলে উভয়ে উভয়কে দেখিবার খেলা সুরু হইয়া গেল। গোবিন্দর পড়া লেখা দাড়ি-কামানো সব কাজ সেই জান্‌লার ধারে। আর আভার লেখা-পড়ার জায়গা এখন ছাদের কোলে বারান্দায়,—হয় বসিয়া, নয় টহলাইয়া; বাড়ীর সকলের ভিজা কাপড় ছাদে শুকাইতে দিবার ভার আভার, কাপড়গুলা শুকাইল কি না তার তদারকের ভার আভার, শুকনো কাপড় কোঁচাইয়া কোঁচাইয়া তুলিবার ভার আভার, তুলসী-তলায় জল দেওয়া ও সন্ধ্যা-দেখানোর ভার আভার, অরুণের ঘুড়ি উড়াইয়া দেওয়ার বা ব্যাটের মুখে বল্ গড়াইয়া দেওয়ার কাজও আভার। কখন্

কখন্ কোথায় কার দেখা পাইবার সম্ভাবনা, তা উভয়েরই জানা হইয়া গেছে; অসময়ে কাকেও কোথাও চলিয়া যাইতে হইলে, গোবিন্দ চাদর গায়ে দিয়া লাঠি বা ছাতা হাতে লইয়া জান্লার কাছে দাঁড়াইয়া জানাইয়া দিত সে বাহির হইতেছে; আভা একখানি গামছা বা তোয়ালে হাতে করিয়া একবার ছাদে ঘুরিয়া জানাইয়া যাইত সে স্নান করিতে বা কাপড় কাচিতে চলিল, এখন কিছুক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকিবে, অথবা পোষাকী বেশ পরিয়া জানাইয়া যাইত সে কোথাও বাহিরে যাইতেছে। গোবিন্দ বেড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া খুব শব্দ করিয়া জান্লা খুলিয়া খবর পাঠাইত সে ফিরিয়াছে, অম্নি আভা একঘর হইতে অন্যঘরে যাওয়া-আসা করিয়া ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়াইত; আভা বাড়ী ফিরিলেই বারবার চেঁচাইয়া খোকাকে ডাকাডাকি করা তার দর্কার হইয়া পড়িত, আর গোবিন্দ তখনই জান্লার কাছে গিয়া কদম-ডালের সৌন্দর্য্যতত্ত্ব গবেষণায় মন দিত। কিন্তু দুজনের মধ্যে কারো দৃষ্টিতে একটু পরিচয়ের ভাব পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইত না, ইঙ্গিত বা চটুলতা ত দূরের কথা। কেবল তাদের উভয়ের মধ্যে অরুণের উদয় হইলেই আভার মুখ সলজ্জ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত আর গোবিন্দ কুণ্ঠিত সঙ্কোচে খোকার অনর্গল কথার এক একটা সংক্ষিপ্ত জবাব দিত।

তিন

মাস তিনেক পরে গোবিন্দর মনে হইল ডাক্তার দ্বারকেশ্বর-বাবু যে অরুণ ও আভার কে তা ত জানা হয় নাই। তখন সে অরুণকে নিজের ঘরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অরুণ-বাবু, তোমার বাবার নাম কি?

অরুণ চালাক ছেলে, বাপের প্রকাণ্ড নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে না জানিয়া চট করিয়া বলিল—বাবার নাম ঐ যে দরজায় লেখা আছে, আপনি পড়তে পারেন না? আমার বাবা মস্ত ডাক্তার!

অরুণ পিতার গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—চল, তোমার বাবার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করে দেবে।

অরুণচন্দ্র আপনার মহত্ত্ব অনুভব করিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিল—চলুন না, বাবা আপনাকে কিচ্ছু বল্‌বেন না!

অরুণের সঙ্গে গিয়া গোবিন্দ দেখিল দ্বারকেশ্বর-বাবু খালি গায়ে বসিয়া রোগী দেখিতেছেন। তিনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একটু নাদুস্-নুদুস্ ধরণের লোক, বয়স আন্দাজ চল্লিশ। দাড়ি গোঁপ কামানো। তাঁর নাকের মাঝখানে একটি তিলকের ঈষৎ আভাস, গলায় তেকণ্ঠী তুলসী-কাঠের মালা এবং একগাছি সরু সোনার হারে একটি মাদুলি, আর ধব্‌ধবে শাদা পৈতে; মাথার টিকিতে একটি ফুল গোঁজা। অরুণের হাত ধরিয়া গোবিন্দকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই দ্বারকেশ্বর-বাবু হাসিয়া বলিলেন—এস গোবিন্দ-বাবু, তুমি এতকাল এসে প্রতিবাসী হয়ে আছ, আমার ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এখনো আলাপই করো নি। আমরা কিন্তু তোমার বন্ধুর কাছ থেকে রোজই তোমার নানান-রকম খবর পাই!

গোবিন্দ বৈষ্ণবের ছেলে, বৈষ্ণব গ্রামে বৈষ্ণব-সমাজে সে বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তার দেহ যেমন চাঁছা-ছোলা বাহুল্যবর্জ্জিত ঋজু অথচ বলিষ্ঠ ছিল, তার মনটাও তেম্‌নি সংস্কার-বর্জ্জিত তাজা ছিল। সে বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যে মানুষ হইয়াছিল বলিয়াই বৈষ্ণবদের ভেক ও আচরণের মধ্যেকার সমস্ত অসঙ্গতি তার কাছে

অভ্যাসের দ্বারা সহ্য হইয়া যায় নাই, বরং তাহা বেশী করিয়াই ধরিতে পারিবার অবসর তার জুটিয়াছিল। ডি-এসসি আর এম-ডি পাশ-করা ডাক্তারকে বৈষ্ণবের ভেক লইয়া ব্যবসা করিতে দেখিয়াই গোবিন্দর মনটা তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল ; তার উপর প্রথম সাক্ষাতেই দ্বারকেশ্বর তাকে তুমি বলাতে তার মন তাতিয়া উঠিল। সুতরাং সে যে-পরিমাণ শ্রদ্ধা দেখাইয়া হৃদ্যতা করিবার সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল, তাহা প্রথম সাক্ষাতেই নষ্ট হইয়া গেল। গোবিন্দ একটু ছোট্ট নমস্কার করিয়া বিনা আহ্বানেই রোগীদের মধ্যেই একটা বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

দ্বারকেশ্বর গোবিন্দকে নমস্কার করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা আপনারা ?

গোবিন্দ বুঝিল সে ব্রাহ্মণ কি না জানিয়া তবে দ্বারকেশ্বর প্রতি-নমস্কার করিবেন। গোবিন্দর অসহিষ্ণু মন উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তথাপি সে উগ্রতা দমন করিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিল—আজ্ঞে আমরা মুচি !

গোবিন্দর পাশে বেঞ্চিতে যে-সমস্ত লোক বসিয়া ছিল তারা সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া বসিল, একজন লোক বেঞ্চি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত মুখে কটমট করিয়া গোবিন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া যেন তাকে বুঝাইতে চাহিল—তোমার কি রকম আক্কেল হে, মুচি হয়ে ভদ্দর লোকের পাশে বস।

প্রতিনমস্কারের জন্য ডাক্তারের উদ্যত কৃতাঞ্জলি নামিয়া পড়িল, তিনি গম্ভীর হইয়া একজন রোগীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—দেখি, তোমার জিভ দেখি ?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—আপনি না বৈষ্ণব ডাক্তার বাবু ? আপনার

কাছে বামুন-মুচি সমান সম্মানের যোগ্য হওয়া উচিত। আমাকে প্রতি-নমস্কার কর্‌লে আপনার মহত্ত্বই প্রকাশ পেতো।

ডাক্তার দ্বারকেশ্বর অপ্রতিভ ও এত লোকের সাম্‌নে লজ্জিত হইয়া গোবিন্দর উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তার দিকে না ফিরিয়া তিনি অপর একজন রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার কি ?

—আজ্ঞে আমার চোখটা একবার দেখ্‌তে হবে। মহেশখালির শ্রীপতি-বাবু আপনাকে এই চিঠি দিয়েছেন।

দ্বারকেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—তুমি রুগী, আমি ডাক্তার ; তুমি টাকা দেবে, আমি দেখ্‌বো ; এতে আর সুপারিশের দর্‌কার কি ?

সেই লোকটি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে আমি ছা-পোষা মানুষ, আপনার পূরো দক্ষিণা দিতে পার্‌বো না, বোলেই······

দ্বারকেশ্বর সেই লোকটির দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আচ্ছা তুমি একটু বস, তোমায় একটু পরে দেখ্‌ছি।··· ··· তোমার কি ?

গোবিন্দ দেখিল যে দ্বারকেশ্বর লোকটি এমনি দাম্ভিক যে কোনো ভদ্রলোককে তিনি আপনি বলেন না। দ্বারকেশ্বর এক একজন রোগী দেখিতে দেখিতে মধ্যে মধ্যে সেই যে-লোকটি পূরা দক্ষিণা দিতে পারিবে না বলিয়াছিল, তার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন ; প্রশ্নগুলি এক-একটি রোগী দেখার অবকাশে খুব দেরীতে দেরীতে করিতেছিলেন—

—তোমার নাম কি হে ?

—আজ্ঞে মার্কণ্ডেয় সরকার।

—বাড়ী কোথায় ?

—বীরভূমের অন্তর্গত বক্রেশ্বরে।

—এবার বীরভূমে চাষবাসের অবস্থা কেমন ?

—আজ্ঞে দেবতা-ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে এখন পর্য্যন্ত ত বেশ ভালোই মনে হচ্ছে।

—তোমার চাষ-বাস আছে ত?

—আজ্ঞে সামান্য কিঞ্চিৎ আছে।

—হাজার বিঘে জমি হবে?

—আজ্ঞে অত হবে না, শ আষ্টেক বিঘে হবে।

—সোম-বচ্ছরের চাল দাল তা হলে তোমার নিজের ক্ষেত থেকেই হয়ে যায়।

—আজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

—উদ্বৃত্ত যে ধান কলাই থাকে তা ত বিক্রী করা হয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বিক্রী করতে হয় বৈ কি।

—সেই টাকাতে কাপড়চোপড় নুন তেল কিনতে হয়, আর কিছু অদিন অজন্মার জন্যে জমাও ত রাখতে হয়. হাজার হোক ছা-পোষা লোক ত তোমরা?

মার্কণ্ডেয় গদগদ হইয়া বলিল—আজ্ঞে তা করতে হয় বৈ কি, তবে তেমন বেশী কিছু জমে না।

দ্বারকেশ্বর বলিলেন—হ্যাঁ, যে দিন কাল পড়েছে তাতে লোকের দুবেলা অন্ন জোটাই ভার হয়েছে, তাতে আর জমবে কি বেশী! তা যা জমে তা ব্যাঙ্কে রাখো. না রেহানি তেজারতি কর?

—আজ্ঞে ব্যাঙ্কে সুদ কম, রেহানি তেজারতিতে লাভ বেশী.....

দ্বারকেশ্বর মার্কণ্ডেয়কে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন—জমিজমা থাকলে লোকে যতটা লাভের ব্যাপার মনে করে, তা মোটেই না; মামলা-মকদ্দমা করতেই ফতুর হতে হয়।

মার্কণ্ডেয় খুসী হইয়া বলিল—আজ্ঞে তা আর বলতে। এই গেল

বছর হেতমপুরের রাজাদের সঙ্গে মামলা লেগে গেল! শেষে সিংহী-সাহেবকে কৌসলী দিয়ে জমি রক্ষা করি।

—সিংহী-সাহেব ত তোমাদের দেশের লোক, তিনি বোধ হয় তোমার কাছে কিছু নেন নি?

মার্কণ্ডেয় চটিয়া উঠিয়া বলিল—আজ্ঞে কৌসলীদের কাছে দেশ-ফেশ নেই —ওদের কাছে আগাড়ি দাম পিছাড়ি কাম!

দ্বারকেশ্বর হঠাৎ উৎসুক হইয়া একটু ঝুঁকিয়া বলিয়া উঠিলেন—তোমার গায়ের কোটটা নতুন দেখছি! বেশ কোটটি ত! কত দাম নিয়েছিল?

মার্কণ্ডেয় বিনীতভাবে বলিলেন—আজ্ঞে ষোল টাকা! অখিল পালের দোকানে এক দাম, একটা পয়সা কম করলে না।

তখন দ্বারকেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—সম্পত্তির ডাক্তার কৌসলীকে পুরো দাম যদি দিয়ে থাকো, গরদের কোটটাও যদি পুরো দামে কিনতে পেরে থাকো, তবে চোখের ডাক্তারকেও পুরো দক্ষিণাটি দিতে হবে বাপধন! আটটি টাকা টেবিলের ওপর রাখো, তবে তোমার চোখ দেখবো।

ঘরভরা লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মার্কণ্ডেয় ত ডাক্তারের জেরায় জেরবার হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। দ্বারকেশ্বর আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া গর্ব্বিত স্মিত মুখে সকলের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার নজর গোবিন্দর মুখের উপর পড়িল। দেখিলেন, সকলে হাসিতেছে, গোবিন্দ কঠিন হইয়া বসিয়া আছে। তার দিকে চাহিতেই গোবিন্দ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—উঃ! আপনি রুগীদের যে মাদুলি দ্যান তার খুব মাহাত্ম্য! এক-এক মাদুলির দাম আট টাকা!

সকলে অবাক্ হইয়া গোবিন্দর দিকে চাহিল। দ্বারকেশ্বর আশ্চর্য্য ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—রুগীদের আমি মাতুলি দি কি হে? আমাকে কি তুমি হাতুড়ে quack ঠাউরেছ!

গোবিন্দ ধীরভাবে সসম্ভ্রমে বলিল—আজ্ঞে, ডি-এসসি এম-ডি পাশ-করা ডাক্তারকে হাতুড়ে quack ভাববো এমন আহাম্মক আমি নই।

দ্বারকেশ্বরের মুখ খুসীতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কৌতূহলী হইয়া গোবিন্দর শেষ কথাটুকু শুনিবার আগ্রহে তার দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন।

গোবিন্দ বলিতে লাগিল—কিন্তু ডি-এসসি এম-ডি ডাক্তারের নিজের গলায় মাতুলি দেখে ভেবেছিলাম যিনি বিজ্ঞানে আর চিকিৎসাশাস্ত্রে ডাক্তার, যিনি মেডিক্যাল কলেজের ভৈষজ্যতত্ত্বের অধ্যাপক, তিনি যে-মাতুলি ধারণ করেছেন তা নিশ্চয়ই খুব বিচার কোরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কোরে তবে ধারণ করেছেন। আর যে ওষুধের গুণ তিনি নিজের পরীক্ষায় প্রত্যয় করেন, তা ছাড়া অন্য ওষুধ রুগীদের দেওয়া উচিত নয় মনে করেন নিশ্চয়! আমিও এগজামিন পাশ করবার একটা মাতুলী নিয়ে যাব একদিন—পুরো আট টাকাই দেবো!

দ্বারকেশ্বর মহা চটিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—তুমি কোথাকার ছোটলোক হে! আমার বাড়ী বয়ে এসে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অপমান করতে সাহস করে! বেরোও তুমি আমার বাড়ী থেকে।

অরুণ গোবিন্দকে অভয় দিয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল, যে, তার বাবা গোবিন্দকে কিছু বলিবেন না। কিন্তু এখন তার সেই অনুমান মিথ্যা হইয়া যাওয়াতে সে কতকটা ভয় পাইয়া ও কতকটা গোবিন্দর কাছে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

গোবিন্দ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মার্কণ্ডেয় বলিল—যত সব

মুচি মুদ্দফরাস দুপাত ইংরিজি শিখে গোসাঁই-গোবিন্দকে আর মান্‌তে চায় না, এমনিই কলির মাহাত্ম্য। সোটলোক! সোটলোক! যেমন বংশে জন্ম!

গোবিন্দ হাসিয়া জামার গলার ভিতর হাত ঢুকাইয়া শুভ্র একগুচ্ছ পৈতা বাহির করিয়া মার্কণ্ডেয়কে বলিল—সরকার মশায়, আপনার চেয়ে আমার ঢের উঁচু বংশে জন্ম। কিন্তু আমি বংশের মর্য্যাদার চেয়ে ব্যক্তির মর্য্যাদা বড় মনে করি। শিক্ষিত সাধুচরিত্র মুচি, ভণ্ড গোঁসাই-গোবিন্দর চেয়ে ঢের বড় আমার কাছে!

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। যারা তার ছোঁয়ার ভয়ে এতক্ষণ সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া ছিল তারা অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল—লোকটা বেরাস্তন!

মার্কণ্ডেয় বলিল—ওকে কি আর ব্রাহ্মণ বলে? নিজের মুখে যে স্বীকার করলে মুচি, যে চণ্ডালের মতন কাঠ-গোঁয়ার, সে আবার ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ বটে আমাদের ডাক্তার-বাবু—যথার্থ বৈষ্ণব!—অপমানেও ক্ষোভ নেই, ক্ষমা আছে!......তবে ডাক্তার বাবু, আমি আজ আসি, আজ চারটি টাকা নিয়েই এসেছিলাম, আট টাকা নিয়ে কাল আবার আস্‌ব।

দ্বারকেশ্বর তার দিকে ঘুরিয়া বলিলেন—আজকে চারটাকা দিয়েই চোখটা দেখিয়ে যাও হে, কাল বাকী টাকাটা দিও যদি ইচ্ছে হয়। এ ত আর আমার মূলোর ক্ষেত নয় হে!

উপমাটা মার্কণ্ডেয়ের তেমন ভালো লাগিল না; রোগের মূল উৎপাটন করাইতেই সে ডাক্তারের কাছে আসিয়াছে; রোগের বারমেসে ফলনে ডাক্তারের লাভ বটে কিন্তু রোগীর প্রাণান্ত!

চার

গোবিন্দ আভার বাড়ীতে আত্মীয়রূপে প্রবেশের চেষ্টা করিতে গিয়া সেখানে প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সেই কদম-ডালে-ঘেরা জানলাটির সাম্নে সটান সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল—যাক, দুর্ভাবনা ঘুচ্লো।

গোবিন্দকে জান্লার সাম্নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া আভা একবার ছাদে আসিয়া ঘুরিয়া গেল, উজ্জ্বল চোখ দুটিতে হাসি ভরিয়া সে একবার গোবিন্দর দিকে চাহিল; কিন্তু সে লক্ষ্য করিল, আজ তাকে দেখিয়া গোবিন্দর সুন্দর দৃঢ় মুখ আনন্দে কোমল হইয়া উঠিল না, সে জান্লার কাছে আগাইয়া আসিয়া কদম-ডালের ফাঁকে ফাঁকে চোখ উঠাইয়া নামাইয়া তার গতি অনুসরণ করিল না, সে দৃঢ় মুখ কঠিনতর করিয়া গম্ভীর হইয়া জান্লার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ দৌড়িয়া আসিয়া আভাকে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিতে লাগিল—দিদি, দিদি, গোবিন্দ-বাবু বাবার সঙ্গে দেখা কর্তে এসেছিল, বাবা গোবিন্দ বাবুকে বোকে তাড়িয়ে দিয়েছে!

আভার উজ্জ্বল মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, সে চোখ কপালে তুলিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কেন রে?

অরুণ বলিল—গোবিন্দ-বাবু যে মুচি!

আভা হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—দূর, আমি যে ওঁর গলায় পৈতে দেখেছি।

অরুণও দেখিয়াছে বটে। তাই সে মহাসমস্যায় পড়িয়া বলিল—গোবিন্দ-বাবু যে বাবাকে বল্লে—আমি মুচি!

আভা আর কিছু বলিল না, শঙ্কাকুল মুখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে একবার গোবিন্দর দিকে ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ অরুণের কথা কতক শুনিতে পাইয়া জানলার ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদি সে আভার একটা কথা শুনিতে পায়, যদি আভার মুখের ভাবে সে তার মনের কথা ধরিতে পারে।

আভার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া অরুণ দেখিল গোবিন্দ আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোবিন্দকে দেখিয়াই অরুণ ছাদের আলসের ধারে ছুটিয়া আসিয়া পাঁচিলের ফুকোরে পা দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া বলিল—গোবিন্দ-বাবু, আর আপনার বাড়ীতে যাব না, আপনার ছঙ্গে কথা কইব না, বাবা বারণ করেছে! আপনি মুচি!

আভার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে তীব্র তিরস্কার শোনা গেল—খোকা, এদিকে আয় বলছি!

খোকা মনে করিল গোবিন্দর সঙ্গে কথা কহিয়া সে অন্যায় করিয়াছে, তাই দিদির এই তিরস্কার। সে পাঁচিলের গা হইতে টপ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল তার দিদি ছাদ ও বারান্দার সঙ্গম-স্থলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দর দিকে চাহিয়া আছে

গোবিন্দ দেখিল সে দৃষ্টি বড় ম্লান, বেদনায় মিনতিতে ভরা, যেন সে নির্বোধ শিশু-ভাইটির কথার জন্য ক্ষমা চাহিতেছে।

গোবিন্দ জানিতে পারিতেছিল না, সে আভার বাবার সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে তার কতখানি ও তা কি-রকম ভাবে আভা জানিয়াছে এবং আভা তাকে কি মনে করিতেছে। তাই সে আভার ব্যাকুল ম্লান দৃষ্টি নিজের প্রসন্ন হাসির আভায় উজ্জ্বল করিয়া দিতে পারিল না, সে অরুণকে হাসিমুখে ডাকিয়া আভাকে বুঝাইয়া দিতে

পারিল না যে, যাহা ঘটিয়াছে তাহা অতি তুচ্ছ, শঙ্কিত হইবার কোনো কারণ নাই।

গোবিন্দকে গম্ভীর হইয়া থাকিতে দেখিয়া আভার মন অত্যন্ত ভয়ে ভরিয়া উঠিল। তার বাবার সহিত গোবিন্দর কি বচসা হইয়াছে, কেন হইয়াছে, তাতে কার দোষ বেশী, ইহা জানিবার জন্য তার মন উৎসুক উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। সে অপেক্ষা করিয়া রহিল তার বাবা কথা তুলিলে প্রশ্ন করিয়া সমস্ত ব্যাপার সে জানিয়া লইবে। কিন্তু তার বাবা সে সম্বন্ধে কোনো কথাই উত্থাপন করিলেন না। যত দিন যাইতে লাগিল তত তার জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু আগ্রহ বেশী হইতেছিল বলিয়াই বাবার কাছে গোবিন্দর প্রসঙ্গ তুলিতেও সে পারিতেছিল না।

পরদিন স্কুলে যাইবার সময় আভা বই হাতে করিয়া ছাদের সামনে বারান্দায় আসিয়া দেখিল, গোবিন্দ তার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে নিয়মিত উপস্থিত নাই। বেথুন-স্কুলের গাড়ী গুম্ গুম্ শব্দ করিয়া পাড়া কাঁপাইয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল। আভা গাড়ীতে উঠিতে গিয়া চকিত-দৃষ্টিতে একবার উপর দিকে চাহিয়া লইল, কারো উৎসুক দৃষ্টির সহিত সে-দৃষ্টি মিলিত হইল না। স্কুলের গাড়ী গলিতে গলিতে ঘুরিয়া মেয়ে কুড়াইয়া যতক্ষণে স্কুলে পৌঁছিত, ততক্ষণে গোবিন্দ বাড়ী হইতে কলেজ যাইবার পথে হেদোর গেটের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; তা যে কাকে আর-একবার দেখিয়া সমস্ত দিনের পাথেয় সংগ্রহ করিবার আশায়, তা আভা মনে মনে বেশ বুঝিত; আজ যখন স্কুলের গাড়ী স্কুলের গেটে ঢুকিল, তখন হেদোর গেটের পাশে আভা গোবিন্দকে দেখিতে পাইল না।

এমনি প্রতীক্ষায় ব্যর্থ আশায় চার দিন গেল, আভা গোবিন্দকে

একবারও দেখিতে পায় নাই। আভা চিন্তিত হইয়া পড়িল, গোবিন্দর অসুখ করিল নাকি। যে চিন্তা ঘন হইয়া তার মন ছাইয়া ফেলিতেছিল, তাহা পাতলা করিয়া ফেলিবার আশায় আভা মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—যদিই অসুখ কোরে থাকে ত তায় আমার কি? কল্‌কাতায় ত কত লোক আছে, কত লোক্ অসুখে ভুগ্‌ছে, মরে পর্য্যন্ত যাচ্ছে, সকলের ভাবনা ভাব্‌তে গেলে কি চলে?

কিন্তু এই একটি লোকের সম্বন্ধে আভার মনের মধ্যে যে বিশেষ একটি ভাবনা জমিতেছিল, তা অগ্রাহ্য করিয়া সে কিছুতেই উদাসীন হইতে পারিতেছিল না। আভা মুখ ম্লান করিয়া ব্যস্ত হইয়া ছাদে একশোবার আনাগোনা করিয়া শুক্‌না কাপড় তুলিতেছিল, ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছিল, ফুলগাছের টবে জল দিতেছিল, আর বারবার চকিত দৃষ্টিতে গোবিন্দর জান্‌লার দিকে চাহিতেছিল। আজ চার দিন সেই মাঝের জান্‌লাটি খোলা হয় নাই।

বিকাল বেলা দ্বারকেশ্বর ডাক্তারের মোটর-গাড়ী ভঁক্-ভঁক্ করিয়া ডাকিতে ডাকিতে রোগীর ডাকে বাহির হইয়া গেল। তখন আভা চেঁচাইয়া ডাকিল—খোকা!

সেই ডাক শুনিয়াও কদম-ডালের ঐ বন্ধ জান্‌লাটা কড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল না। আভার একটা নিশ্বাস বড় জোরে পড়িল।

খোকা ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি দিদি?

আভা যে জন্য খোকাকে ডাকিয়াছিল তা নিজের কাছেও স্বীকার করিতে আভার লজ্জা বোধ হইতেছিল; সে মুখ লাল করিয়া বলিল—এম্‌নি ডাক্‌ছিলাম, তুই কোথায় ছিলি?

—বা রে! আমি ত তোমার সাম্‌নেই দাঁড়িয়েছিলাম!

আভা লজ্জিত হইল, নত হইয়া ফুলের গাছে জল ঢালিতে লাগিল।

হঠাৎ আবার খোকার কাছে আসিয়া খুব মৃদু স্বরে, যেন সে নিজে শুনিতে পাইলেও লজ্জা পাইবে এমনি সঙ্কুচিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে, তোর গোবিন্দ -বাবুকে দেখেছিস্ ?

অরুণ উৎসাহিত হইয়া বলিল—হ্যাঁ, ইস্কুল থেকে বই হাতে কোরে বাড়ী ঢুক্‌লো দেখ্‌লাম।

—তুই কথা কইলিনে?

—ইস্ ! কেন কথা কইবো ? ওর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া হয়ে গেছে যে !

—তিনিও তোর সঙ্গে কথা কইলেন না ?

—তা সে কইবে কেন, আমি যে আড়ি করে দিয়েছি !

আভা ভাইটির দুই গালে দুটি হাত চাপিয়া পরম স্নেহের আবেগে বলিয়া উঠিল—না ভাই, কারো সঙ্গে আড়ি কর্‌তে নেই। তুমি গোবিন্দ-বাবুকে একবার ডাকো, এখুনি ভাব হয়ে যাবে।

খোকা আপত্তি জানাইয়া বলিল—বাবা যে ওর সঙ্গে কথা কইতে বারণ করেছে।

—বাবা কিছু বল্‌বেন না, আমি বল্‌ছি, তুই ডাক্।

অরুণ অমনি তুড়ুক করিয়া ছাদের কিনারের পাঁচিলের ফুকোরে পা দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া মিহি গলায় চেঁচাইয়া ডাকিল—গোবিন্দ-বাবু, আপনাকে দিদি ডাকছে·· ···

আভা লজ্জিত হইয়া আরক্ত মুখে জিভ কাটিয়া টপ করিয়া পাঁচিলের আড়ালে বসিয়া পড়িল, আর চাপা গলায় কৌতুক-আনন্দে-মিশানো ভর্ৎসনা ভরিয়া বলিল—এই হতভাগা ছেলে, নেমে আয় বল্‌ছি, তোর কাউকে ডাকৃতে হবে না, নেমে আয়·· ···

সোনার কাঠির ছোঁয়া লাগিয়া গোবিন্দর ঘরের বন্ধ জান্‌লা খুলিয়া গেল। গোবিন্দ শ্রাবণ-সন্ধ্যার মতন ম্লান মুখে জান্‌লার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া

ব্যথিত স্বরে বলিল—আর পারিনে ভাই তোমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাক্‌তে! আমি আজই তোমার বাবার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবো।

আভার মনের মেঘ কাটিয়া গেল, মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে পাঁচলের ফুকোর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, সেই ছিপছিপে অথচ দৃঢ় বলিষ্ঠ ঋজু শরীরখানি তার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তার কঠিন মুখখানি শোকের ছায়ায় মহিমান্বিত দেখাইতেছে!

সন্ধ্যার সময় দ্বারকেশ্বর-বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিলেন। গোবিন্দ ঘরে ঢুকিতেই তিনি চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আবার আপনি আমার বাড়ীতে কেন এসেছেন?

গোবিন্দ তাঁর পা ছুঁইয়া প্রণাম করিয়া বিনীত ভাবে বলিল—আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

দ্বারকেশ্বর এই উদ্ধত বলিষ্ঠ যুবককে অবনত হইতে দেখিয়া খুসী হইয়া উঠিলেন। তিনি তার কাছ হইতে আর একটু স্তুতি মিনতি শুনিবার আশায় তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দ বলিল—আমি যদিও কোনো অন্যায় বা অপরাধ করিনি, তবু অন্যের ত্রুটি গায়ে পোড়ে না দেখালেও চলত, তাই ক্ষমা চাইছি...

দ্বারকেশ্বর আবার গম্ভীর হইয়া গেলেন, মুখ হাঁড়ি করিয়া ভারী গলায় বলিলেন—যে লোক দোষই না করেছে, তার ক্ষমা চাওয়াই বা কেন আর তাকে ক্ষমা কর্‌বেই বা কে? আপনার সঙ্গে ত আমার কোনো সম্পর্ক নেই. অতএব.....আচ্ছা, আমার এখন একটু কাজ আছে...

দ্বারকেশ্বর উঠিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন। গোবিন্দ আপন মনে হাসিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

পরদিন সকালে দ্বারকেশ্বর ডাকে বাহির হইয়া গেলে গোবিন্দ দুঃখিত হাসি হাসিয়া আভাকে শুনাইয়া অরুণকে ডাকিয়া বলিল—ভাই অরুণ-

বাবু, তোমার বাবার পায়ে ধোরে মাপ চাইলাম, তবু তিনি ক্ষমা কর্‌তে পার্‌লেন না।

আভার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। গোবিন্দর সম্বন্ধে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা তার মনের মধ্যে জন্মলাভ করিল—গোবিন্দ এমন কি দুর্ব্যবহার করিয়াছে যার জন্য সে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলেও আভার বাবা তাকে প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। আভা বাবাকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, গোবিন্দকেও না, অথচ ওদের কেউই নিজে হইতেও তাকে কিছু কোনোদিন জানাইল না। এই অনিশ্চিত অজানা ব্যাপারটি মাঝখানে পড়িয়া আভা ও গোবিন্দর মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রচনা করিয়া রাখিল। গোবিন্দ তেম্‌নি সকাল-বিকাল-সন্ধ্যায় জান্‌লায় বা ছেদোর ধারে দাঁড়ায় বটে, আভাও উৎসুক হইয়া সে আছে কি না দেখে বটে, কিন্তু এখন আভার চোখে হাসির ছটা তেমন করিয়া চল্‌কিয়া পড়ে না, গোবিন্দর ভাবটা কেমন চোরের মতন কুণ্ঠিত—"তুমি আমার" এই দাবীর জোর যেন তার মনে আর আমল পাইতেছে না।

গোবিন্দ বিছানায় পড়িয়া আভার বাড়ীর দিকে চাহিয়া ভাবিত, আভাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে পারিলে সে ধন্য হইত, কিন্তু সে পথ সে আপনি রুদ্ধ করিয়াছে, দ্বারকেশ্বর তাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে কিছুতেই রাজি হইবেন না। একদিন সে ভাবিতে ভাবিতে দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল—যাক্‌! জীবনটাকে দিব্যি ভেস্তে দেওয়া গেল!

পাঁচ

পূজার ছুটি হইয়া গিয়াছে। তবু গোবিন্দ বাড়ী যায় নাই। বাড়ীতে কেবল তার মা আছেন; তাঁকে গোবিন্দ জানাইয়াছে;

এবার এগ্‌জামিনের পড়া, বাড়ী গেলে পড়ার ব্যাঘাত ঘটিবে। এখন সে কলেজে যায় না, আভাও স্কুলে যায় না। সূর্য্যের উদয় হইতে সূর্য্যের অস্ত পর্য্যন্ত গোবিন্দর সঙ্গে আভার এখন শতেক বার সাক্ষাৎ হয়। বর্ষার পর শরতের আবির্ভাবে আকাশ যেমন নির্ম্মল স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে-ছিল, জলভারমুক্ত মেঘ যেমন আপনার কৃষ্ণতা পরিহার করিয়া লঘু শুভ্র হইয়া উঠিতেছিল, সূর্য্য যেমন সুপ্রকাশ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, গোবিন্দ ও আভার মনও তেমনি ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছিল।

একদিন গোবিন্দর বাসায় ধূমকেতুর মতন হঠাৎ তার জেঠ্‌তুতো ভাই জগন্নাথ আসিয়া উপস্থিত হইল। জগন্নাথ গোবিন্দর চেয়ে বছর তিনেকের বড়। কিন্তু তার এই তেইশ বৎসর বয়সেই সে নিজেকে যথাসম্ভব বুড়ো ও বিজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছিল। সে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পাশ করিয়া পৈতৃক ব্যবসা গুরুগিরি অবলম্বন করিয়াছে; তার বেশ সুকণ্ঠ আর অনর্গল বকিবার ক্ষমতা ছিল, তাই সে গুরুগিরির অবসরে কথকতা ও ভাগবত পাঠ করিয়া থাকে; তাতে তার খ্যাতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জনেরও সুবিধা হইয়া-ছিল। এইসব ব্যবসার খাতিরে তাকে মাথার চুল চারিদিকে সমান করিয়া ছাঁটিয়া মাথায় একটি বেশ দস্তুর-মতন মোটা আর লম্বা শিখা রাখিতে হইয়াছিল, গোঁপ-দাড়ি মোটে না থাকিলেও নিত্য ক্ষৌরী করিতে হইত; এবং গলায় তেকণ্ঠী তুলসী-কাঠের মালা, নাকে তিলক, হরি-নামের মালার ঝুলি তার বেশের প্রধান অঙ্গ ছিল; সে থান ধুতি পরিত, একটি মেরজাইএর উপর একখানি মুড়ি-সেলাই-করা লংক্লথের চাদর গায়ে দিত ও পায়ে প্রায়ই চটি বা কদাচিৎ প্যানেলার ঘোর-তোলা জুতো তার চরণধূলার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিত। জগন্নাথও গোবিন্দর মতন বেশ গৌরবর্ণ, কিন্তু গোবিন্দ একহারা দীর্ঘ বলিষ্ঠ, আর জগন্নাথ

বেঁটে গোলগাল নাদুস-নুদুস। জগন্নাথের মুখখানি যেন পিতলের এক জোড়া পানের ডিবে—আগাগোড়া গোল, গাল দুটি ফুলো ফুলো, চিবুকটা খাটো, চিবুকের নীচে ফুলো মাংসের একটি থাক, দেখিতে কেমন মাকুন্দ মতন।

তাকে দেখিয়াই গোবিন্দ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—দাদা যে!

জগন্নাথ তার ক্যাম্বিশের ব্যাগটি গোবিন্দর তোরঙ্গের উপর সন্তর্পণে রাখিয়া তক্তপোষের বিছানার এক পাশে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া খুব গম্ভীর মুরুব্বিআনা চালে বলিল—হ্যাঁ, একবার তোকে দেখ্‌তে এলাম, খুড়িমাও বললেন; আরো একবার শিষ্যিবাড়ী বেড়িয়ে যাব, আর কোম্পানির কাগজগুলোর সুদ জমা করিয়ে নিতেও হবে। তুই এবার বাড়ী গেলিনে কেন? বাড়ীতে কি পড়া হত না?

গোবিন্দ কেবল একটু হাসিল।

এমন সময় আভা একখানি ডালিম-ফুলি রঙের কাপড় পরিয়া একটি বড় জীবন্ত ফুলের মতন হাসি-আনন্দে ঝলমল্ করিতে করিতে ছাদের উপর দিয়া একবার ঘুরিয়া গেল, যাইতে যাইতে মুখ ফিরাইয়া দুবার পিছনে দেখিল।

জগন্নাথ দেখিল ঘরের মধ্যে তার অস্তিত্ব ভুলিয়া তার কথার জবাব মাত্র না দিয়া গোবিন্দ ঐ মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া যেন তার সৌন্দর্য্য পান করিতেছে, গোবিন্দর সর্ব্বাঙ্গ যেন তার দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। জগন্নাথ বিজ্ঞ লোক; ভাবিল—ভায়া পড় ছেন বটে! তাই বাড়ী যাওয়া হয়নি!

আভা অদৃশ্য হইয়া গেলে গোবিন্দ জগন্নাথের দিকে ফিরিয়া বলিল—দাদা, মুখ হাত ধোও।

জগন্নাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—হ্যাঁ, যাই।

জগন্নাথ শিষ্যবাড়ী যাইবার আর নাম করিল না, সে গোবিন্দর বাসাতেই আড্ডা জমাইয়া বসিল। সে প্রত্যহ লক্ষ্য করে আভাকে যখনি দেখা যায় তখনি গোবিন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কিন্তু সে আড়ালে লুকাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়াছে উহারা উভয়ে একেবারেই নীরব; জগন্নাথ তাদের চোখের ইসারাতেও একটি কথাও কহিতে দেখিতে পাইল না, অথচ দেখা মাত্রই উহাদের উভয়ের মুখ যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে তাতেও ত কোনো সন্দেহ নাই। জগন্নাথ উহাদের মনের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া একদিন কথা পাড়িল—তুই এতকাল এ পাড়ায় আছিস, পাড়াপড়্শীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছিস?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমার বাড়ীওলা ভৈরব-মুদির সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তার দোকান থেকে চাল-ডাল কেনা হয়, আর সে মাসকাবারে বাড়ীর ভাড়া নিতে আসে।

জগন্নাথ কপালে চোখ তুলিয়া বলিল—বলিস্ কি রে; আর কারো সঙ্গে আলাপ করিস্‌নি! তোর বাড়ীর পাশে দেখ্‌ছিলাম কে একজন খুব বড় ডাক্তার আছেন...

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, দ্বারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী। একদিন আলাপ কর্‌বার চেষ্টায় গিয়েছিলাম, কিন্তু বন্‌লো না, সূত্রপাতেই চটাচটি হয়ে গেল।

জগন্নাথ ভর্ৎসনার স্বরে বলিয়া উঠিল—অ্যাঃ! তুই চিরকেলে গোঁয়ার-গোবিন্দ! বিদেশ-বিভুঁইএ রয়েছিস, ডাক্তার পড়্শীর সঙ্গে পরিচয় আত্মীয়তা থাক্‌লে কত সুবিধে! আত্মীয়তা থেকে ঘনিষ্ঠতা হবে; তা না গোড়াতেই চটিয়ে দিয়ে বসে আছিস্! আমরা হলে দুদিনে আলাপ জমিয়ে তুল্‌তাম!

গোবিন্দ তেমনি হাসিয়াই বলিল—আমি ত পারিনি, তুমি একবার দেখ না দাদা, দ্বারকেশ্বর খুব বষ্টম বটে, তোমার সঙ্গে বন্‌লেও বন্‌তে পারে! দ্বারকেশ্বরের একটি মেয়ে আছে, পারো ত তার সঙ্গে আমার বিয়ের ঘটকালিটা কোরে দেখো।

জগন্নাথ আর কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পরদিন সকালে গোবিন্দ দেখিল তার দাদাটি সকাল-সকাল স্নান সারিয়া খুব ঘটা করিয়া তিলক-সেবা করিয়াছে; একখান গরদ পরিয়া খালি গায়ের উপর গরদের চাদর ফেলিয়াছে। চটিজুতা পায়ে দিয়া ক্যাম্বিশের ব্যাগটি হাতে লইয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। গোবিন্দকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিল—একবার শিষ্যিবাড়ীটা ঘুরে আসি।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—এখানে খাবে ত?

জগন্নাথ বলিল—হ্যাঁ, শিগ্‌গিরই আস্‌ব।

জগন্নাথ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া খানিক দূর চলিয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। গোবিন্দ ও দ্বারকেশ্বরের বাড়ীর মধ্যেকার গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া একবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া গোবিন্দর বাড়ীর প্রত্যেকটা জান্‌লায় ভালো করিয়া দেখিল কোথাও গোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছে কি না; তারপর চট করিয়া দ্বারকেশ্বরের বাড়ীর দরজায় ঢুকিয়া পড়িল।

দ্বারকেশ্বর যে-ঘরে বসিয়া রোগী দেখিতেছিলেন সেই ঘরে গিয়া জগন্নাথ খুব প্রবীণ ভাবে দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিয়া উঠিল—বিষ্ণবে নমঃ।

পরম ভাগবত সাত্ত্বিক-বেশী ব্রাহ্মণের আগমনে ঘর-সুদ্ধ লোক তটস্থ হইয়া উঠিল, দ্বারকেশ্বর চেয়ার হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিতে

গিলেন—বিষ্ণবে নমঃ! বিষ্ণবে নমঃ! আস্‌তে আজ্ঞে হোক্! বস্‌তে আজ্ঞে হোক! মশায়ের কি মনে করে আগমন হয়েছে!

জগন্নাথের পূর্ব্বে আগত লোকেরা সবগুলি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়া ছিল; একজন তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া দূরে বেঞ্চিতে গিয়া বসিল; জগন্নাথ সেই পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে এই পথ দিয়ে শিষ্যালয়ে গমন কর্‌ছিলাম, হঠাৎ আপনার নাম-পট্টের প্রতি দৃষ্টিপাত হল; আপনার বিদ্যাবত্তার সঙ্গে আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা আর ভগবদ্‌-ভক্তির খ্যাতি আমি বহুকাল যাবত শ্রুত ছিলাম; মনে কর্‌লাম একবার মহাপুরুষ দর্শনের পুণ্যার্জ্জনটা কোরে যাওয়া যাক; তাই এলাম, কোনো-রূপ প্রার্থী হয়ে আসিনি!

দ্বারকেশ্বর এত লোকের সাম্‌নে এই অপরিচিত নবাগত লোকটির মুখে নিজের স্তুতি শুনিয়া মহা খুসী হইয়া বলিলেন—হেঁ হেঁ হেঁ, আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন! যিনি সাধু তিনি সকলকেই সজ্জন মনে করেন। আপনার ন্যায় ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি ধন্য হলাম। আপনার নামটি কি?

জগন্নাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে আমরা মাতামহ-বংশের কৌলিক ব্যবসায় দীক্ষা-দান অবলম্বন করায় গোস্বামী উপাধিতেই সমধিক পরিচিত। আমি সংস্কৃত কলেজ থেকে এম্‌-এ পাশ কোরে গুরুগিরিই কর্‌ছি, কথকতা ভাগবত পাঠও করে থাকি।......

দ্বারকেশ্বর উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ও! আপনিই জগন্নাথ গোস্বামী ভক্তিরত্ন! সেদিন কাগজে দেখ্‌ছিলাম জগন্নাথ-পুরীর মুক্তি-মণ্ডপের পণ্ডিতেরা আপনাকে বাচস্পতি উপাধি দিয়েছেন!

জগন্নাথ পরম গর্ব্ব-গর্ভ বিনয়ের সহিত বলিল—আজ্ঞে হাঁ, সবাই আমাকে অনুগ্রহ করেন— নবদ্বীপ আমাকে ভক্তিরত্ন উপাধি দ্যান, সম্প্রতি

পূর্ব্বস্থলী আমাকে ভাগবত-ভূষণ উপাধি দিয়ে আমাকে গৌরবান্বিত করেছেন।

জগন্নাথ কথায় বলিল বটে সে গৌরবান্বিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবটা দেখাইল যেন সে উপাধিগুলিকেই গৌরবান্বিত করিয়াছে।

সমবেত লোকেরা বলিয়া উঠিল— আজকালকার দিনে কলেজ থেকে পাশ-করা লোকের এমন ধর্ম্মনিষ্ঠা আর শাস্ত্রে ভক্তি ত বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

দ্বারকেশ্বর প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন—তা ত নিশ্চয়! তা ত নিশ্চয়! আমি এতদিন আপনার নাম আর খ্যাতিই শুনে আস্‌ছি, কিন্তু আপনার সুকণ্ঠের পুরাণগান শোনার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি।

জগন্নাথ বলিল—এ আর বেশী কথা কি? আপনার সুবিধে হলে আমি আজকেই বিকেল-বেলা আপনার বাড়ীতে আপনাকে ভগবৎকথা একটু শুনিয়ে দিতে পারি, আমি ত কদিন এখন কল্‌কাতাতেই আছি।

দ্বারকেশ্বর খুসী হইয়া বলিলেন—বেশ বেশ! এ ত পরম সৌভাগ্য! আপনি যদি অনুগ্রহ কোরে একটু অপেক্ষা করেন, তা হলে এঁদের বিদেয় কোরে……

একজন হাসিয়া বলিল—আমরা এখন বিদায় হব বটে, কিন্তু বিকেলে এসে আমরা জুটব ডাক্তার-বাবু; বাচস্পতির কথা আমাদের শুন্‌তে দেবেন না?

দ্বারকেশ্বর হাসিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া বলিলেন—বিলক্ষণ, আপনারা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কোরে নিশ্চয় আস্‌বেন।

রোগীদের বিদায় করিয়া দিয়া দ্বারকেশ্বর জগন্নাথকে বলিলেন—তা হলে ঐ কথাই ঠিক রইল। বিকেলে পাঁচটার সময়। তা আপনি এখানে কোথায় এসে আছেন? এ বেলা এখানেই স্নানাহ্নিক কোরে আহার বিশ্রাম কর্‌লে হ'ত না?

জগন্নাথ যে কোথায় আছে তাহা না ভাঙিয়া গম্ভীর হইয়া কেবল বলিল—স্নানাহ্নিক আমার প্রত্যুষেই হয়ে গেছে·········

দ্বারকেশ্বর আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন—তা হলে এখানেই বিশ্রাম করুন। কিন্তু আমার গৃহিণী নেই; পরিবারের মধ্যে শুধু একটি মেয়ে আর একটি ছেলে; মেয়েটি ছোট, ছেলেটি শিশু; পাচকের রান্নাই বাধ্য হয়ে আমাকে খেতে হয়·········

দ্বারকেশ্বর একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

জগন্নাথ বলিল—আমাদের দেশে-বিদেশে পর্য্যটন করতে হয়, অত নিয়ম পালন করা চলে না; যে পাচকের হাতে আপনার ন্যায় সদ্‌-ব্রাহ্মণ খেতে পারেন, তার হাতে খেতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

দ্বারকেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের দেশ কোথায়? আপনার সন্তানাদি কি?

জগন্নাথ বলিল—আমাদের বাড়ী বাসুদেবপুরে। আমি এখনো বিবাহ করিনি। আমার মাতা বর্ত্তমান, তিনি যখন-তখনই বলেন বটে পুত্র-বধূর মুখ দেখ্‌তে পেলাম না, জমিদারীর আয় আর আমার রোজ্‌গার শুধু পুঁজিই হচ্ছে, খাবার লোক নেই; কিন্তু একটি সদ্বংশের হিঁদুয়ানিতে নিষ্ঠাবতী সুশ্রী পাত্রী না পেলে আমি বিবাহ করব না প্রতিজ্ঞা করেছি। আমরা কেশব-চক্রবর্ত্তীর সন্তান, তিন পুরুষে, আনন্দীরাম বিদ্যালঙ্কারের শাখা; কত লোকে মেয়ে নিয়ে ঝুলোঝুলি করছে, আমি মনের মতন পাত্রী ত পাচ্ছি না।

দ্বারকেশ্বরের মনটা অমনি উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, এমন সুপাত্রের হাতে আভাকে সম্প্রদান করিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! আভার কি তেমন ভাগ্য হইবে? দ্বারকেশ্বর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আপনাকে কথকতার দক্ষিণা কি দিতে হবে?

জগন্নাথ হাসিয়া বলিল—একটি হরিতকী!

দ্বারকেশ্বরও হাসিয়া বলিলেন—হরিতকীর সঙ্গে আরো কিছু বেশী দেবো মনে করেছি, আপনাকে দয়া করে নিতে হবে।......তা হলে আপনি বসুন, আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে। আমার ফিরতে বিলম্ব হবে, আমার জন্যে আপনি অপেক্ষা করবেন না, আমার মেয়েকে আমি বোলে যাচ্ছি, সে আপনার আহারের ব্যবস্থা কোরে দেবে।

দ্বারকেশ্বর উঠিলেন দেখিয়া জগন্নাথ তাড়াতাড়ি ব্যাগ হইতে মোট দশ হাজার টাকার খানকতক কোম্পানির কাগজ বাহির করিয়া দ্বারকেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল—এগুলি আপনি একটু ভালো করে তুলে রেখে দিয়ে যান।

জগন্নাথের চাতুরীর টোপ দ্বারকেশ্বর অতি সহজেই গিলিয়া ফেলিলেন। দ্বারকেশ্বর দেখিলেন পাত্রটি রূপে গুণে বিদ্যায় খ্যাতিতে বংশমর্য্যাদায় অর্থে বিত্তে সর্ব্বাংশেই উত্তম, ইহারই হাতে আভাকে সমর্পণ করিতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

ছয়

গোবিন্দ দাদার প্রতীক্ষায় বসিয়াই আছে, বেলা বারোটা বাজিয়া গেল, তবু দাদার দেখা নাই; সে দাদাকে ফেলিয়া নিজে খাইতেও পারিতেছিল না। গোবিন্দ একবার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছে, আবার কদম-ডালে ঘেরা জানলাটির ধারে গিয়া দাঁড়াইতেছে। আজ আভাও খুব ব্যস্ত হইয়া এঘর ওঘর উপর নীচে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কেন?

হঠাৎ গোবিন্দর যেন মনে হইল দ্বারকেশ্বরের বাড়ীর উপরকার দালানে তার দাদা!—একবার গোবিন্দর দিকে চাহিয়াই সে টপ

করিয়া বসিয়া পড়িল, আর তাকে দেখা গেল না। গোবিন্দ ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে হইতেছে সে দাদাকেই দেখিয়াছে, আবার বিশ্বাসও করিতে পারিতেছে না যে দাদা এত শীঘ্র একেবারে দ্বারকেশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। আধ ঘণ্টা পরে সেই লোকটা উঠিয়াই চট করিয়া আড়ালে সরিয়া গেল, এবারও গোবিন্দর মনে হইল ও-ব্যক্তি তারই দাদা না হইয়া যায় না।

গোবিন্দ বিস্মিত চিন্তিত বিরক্ত উৎসুক হইয়া একলা আহার করিতে গেল। খাইয়া আসিয়াও গোবিন্দ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল কখন্ তার দাদা ফিরিবে। কিন্তু বিকাল পর্য্যন্তও তার দাদা ফিরিল না। একবার ইচ্ছা হইল দ্বারকেশ্বরের বাড়ীতে সন্ধান লইয়া আসে, কিন্তু বিশেষ প্রবৃত্তি হইল না।

অকস্মাৎ সন্ধ্যার সময় গোবিন্দ শুনিতে পাইল দ্বারকেশ্বরের বাড়ী হইতে তার দাদার কথকতায় আকাশ মুখরিত হইতেছে। দাদা নাকি-সুরের নানা রকম কর্ত্তব করিয়া চেঁচাইতেছে—

তখন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন কোরে জানকী-দেবীর অন্তঃকরণে পুলক সঞ্চার হতে লাগ্‌লো; নবদুর্ব্বাদলশ্যাম সেই অভিরাম রূপ দর্শন কর্‌তে কর্‌তে সীতা-দেবী চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন—পিতা অমন কঠিন ধনুর্ভঙ্গ পণ কেন বা কর্‌লেন? এই সুকুমার-তনু সুন্দর রাজপুত্র কঠিন শিবধনু ভাঙ্‌তে ত পার্‌বেন না, কিন্তু আমার কপাল চিরদিনের তরে ভেঙে দিয়ে যাবেন।—এইরূপে সীতা দেবী দর্শন মাত্রে শ্রীরামচরণে মনপ্রাণ সমর্পণ কোরে মনে মনে খেদ কর্‌ছেন, এমন সময় শ্রীরামচন্দ্র উঠ্‌তেই সীতাদেবীর দৃষ্টি উত্থিত হল, শ্রীরামচন্দ্র হরধনু আকর্ষণ কোরে সীতা দেবীর হৃদয়ই আকর্ষণ কর্‌লেন, এবং চক্ষের নিমেষে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত কোরে সীতাদেবীর অন্তরকেও আশায় ও আশঙ্কায় আন্দোলিত কোরে

তুল্‌লেন, আর অবলীলাক্রমে জ্যা আকর্ষণে হরধনু ভঙ্গ কোরে সীতা-দেবীর সকল ভয় ভঞ্জন কর্‌লেন।...

অমনি চারিদিকে হরিহরি ধ্বনি উত্থিত হইল। গোবিন্দর মুখ বিরক্তিতে অন্ধকার হইয়া উঠিল। আভাকেও সে অনেকক্ষণ দেখিতে পায় নাই এই জন্যই।

জগন্নাথ দ্বারকেশ্বর-বাবুর অন্তঃপুরে দোতলায় খাইতে গিয়া আভাকে নিকট হইতে একবার মাত্র দেখিতে পাইয়াছিল, তারপর আভা আর তার সাম্‌নে বাহির হয় নাই, বাড়ীর পাচিকাই জগন্নাথকে খাবার দিয়া গিয়াছিল। খাইতে বসিয়াই জগন্নাথের চক্ষু দুটি চঞ্চল হইয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়াও আভাকে আর খুঁজিয়া পায় নাই; কিন্তু একবার এক চমক যেটুকু দেখিতে পাইয়াছিল তাতেই সে খুসী হইয়া মনে মনে হাসিতেছিল—কথকতার দক্ষিণা লাভটি মন্দ হইবে না। জগন্নাথ নিজের ধূর্ত্ততায় ও সফলতায় অত্যন্ত গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিতেছিল—দ্বারকেশ্বর কত সহজে তার জালে ধরা দিয়াছেন; তিনি কথকতার দক্ষিণা হরিতকীর সঙ্গে আরো কিছু দিবেন বলিয়া যে ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি মনে করিয়াছেন যে জগন্নাথ বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু জগন্নাথ জানে সে দক্ষিণাটি সালঙ্কারা কন্যা ভিন্ন অন্য কিছু নহে; গোবিন্দ-ছোঁড়া চার চার মাস বাড়ীর পাশে থাকিয়াও আলাপ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই, আর সে একই দিনে দ্বারকেশ্বরের অন্তঃপুরে ভাবী জামাই-রূপে অভ্যর্থিত হইল! জগন্নাথ আপনার কল্পনাকে কাজে ভাঙাইবার ক্ষমতা আর সফলতার তৎপরতায় উৎফুল্ল হইয়া ভাবিতেছিল গোবিন্দটা একেবারে জব্দ হয়ে যাবে। একেই বলে—ভিনি ভিডি ভিসি—এলাম দেখ্‌লাম জয় কর্‌লাম। জুলিয়াস সীজারের চেয়ে আমি কম কিসে!

বিকালে জগন্নাথ আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রামের বিবাহ সম্বন্ধে কথকতা করিল। রামচন্দ্রের রূপ দেখিয়াই কিশোরী জানকী মুগ্ধ হইয়াছেন, তখন তাঁর ভয় হইয়াছে পিতার ধনুক-ভাঙা পণ স্মরণ করিয়া। জানকী বিনাইয়া বিনাইয়া সখীর কাছে খেদ করিতেছেন, হরধনু যাতে রামচন্দ্রের হাতে অনায়াসে ভঙ্গ হয় তার জন্য কাতর হইয়া হরের আরাধনা করিতেছেন; তারপর সকল ভয়কে অমূলক করিয়া রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিলেন জানকীর অপার আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া অশ্রুধারায় বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল; তারপর রামচন্দ্র সীতাকে রথে লইয়া জনকপুরী হইতে অযোধ্যার পথের শোভা দেখাইতে দেখাইতে যাইতেছেন, এমন সময় রথের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন পরশুরাম! বধূ সীতা ভয়ার্ত্তা হইয়া রামকে আলিঙ্গন করিলেন—যে আলিঙ্গনটি পাইবার জন্য রাম লজ্জিতা নববধূকে অনুনয় করিতেছিলেন তাহা অযাচিত পাইয়া রাম বিপদকে বন্ধুর মতন হাসিমুখে আবাহন করিলেন! তারপর সীতার শঙ্কিত রুদ্ধ দৃষ্টি সহাস্য চুম্বনে উন্মোচন করিয়া রাম দেখাইলেন পরশুরাম পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।

হাজার বৎসর ধরিয়া যে কাহিনীর ভাবরস লোকের মনের মধ্যে কবিত্বে মাধুর্য্যে দানা বাঁধিয়া আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া লম্বা লম্বা সমাসে অনুপ্রাসে যমকে পদবিন্যাস করিয়া বিবিধ রাগরাগিণীতে লোকের মনকে একেবারে মাতাইয়া উতলা করিয়া তুলিয়া সুকণ্ঠ ও সুকৌশলী জগন্নাথ যখন কথা শেষ করিল, তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। লোকে মুগ্ধ হইয়া সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দ্বারকেশ্বর খুসী হইয়া তাকে কুড়িটি টাকা দিতে আসিলেন। জগন্নাথ হাত গুটাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল—আমি একটি হরিতকী ছাড়া আর কিছু নেবো না তা ত আগেই আপনাকে বলেছি।

দ্বারকেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—কিন্তু আমিও ত আপনাকে বলেছিলাম যে হরিতকীর সঙ্গে আর কিছু আপনাকে নিতে হবে।

জগন্নাথ বলিল—অর্থ ছাড়া আর যা দেবেন নেবো, কিন্তু সে দক্ষিণাও যদি আমার মনের মতন না হয়, তবে আমি আমার মনের মতন কিছু প্রার্থনা করব আপনার কাছে, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবে আপনাকে।

দ্বারকেশ্বর জগন্নাথের কথায় আশান্বিত হইয়া বলিলেন—আমার কন্যাটিকে আপনার হাতে সমর্পণ কোরে আমি ধন্য হতে চাই।

জগন্নাথ দ্বারকেশ্বরকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।

দ্বারকেশ্বর হর্ষগদ্‌গদ হইয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিলেন। বলিলেন—তা হলে পাকাপাকি কথাবার্ত্তাটা ·····

জগন্নাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—এই ত হয়ে গেল।

দ্বারকেশ্বর একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন—দেওয়া-থোয়ার বিষয়টা······

—সেটাও এখনি বলে দিচ্ছি—একখানি লাল পেড়ে শাড়ী আর দুগাছি রুলি দিয়ে আপনার কন্যাটিকে আমাকে দেবেন।

দ্বারকেশ্বর আনন্দের আতিশয্যে আবার জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিলেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—এ আপনারই উপযুক্ত কথা। মা আভার আমার বড় ভাগ্য যে আপনার মতন উদার-চিত্ত স্বামীর গলায় মালা দেবে। কিন্তু দেখ বাবা জগন্নাথ, আমার ঐ একটি মেয়ে, ওই আমার মা, আমার অরুণ আর আভা সমান, আমার যথাসর্ব্বস্বের আৰ্দ্ধেক আমার মায়ের!

জগন্নাথ একটু মৃদু কি হাসিল। ভাবটা, এ ত আমি আগে থেকেই জানি।

আহারাদি করিয়া দ্বারকেশ্বরের কাছে বিদায় লইয়া জগন্নাথ গোবিন্দর বাসায় যখন আসিল, তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গোবিন্দ শুইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তার ঘুম আসিতেছিল না। সে ভাবিতেছিল জগতের বিচিত্র জটিল ব্যবস্থার কথা ;—দ্বারকেশ্বরের বাড়ীর লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা করিতে তার বিশেষ প্রাণের টান আছে বলিয়া তার সঙ্গে দ্বারকেশ্বরের বিবাদ হইয়া গেল, ও-বাড়ীতে প্রবেশের পথ একেবারে রুদ্ধ ; আর তার দাদা সেন্টিমেন্ট বা রোমান্সের কোনো ধারই ধারে না, পূরাদস্তুর প্র্যাকটিক্যাল লোক বলিয়াই ইচ্ছা মাত্রেই উহাদের সঙ্গে এমন আত্মীয়তা জমাইয়া তুলিল যে সকাল হইতে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত তার টিকিই দেখিতে পাওয়া গেল না।

গোবিন্দর কাছে ভাঁড়াইয়া দ্বারকেশ্বরের বাড়ীতে সমস্ত দিন যাপনের লজ্জা ও কুণ্ঠা উড়াইয়া দিবার জন্য জগন্নাথ ঘরে ঢুকিয়াই একটু জোর গলায় চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—কি রে গোবিন্দ, এর মধ্যে শুয়ে পড়েছিস!

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল—রাতখানি ত কম হয় নি।

—তোর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে নাকি? আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলিনে?

—ও-বেলা একটা পর্য্যন্ত করেছিলেম; এবেলা অনাবশ্যক বলে করি নি। কথককে যারা দিনে খাইয়েছে তারা কি রাত্রে না খাইয়ে ছেড়ে দেবে?

—আমার খাবার তা হলে কিছু রাখিস্ নি?

গোবিন্দ স্বর গম্ভীর করিয়া বলিল—না।

জগন্নাথ টানিয়া টানিয়া বলিল—আচ্ছা······থাক্······ তবে......

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল—তোমার

কি খাওয়া হয় নি দাদা ? তা হলে বাজার থেকে কিছু সন্দেশ-টন্দেশ নিয়ে আসি।

জগন্নাথ উদাসীনভাবে বলিল—থাক, এতরাত্রে আর ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই ; আমায় এক গেলাস খাবার জল দে।

জগন্নাথ জোরে একটা ঢেকুর তুলিল।

গোবিন্দ বুঝিল যে দাদার আহারটা দিব্য গুরুতরই হইয়াছে। সে আর কিছু না বলিয়া, উঠিয়া কুঁজো হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া জগন্নাথের সাম্‌নে ধরিল।

জগন্নাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—জুতো পোরে জল ছুঁলি যে, কি কোরে ও-জল খাব ?

গোবিন্দ জগন্নাথের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাই সে একটু রূঢ় স্বরে বলিল—কেন, তাতে আর হয়েছে কি ? জুতো আমার হাতেও নেই, তোমার মুখেও নেই।

জগন্নাথ চটিয়া উঠিয়া বলিল—কী ! আমার মুখে জুতো বলিস, এত বড় তোর আস্পর্দ্ধা ! ·····

জগন্নাথের রাগ দেখিয়া খুসী হইয়া গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—না, ও-রকম ভেবে আমি বলিনি, আমি কেবল জুতোর সঙ্গে জলের সংস্পর্শটা কোথায় হলো তাই জান্‌তে চেয়েছিলাম। কলের ভিতরে চাম্‌ড়া ধুয়ে জল আস্‌ছে, তা যদি খেতে পারো, তবে পায়ে জুতো দিয়ে হাতে-ছোঁয়া জলও খেতে তোমার আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

জগন্নাথ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা সে কলের চাম্‌ড়া অদেখা, আর এটা সত্ত চোখের ওপর……

গোবিন্দ বাধা দিয়া বলিল—আমি ত দেখেছি তুমি যখন খাও তখন তোমার পকেটে চাম্‌ড়ার মনিব্যাগ থাকে ; তাতে দোষ হয় না ?

জগন্নাথ আরো অপ্রতিভ হইয়া বলিল—শাস্ত্রে লিখেছে—স্নায়ুহীন চর্ম্ম ধৌত বস্ত্রের ন্যায় পবিত্র। কেবল পাদুকার চর্ম্ম স্নায়ুহীন হলেও অশুচি!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—দেখ দাদা, লেখা-পড়া শিখেও যদি তুমি এম্‌নি আহাম্মকের মতন শাস্ত্র আওড়াও তা হলে আমার শ্রদ্ধা পাবে না। তার চেয়ে যদি বল্‌তে যে জুতোয় নোংরা থাকে তাই জুতো অশুচি, তা হলে তোমার সে কথা শাস্ত্র না হলেও মান্য কর্‌তাম।...... এত রাত্রে কলেও বোধ হয় জল নেই, আর আমার বাসার সব কুঁজো-কলসীই আমি জুতো পরেই ছুঁই......

জগন্নাথ গম্ভীর হইয়া বলিল—তা হলে ঐ জলই দে, বিদেশে নিয়মো নাস্তি।

গোবিন্দ জগন্নাথের হাতে গেলাস দিয়া হাসিয়া বলিল—সংস্কৃত কোরে কিছু বল্‌লেই সেটা দিব্য শাস্তরের মতন শোনায় আর মনটা বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম পায়, না দাদা?

জগন্নাথ জল পান করিয়া শূন্য গেলাসটা মাটিতে রাখিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, আর কোনো জবাব দিল না।

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া নিজের বিছানায় গিয়া শুইল। শুইয়াই তার নজর গেল আভাদের ছাদের ওপারে বারান্দার দিকে। দেখিল, সেখানে তখনও আলো জ্বলিতেছে, আর দুজন লোকের ছায়া দেয়ালের গায় বড় হইয়া পড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে নড়িতেছে।

তখন দ্বারকেশ্বর ডাক্তার খাইতে বসিয়াছিলেন আর তাঁর কন্যা আভা তাঁর কাছে বসিয়া ছিল। দ্বারকেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন কথকতা শুন্‌লি মা?

আভা উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—চমৎকার বাবা! কী সুন্দর গলা!

দ্বারকেশ্বর থালা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—লোকটির সবই সুন্দর —দেখ্‌তে শুন্‌তে কুলে শীলে সভ্যতায় ভব্যতায় জ্ঞানে বিদ্যায় উত্তম।

আভা বলিল—হ্যাঁ, শুন্‌লাম ত উনি খুব পণ্ডিত, অবস্থাও বেশ সচ্ছল, বাংলা-দেশ-জোড়া নামডাক! লোকটি খুব নকুলে, কী হাসাতে পারে! আবার করুণ রস বর্ণনাতেও ওস্তাদ! লোককে হাসিয়েই কাঁদাচ্ছিল, আবার কাঁদিয়েই হাসাচ্ছিল! এটা কম ক্ষমতা নয়!

দ্বারকেশ্বর খুসী হইয়া বলিলেন—তোর তা হলে ভালো লেগেছে?

আভা হাসিয়া বলিল—এমন জিনিস ভালো লাগ্‌বে না?

দ্বারকেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিলেন—তোর ভালো লাগ্‌বে ভেবেই আমি কথককে কথা দিয়েছি, তার হাতে তোকে দিয়ে আমি দক্ষিণান্ত কর্‌ব।

আভার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে বিস্ময় ও ভয়ে দৃষ্টি ভরিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিল, বাবার মুখের কথা সে ত ঠাট্টা মনে করিতে পারিতেছিল না, অথচ অমন কথা তার ঠাট্টা বলিয়াই মনে হইতেছিল।

দ্বারকেশ্বর মেয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়াই বলিলেন—তোর জন্যে একটি সুপাত্রের সন্ধানে মনটা বড় ব্যাকুল ছিল, ভগবান আজ দয়া কোরে এমন সুপাত্র আপনি আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন; তোরও যে তাকে ভালো লেগেছে, এইটেই আরো ভালো।

আভা এই দারুণ দুর্ঘটনার আকস্মিক আক্রমণে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল ভাবিতেছিল—কথক হিসাবে ভালো লাগিলেই যে তাকে বর হিসাবেও ভালো লাগিবে এমন সিদ্ধান্ত বাবা আমার কথা হইতে কেমন করিয়া করিলেন? বাবার এই ভুল কেমন করিয়া ভাঙিব?

আভাকে নিষ্প্রভ নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে দেখিয়া দ্বারকেশ্বর মনে করিলেন বিবাহের কথায় তার লজ্জা হইয়াছে বুঝি। দ্বারকেশ্বর তাকে

খুসী করিবার জন্য বলিলেন—এই অঘ্রাণ মাসেই তোর বিয়ে দেবো ঠিক করেছি। জগন্নাথেরও তোকে খুব পছন্দ হয়েছে! আর জানিস, জগন্নাথ ঐ ভৈরব-মুদির ভাড়াটে গোবিন্দর কি-রকম ভাই হয়। গোবিন্দটা যেমন কাঠ-গোঁয়ার, এ তার ঠিক উল্টো, সভ্য ভব্য নম্র বিনয়ী– ভদ্রলোকের যেমন হতে হয়।

আভা আস্তে আস্তে উঠিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

দ্বারকেশ্বর একাকী আহার সারিয়া আঁচাইয়া আসিয়া ডাকিলেন—আভা, ঘুমুলি?

আভা একটি ডিবের খোলে করিয়া দুটি পান লইয়া আসিয়া নীরবে বাবার কাছে দাঁড়াইল।

দ্বারকেশ্বর কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন—এখনো ঘুমোওনি? রাত যে ঢের হয়েছে মা। যাও শোওগে।

আভা নীরবে বাবার হাতে পানের ডিবে দিয়া অন্ধকার ঘরে চলিয়া গেল। দ্বারকেশ্বর আলো লইয়া নিজের ঘরে ঢুকিলেন। ছাদ দালান অন্ধকার হইয়া গেল। গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

গোবিন্দ সমস্ত রাত জাগিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া কাটাইল। ভোরের আলোয় চারিদিক প্রকাশ পাইয়া উঠিলে গোবিন্দ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া জান্‌লার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। ভোরের আভায় দূরের জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিতে-না উঠিতে আভা রোজ বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া গোবিন্দর জান্‌লার দিকে চাহিয়া থাকে; আজ গোবিন্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া অধৈর্য্য হইয়া উঠিতে লাগিল, তবু আভার দেখা নাই। জগন্নাথ উঠিয়া স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া আসিয়া দেখিল তখনও গোবিন্দ ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করিল—তুই মুখ-টুক ধুবিনে?

গোবিন্দ মুখ না ফিরাইয়াই বলিল—না।

জগন্নাথ গোবিন্দর পিছনে দাঁড়াইয়া মুচ্‌কি হাসিল। একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল—আমি এখানে খাবো না, আমার জন্যে অপেক্ষা করিস্‌নে।

গোবিন্দ তেমনি গম্ভীরভাবে বলিল—তা বল্‌বার আবশ্যক ছিল না।

জগন্নাথ হাসিতে-হাসিতে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

রোদ উঠিয়া ছাদের আল্‌সের উপর আসিয়া পড়িল; শরতের সোনালি রৌদ্র ছাদের আল্‌সের উপরকার শেওলার গায়ের শিশিরে লাগিয়া ছাদের উপর অযুত হীরা মোতি মাণিকের হাট বসাইয়া দিল। একটা ভিখারী গোপীযন্ত্র বাজাইয়া পথের ধারে গাহিতে লাগিল—"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, মা বলিয়ে উমা কেঁদেছে!" একটা মোটর-গাড়ী তার গানের মাঝে তাকে উচ্চকিত করিয়া পঁক্‌পঁক্ করিয়া ডাকিয়া মোড় ফিরিয়া চলিয়া গেল। তবু গোবিন্দর চেতনা নাই, সে একদৃষ্টে আভার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

আভা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া চিন্তার বোঝায় ক্লান্ত হইয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দ্বারকেশ্বর-বাবু আসিয়া তার দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন—আভা, এখনো উঠিস্‌নি মা! বেলা যে অনেক হয়েছে।

আভা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহির হইয়াই বাহিরের তীক্ষ্ণ আলোকে আচ্ছন্ন-দৃষ্টি হইয়া চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া সলজ্জ হাসিমুখে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সেই প্রথম দিনের মতনই বলিয়া উঠিল—বাঃ!

আভা লজ্জিত হাসিমুখে ঘাড় বাঁকাইয়া সঙ্কুচিত দৃষ্টি বাবার মুখের দিকে তুলিয়া বলিল—বড় বেলা হয়ে গেছে।

দ্বারকেশ্বর-বাবু কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—কাল শুতে রাত হয়েছিল কিনা তাই। আমি তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম—কিঁ

বলে ভালো—ঐ জগন্নাথ এসেছেন, এখানেই খাবেন, তুমি তার আয়োজন কোরে দাও গে।

আভার মুখ মলিন হইয়া উঠিল। সে একবার গোবিন্দর জান্‌লার দিকে চাহিয়া দেখিল গোবিন্দ দাঁড়াইয়া তাকে দেখিতেছে। আভা আর কোনো দিকে না তাকাইয়া, কিছু না বলিয়া, নীচে নামিয়া চলিয়া গেল। দ্বারকেশ্বর মনে করিলেন কন্যা ভাবী স্বামীর নামে লজ্জা পাইয়াছে।

আভা শৈশবে মাতৃহীন হইয়াছে; বাপ ডাক্তার, তিনি বাহিরে বাহিরে রোগী দেখিয়াই বেড়ান, তাঁর কাছেও সে বেশীক্ষণ থাকিবার অবকাশ পায় নাই; এজন্য সে আপনাকে আপনি লইয়াই এতদিন কাটাইয়াছে। তার আজকার যে দুঃখ, তাহা সে প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না, অথচ ধারণ করিতেও পারিতেছিল না। সে বাবাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছিল না যে জগন্নাথকে সে স্বামী রূপে বরণ করিয়া লইতে পারিবে না, অথচ বাবার আদেশে জগন্নাথকে পরিচর্য্যা করিবার ভার লওয়াও তার দুঃসহ বোধ হইতেছিল। আভার অত্যন্ত রাগ হইল গোবিন্দর উপর—সে কেন অমন নিষ্ক্রিয়, সে নিজে তাকে যদি লইতে না পারে, না পারুক; সে কেন নিজের ভাইএর কবল হইতে তাকে রক্ষা করিতেছে না? গোবিন্দ কি ইচ্ছা করিলে নিজের ভাইকে নিবৃত্ত করিতে পারে না?

আভা রাগে ফুলিতে-ফুলিতে হনহন করিয়া ছাদের উপর আসিয়া ভ্রু বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তীব্র তিরস্কার ভরিয়া গোবিন্দর দিকে চাহিল। গোবিন্দ এই সুন্দরী কিশোরীর তিরস্কার কৌতুক মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সে হাসি আভার মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল, আভা মনে করিল গোবিন্দ তার দুঃখ অবহেলা করিয়া তাকে অপমান করিল। সে লজ্জায়

ক্ষোভে লাল হইয়া তখনি বলিতে লাগিল—আমি ওর দিকে আর কখনো তাকাব না, আমি ওকে কক্‌খনো কিছু বল্‌ব না!

আভা শৈশবেই মাতৃহীন হইয়া সকল দুঃখই নীরবে সহ্য করিতে শিখিয়াছিল; তার ক্ষুদ্র জীবনের অভাব অভিযোগ জানাইবার কেহ ছিল না, তার মর্ম্মের বেদনা বুঝিয়া আহা করিতেও কেহ ছিল না; বাপ ডাক্তার, সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া একবার বাড়ীতে আসিয়া কেবল মুখে প্রশ্ন করিতেন—"কেমন আছ মা?" অথবা "আভা, তোমার কি চাই?" তার কি চাই তাহা বাবাকে মুখ ফুটিয়া না বলিলে তার মিলা কঠিন ছিল, অথচ বাবার কি চাই না-চাই তাহা খোঁজ করিয়া অনুমান করিয়া কিশোরী কন্যাকেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইত; ছোট্ট মা-ছোড় ভাইটির সুখস্বাচ্ছন্দ্য জোগাইবার ও অভাব-অভিযোগ পুরাইবার ভারও ছিল ছোট্ট দিদিটিরই উপর। এই অভ্যাসের দরুন আভার মন নিজের সম্বন্ধে যেমন প্রকাশ-বিমুখ হইয়া উঠিয়াছিল, পরের সুখ দুঃখ বুঝিবার দিকে তেম্‌নি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। তার জন্য একটি সুপাত্র স্থির করিয়া তার বাবা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, তাকে সেই সুপাত্রের হাতে দিয়া তার বাবা নিশ্চিন্ত হইবেন, অতএব তার ইহাতে যত ক্লেশই বোধ হোক বা অনিচ্ছা থাকুক আভা মুখ ফুটিয়া সে কথা কিছুতেই বলিতে পারিবে না, বাবার মনে ক্লেশ দিতে পারিবে না, নিজের ক্লেশ সে সহিয়া থাকিবে। আভা নিজের স্বার্থকে বাবার ইচ্ছায় এমনি করিয়া বিসর্জ্জন দিতে চাহিলেও তাহা তার ভাইএর দুঃখের আকারে বেনামিতে তার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল—সে কেবলি ভাবিতেছিল, আমি এ বাড়ী হইতে চলিয়া গেলে অরুণকে কে দেখিবে? কচি ছেলে অরুণ একলাটি কেমন করিয়া থাকিবে? আভা নিজের যে-দুঃখ স্বীকার করিবে না বলিয়া পণ করিতেছিল তাহা ভাইএর·

দুঃখের আকারে দেখা দিয়া অশ্রুজলে তার সকল পণ ভাসাইয়া দিতেছিল।

ছেলেবেলা হইতে একলা নিজের উপর নির্ভর রাখিয়া চলিতে হওয়াতে আভার চিত্ত দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হইয়াছিল। তার চোখের জল পড়িতেই সে নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময়ে অরুণ ঘরে ঢুকিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, তুই কাঁদছিলি কেন ভাই?

আভা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল, তার দুর্ব্বলতা সে এতটুকু ভাইএর কাছেও ধরা দিতে চাহে না। সে আরক্তিম মুখে হাসিয়া বলিল—আমার যে বিয়ে হবে ভাই, আমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাব, তুই একলাটি কেমন কোরে থাকবি অরুণ?

অরুণ উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—বাবা আমায় দুটো খরগোশ কিনে দেবে দিদি—সকালে বিকেলে তাদের সঙ্গে খেলা কর্‌ব আর দুপুর বেলা আমি ইস্কুলে যাব। পূজোর ছুটির পর বাবা আমাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে বলেছে।

ভাইএর এই কথায় আভার বুকের মধ্যে অশ্রুর ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া ভাইকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বন করিল।

এমন সময় ঝি ঘরের মধ্যে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—দিদিমণি, জামাই-বাবু এসেছে।

আভার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে অরুণকে ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ঝি আবার হাসিতে-হাসিতেই বলিল—দিদিমণি, তানাকে সেই রামচন্দরের লেগে জানকীর খেদের গানটা একবার গাইতে বোলো না, আমি মুখস্ত কোরে নিয়েছি—

একি কঠিন পণ করেছে পিতা,—
হরের ধনুক ভাঙ্‌বে যেই পাবে সে সীতা।
নব দুর্ব্বাদলের মতন   সখি লো যার দেহের বরণ
সেই তরুণের যুগল চরণ কেড়েছে মন জানো কি তা ?

আভা লজ্জায় ও বিরক্তিতে লাল হইয়া চুপ করিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ঝি তাহা পূর্ব্বরাগের অরুণিমা মনে করিয়া খুব খুসী হইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

আভা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল, গোবিন্দ নিজের জান্‌লার ধারে ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া তার ঘরের দিকেই তাকাইয়া আছে। তাকে দেখিয়াই গোবিন্দ একবার চেষ্টা করিয়া উৎফুল্ল হইয়া আগের মতন আভাকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু আভা তার সেই নীরব ডাকে হাসি মুখে ছাদের ধারে ঘুরিয়া আসিবার ছলে গোবিন্দর নিকটে গেল না; সে গম্ভীর মুখে নীচে নামিয়া গেল।

গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গোবিন্দ আজ কয়েক দিন হইতে লক্ষ্য করিতেছে আভার মনে কি একটা দুঃখ ক্ষোভ বা অভিমান বাসা বাঁধিয়াছে এবং আভা তাকে এড়াইয়া চলিতেছে। গোবিন্দ বুঝিতে পারিতেছিল না, সে অজ্ঞাতসারে আভার কাছে কি অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। এরকম নীরব পরিচয়ের বিপদ এই যে অলক্ষ্যে অপরাধ জমিতে পায়, অপরাধী অজ্ঞাত অপরাধের জন্য দণ্ড ভোগ করে, কিন্তু মার্জ্জনা চাহিয়া অপরাধ ক্ষালন করিবার সুযোগ সে পায় না।

গোবিন্দর এবার বি-এ এগ্‌জামিন। সারাটা দিন তার কাটে জান্‌লার ধারে হা-প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া; রাত্রি কাটে সমস্ত দিনের হিসাব নিকাশে। জগন্নাথ ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। আভার হাতের পরিবেষণে

আকণ্ঠ আহার করিয়া তৃপ্তিতে আইঢাই করিতে-করিতে জগন্নাথ যখন বাসায় ফিরিল তখনও গোবিন্দ সেই জান্‌লার ধারে দাঁড়াইয়া। জগন্নাথ হাসিয়া বলিল—হাঁরে গবা, তুই কি খাড়ো-ব্রত নিয়েছিস্? তোর না একজামিন আস্‌ছে?

গোবিন্দ কোনো কথা বলিল না, ফিরিলও না।

জগন্নাথ বলিল—আমায় কিছুদিন এখন কল্‌কাতায় থাক্‌তে হবে। আমি এই ঘরটায় থাক্‌ব; তুই ও-ঘরে পড়ার আড্ডা কর্।

গোবিন্দর না বলিতে বাধিল। জগন্নাথ চিরকেলে কেজো লোক। যেমন ব্যবস্থা অম্‌নি কাজ; সে নিজে গোবিন্দর বিছানা বই বাক্‌স অন্য ঘরে বহিয়া দিতে লাগিল। গোবিন্দ অপ্রতিভ হইয়া তার সঙ্গে জিনিস বহিতে বহিতে কেবলি বলিতে লাগিল—দাদা, তুমি ওসব টানাটানি কর্‌ছ কেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি, না হয় ভূতোকে ডাকো, সে নিয়ে যাক...

জগন্নাথ "তাতে দোষ কি, দিলামই বা বয়ে" বলিতে বলিতে গোবিন্দর জিনিস বহিতেই লাগিল; আরব্ধ কর্ম্মের মধ্যপথে নিবৃত্ত হইবার পাত্র জগন্নাথ নয়।

গোবিন্দকে ঘর হইতে সরাইয়া জগন্নাথ বেশ কায়েমী হইয়া জাঁকাইয়া বসিল। তার নস্য তামাক হুঁকো কল্‌কে গুল কয়লা থুতু গয়ের অল্প-ক্ষণের মধ্যেই সেই ঘর জুড়িয়া ফেলিল।

জগন্নাথ যতক্ষণ গোবিন্দর বাসায় থাকে ততক্ষণ সে তার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকে; যদি বা কখনো দরজা খোলা রাখে তখন সে তার ঘরে নস্য ও তামাকের ধোঁয়া উড়াইয়া এবং গুল ছাই থুতু ছড়াইয়া ঘরখানিকে এমন অগম্য করিয়া রাখে যে গোবিন্দ আভাকে একটিবার দেখিবার জন্য ছটফট্ করিলেও সে-ঘরে সে ঢুকিতে পারে না। যদি বা সে এক-আধবার দরজা খোলা পাইয়া কাশিয়া হাঁচিয়া নাকের জলে চোখের

অলে হইয়া ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করে, অমনি জগন্নাথ বলিয়া উঠে—"তুই পড়াশুনো ছেড়ে কি কোরে বেড়াস্ গবা ?" গোবিন্দ সেই ধাক্কায় আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে। জগন্নাথ বাসায় অধিকক্ষণ থাকে না। কিন্তু সে বাহির হইয়া যাইবার সময়ও ঘরখানিতে তালা বন্ধ করিয়া দিয়া যায়। গোবিন্দ যে জগন্নাথের অনুপস্থিতিতে তার সেই জান্লার ধারের অভ্যস্ত স্থানটিতে গিয়া দাঁড়াইয়া একবার আভাকে দেখিবে সে সুবিধাটুকুও সে পায় না। সমস্তক্ষণ অপাঠ্য কেতাব লইয়া গোবিন্দর মন হাঁপাইয়া উঠে; বাহিরেও কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না। আজকাল স্কুল বন্ধ, হেদোর ধারে গিয়াও যে একবার আভাকে স্কুলগাড়ীর ঘুল্‌ঘুলি দিয়া দেখিয়া আসিবে তারও জো নাই। গোবিন্দ যেন পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া সমস্ত দিন ছট্‌ফট্ করিতে থাকে।

একদিন সে আর সহিতে না পারিয়া জগন্নাথকে বলিল—আচ্ছা দাদা, তুমি বেরিয়ে যাবার সময় ঘরটাতে তালা দিয়ে যাও কেন বলো ত ?

জগন্নাথ গম্ভীর হইয়া তামাকের কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল কোম্পানির কাগজটাগজগুলো থাকে কি না।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—বাড়ীতে লোকের মধ্যে ত আমি। আমাকে কি তোমার এত ভয় ?

জগন্নাথ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল—তুই যে হুঁশো! কখন্ সমস্ত খোলা রেখে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়্‌বি—আর কল্‌কাতা শহর, পূজোর বাজার ······

গোবিন্দ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না। জগন্নাথ বসিয়া বসিয়া গম্ভীর ভাবে ভড়র ভড়র করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়া অবজ্ঞাত পাঠ্যকেতাবগুলোর অনেক দিনের সঞ্চিত ধূলা ঝাড়িয়া পড়ায় মন বসাইতে বসিল।

আভা পণ করিয়াছে যে গোবিন্দর দিকে আর তাকাইবে না। তাই সে কয়দিন গোবিন্দর জান্‌লার দিকে ভালো করিয়া তাকায় নাই; এঘর ওঘর বা উপর হইতে নীচে, অথবা নীচ হইতে উপরে, যাওয়া-আসা করিবার সময় তার চোখ অভ্যাস-বশতঃ এক-একবার গোবিন্দর জান্‌লার দিকে পড়িয়াছে মাত্র; কিন্তু যখনই চোখ পড়িয়াছে, তখনই দেখিয়াছে যে সেখানে একজন কেউ দাঁড়াইয়া অঙ্গভঙ্গী করিতেছে; আর অমনি আভা চট করিয়া চোখ ফিরাইয়া লইয়াছে। আভা গোবিন্দর উপর মর্মান্তিক চটিয়া উঠিতেছিল,——লোকটা এমন অভদ্র যে তাদের বাড়ী আসিয়া তার বাবার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়া গিয়াছে, আর এমনই সে ছোটলোক যে অপরের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে জানিয়াও একজন অপরিচিত মেয়েকে দেখিয়া সে লুব্ধ ইঙ্গিত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না?

কয়েকদিন আব্‌ছায়া আবছায়া দেখিয়া আভা বিরক্ত হইয়া উঠিল; লোকটার জ্বালায় বাড়ীতে নড়াচড়াও যে দায় হইয়া উঠিতেছে। আভা একদিন স্থির করিল, আজ যখনই ওকে ইঙ্গিত করিতে দেখিবে, অমনি তাকে ঝাঁটা বা জুতা তুলিয়া দেখাইবে; তাতেও তার ভদ্রতার জ্ঞান না ফিরিলে বাবাকে বলিয়া দিয়া তাকে আবার অপমান করাইবে।

সেদিন যেই আভা বুঝিল যে জান্‌লার ধারে দাঁড়াইয়া সেই অসভ্য লোকটা তাকে দেখিয়া ইঙ্গিত করিতেছে, অমনি সে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া দৃপ্ত মূর্ত্তিতে তার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল। অমনি আভা সবিস্ময়ে দেখিল—সে ত গোবিন্দ নয়, সে তার ভাবী স্বামী জগন্নাথ! জগন্নাথ তাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া হস্তের ইঙ্গিতে চুম্বন ছুড়িয়া দিতে লাগিল। আভার সমস্ত অন্তর একেবারে ছিছি করিয়া ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল, সে লজ্জায় ক্রোধে ঘৃণায় অবসন্ন হইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। অমনি

জগন্নাথের তীক্ষ্ণ কণ্ঠের গান শোনা গেল—মানময়ি, মুঞ্চ ময়ি মানম্ অভিমানম্।

সেইদিন হইতে ঐ জানালাটির প্রতি আভার আকর্ষণ আবার প্রবল হইয়া উঠিল; সেই জানালায় এতদিন যাকে ইঙ্গিত করিতে দেখিয়াছে সে যদি জগন্নাথ, তবে গোবিন্দ তার অভ্যস্ত স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া কোথায় গেল? প্রথম দিন জগন্নাথের অভদ্রতা দেখিয়া আভার মন যেমন সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল, পরে আর তার তেমন কুণ্ঠা বোধ হইল না; সে মনকে বুঝাইল যে, বানর মুখ খিচাইয়া ভেংচায় বলিয়া মানুষ কি বানরের দিকে তাকায় না? আভা জানালার দিকে তাকাইলেই জগন্নাথ নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে, রসের গান ছাড়ে; আভা পরম উপেক্ষা-ভরে তাকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া একবার খুঁজিয়া দেখিয়া যায় গোবিন্দর আভাস কোথাও পাওয়া যায় কি না। আভা গোবিন্দকে যতই খুঁজিয়া না পায়, ততই তার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, ততই সে বারে বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া জানালার দিকে তাকায়। আর জগন্নাথ মনে করে তার রসিকতায় মুগ্ধা নায়িকা পূর্ব্বরাগে আকৃষ্টা হইয়া তারই দর্শনলালসায় ঘুর্‌ঘুর্‌ করিতেছে। সুতরাং জগন্নাথ রসিকতার মাত্রা দ্বিগুণ বাড়াইয়া মনের আনন্দে মশ্‌গুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি নিস্ফল দিন দীর্ঘনিশ্বাসের মালা গাঁথিয়া কার্ত্তিক মাস উৎরাইয়া চলিল; আভা একমাসের মধ্যে একটিবারও গোবিন্দকে দেখিতে পাইল না। সে মনে করিল, পূজার ছুটিতে গোবিন্দ নিশ্চয় বাড়ী গিয়াছে। তবু সে গোবিন্দকে প্রত্যহ খুঁজিতে ছাড়িল না, কি জানি কোন্‌দিন সে বাড়ী হইতে ফিরিয়া তার অভ্যস্ত স্থানটিতে দাঁড়াইয়া দর্শনের প্রতীক্ষা করিবে।

গোবিন্দ প্রথম-প্রথম দিনের মধ্যে পঞ্চাশবার তার আগেকার ঘরের

দরজা ঠেলিয়া বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিত; ক্রমে সে যতই বুঝিতে পারিতে লাগিল তার দাদা ঘরে খিল দিয়া কি করে ও অত-সব প্রণয়-রসের গান কার উদ্দেশ্যে, ততই সে বিরক্ত হইয়া সে ঘরে যাইবার চেষ্টা করাও ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু আভাকে একটিবারও দেখিতে না পাইবার দুঃখ সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। গোবিন্দ এখন বুঝিতে পারিতেছিল, দিনের পর দিন শুধু চোখে চোখে দেখিয়া আভাকে সে কত গভীর ভাবে ভালো বাসিয়াছে; আভার কর্ম্মের গতির প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী নড়াচড়া আর তার একটি দুটি কথা গোবিন্দর মনের সঙ্গে তার কি ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইয়া দিয়াছে! গোবিন্দ নিজেকে অবলম্বন দিবার জন্য বই খুলিয়া বসিয়া থাকিত বটে, কিন্তু তার মন ঘুরিত আভারই দর্শনলাভের উপায় চিন্তায়। দীর্ঘ দেড় মাসের প্রতীক্ষার পর গোবিন্দ হিসাব করিয়া দেখিল, সেদিন আভার স্কুল খুলিবার তারিখ। সেই দিন সে বেলা ন'টা হইতে হেদোর ফটকের ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; মেয়ে বোঝাই লইয়া বেথুন স্কুলের লম্বা লম্বা গাড়ী গুরুগম্ভীর শব্দ করিয়া স্কুলের ফটকে মোড় ফিরিতে লাগিল আর গোবিন্দর বুকের মধ্যেও দুরদুর্ শব্দ হইতে লাগিল, পাছে গাড়ীর গভীর অন্ধকার জঠরের মধ্যে আভাকে ঠিক দেখিয়া লইতে না পারে, সেই ভয়ে তার হাত পা হিম হইয়া আসিতে লাগিল। একখানা একখানা করিয়া সব গাড়ী স্কুলে ফিরিয়া আসিল; কত গাড়ীর মেয়েরা তার ব্যগ্র লুব্ধ দৃষ্টি দেখিয়া নিজেদের মধ্যে তাকে গালি দিল; কত পথিক তাকে ব্যঙ্গ করিয়া কড়া কথা শুনাইয়া গেল; গোবিন্দর হুঁশ নাই, সে আভাকে একটিবার দেখিবে! গোবিন্দ হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিল, আভাকে সে দেখিতে পাইল না।

আভার বিবাহ আসন্ন বলিয়া সে স্কুল যাওয়া বন্ধ করিয়াছে; আর গোবিন্দ কলেজ কামাই করিয়া রোজ হেদোর গেটের ধারে রৌদ্র মাথায়

করিয়া তার প্রত্যাশায় ধন্না পাড়িতেছে। এবার গোবিন্দর এগ্‌জামিন! গোবিন্দ একবার অরুণের সন্ধান করিল, তাদের চাকরের কাছে শুনিল সে মামার বাড়ী গিয়াছে। চাকরকে আভার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

অগ্রাণ মাস আসিয়া পড়িল। গোবিন্দ হেদোর ফটকে তার নিয়মিত প্রতীক্ষার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে, এমন সময় দুখানা ঘোড়ার গাড়ী ছাদে মোট্‌মাট্‌রি বোঝাই লইয়া আসিয়া গোবিন্দর বাসার নীচের মুদির দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইল; একজন প্রৌঢ় পুরুষ তিলক-ছাবা-কাটা দাড়িগোঁপ-কামানো মুখ খড়্‌খড়ি-আঁটা গাড়ীর মাঝের একটি খোলা জান্‌লা হইতে বাহির করিয়া মুদিকে জিজ্ঞাসা করিল—৩২ নম্বর বাড়ী কোন্‌টা? গোবিন্দ.........

গোবিন্দ তাহা শুনিয়া অগ্রসর হইয়া গেল ও সেই লোকটিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—দাদামশায় যে! হঠাৎ? গাড়ীতে আর কে আছেন?

গাড়ী আসিয়া দরজায় লাগিল। সহিস দরজা খুলিয়া দিল। প্রথম গাড়ী হইতে নামিলেন—প্রৌঢ় লোকটি ও তাঁর পশ্চাতে দুজন বিধবা প্রৌঢ়া, একটি বালিকা ও একটি বালক; দ্বিতীয় গাড়ী হইতে নামিল—পাঁচ জন সধবা প্রৌঢ়া ও যুবতী।

গোবিন্দ তাঁহাদের দেখিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্য হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জেঠিমা, মা, তোমরা হঠাৎ না বোলে কয়ে কল্‌কাতায় এসে উপস্থিত যে? ব্যাপার কি?

গোবিন্দর জেঠিমা অর্থাৎ জগন্নাথের মা খুব দশাসই মানুষ; রং ফর্সা হইলেও চেহারাটা কেমন কমনীয়তাশূন্য; তাঁর মুখটা গোল আঁটাসাঁটা, মুখে কেমন একটা উগ্র কঠোর ভাব ফুটিয়া আছে। ঝগ্‌ড়াস্তে কড়া মেজাজের লোক বলিয়া গ্রামে তাঁর বেশ নামডাক। তাঁর নাম

রাসমণি। গোবিন্দর মাও বেশ ফর্সা, কিন্তু মাঝারি আকারের কৃশ লোক, মুখখানি লম্বাটে কোমল। তাঁর নাম কমলা।

জগন্নাথের মা গোবিন্দর কথা শুনিয়া একটু ক্রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—নিজে ঘট্‌কালি কোরে বিয়ের সব ঠিক করা হলো, এখন নেকা সেজে বল্‌ছেন 'হঠাৎ না বোলে কয়ে কল্‌কাতায় কেন?' কেন, তা তোরাই তুই ভাইএ জানিস্‌। আমাদের আগে একটা কথা কিছু কি জানিয়েছিস্‌ তোরা? আমরা ত যেন পরের মতন শুধু নেমন্তন্ন রক্ষে কর্‌তে এসেছি!

বাড়ীতে গোলমাল শুনিয়া জগন্নাথ নীচে আসিয়া মা ও খুড়িমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া মায়ের কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল।

গোবিন্দ অবাক হইয়া একবার জেঠিমা ও মা এবং একবার জগন্নাথের মুখের দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য্য ও আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কার বিয়ে জেঠিমা?

জগন্নাথের মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—যাঃ! জ্বালার সময় আর রঙ্গ ভালো লাগে না!

গোবিন্দ অধিকতর বিস্মিত হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিল। তার মা তার মুখ দেখিয়া বুঝিলেন, গোবিন্দ বাস্তবিকই কিছু জানে না, সে রঙ্গ বা তামাসা করিতেছে না। তিনি কোমল স্বরে বলিলেন—তোরই বাসার পাশে কে দ্বারকেশ্বর-ডাক্তার আছে, তারই মেয়ের সঙ্গে......

গোবিন্দর মনটা আনন্দে-ধড়াস্‌ করিয়া আছাড় খাইল; সে দাদার প্রতি কৃতজ্ঞ প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিল—দাদা তাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য আনন্দিত করিয়া দিবার কি চমৎকার আয়োজন সুকৌশলে করিয়াছে! আভার সঙ্গে তার বিবাহ অথচ সে এর বিন্দুবিসর্গও জানে না!

কিন্তু পরক্ষণেই তার মা তার ভ্রম ভাঙিয়া তাকে একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া

দিয়া বলিলেন—জগন্নাথের বিয়ে ! কাল গায়ে হলুদ, পরশু বিয়ে। জগন্নাথ চিঠি লিখেছিল, তুইই নাকি ঘটকালি কোরে এই বিয়ে ঠিক করেছিস্।

গোবিন্দর বুকের ভিতরটায় ধক্ করিয়া উঠিল। সে একবার রূঢ়-ভাবে জগন্নাথের মুখের দিকে চাহিয়া গাড়ীর চাল হইতে মোট নামাইতে গেল। জগন্নাথ তার গোল গোল ছোট ছোট চোখ দুটি টিম্ টিম্ করিয়া হাসিয়া বলিল—ভায়া এখন ভয়ে নেকা সাজ্ছেন !

গোবিন্দর এমন রাগ হইল যে ধাঁ করিয়া এক চড় জগন্নাথের গালে বসাইয়া ছায়, যে মুখ মায়ের সাম্নে মিথ্যা বলিতেছে তা একেবারে বাঁকাইয়া ছায় ! সে অন্যমনস্ক হইয়া মোট নামাইতেছিল ; বাসনের ছালার মধ্য হইতে চট্ ফুঁড়িয়া একটা খুন্তির বাঁট বাহির হইয়া ছিল, তাতে তার চোখের নীচে খোঁচা লাগিয়া গেল। ইহাতে গোবিন্দ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বাসনের ছালাটা আছ্ড়াইয়া শানের উপর ফেলিয়া দিল, বাসনগুলা বিকট কোলাহল করিয়া উঠিল।

জগন্নাথের মা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ওরে অপ্পেয়ে ! বাসন-গুলো গুঁড়ো কোরে ফেল্লি যে !

জগন্নাথ হাসিয়া বলিল—ভায়ার ক্রোধটি প্রচণ্ড। সরো ভায়া, আমি মোট নামাচ্ছি।

গোবিন্দ সরিয়া দাঁড়াইল। তার মা তার দিকে চাহিয়াই স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন—গোবি, তোর চোখ দিয়ে যে রক্ত পড়্ছে ! আহা কেমন কোরে লাগ্ল ? চোখের ভেতরে লাগেনি ত ?

তিনি নিজের আঁচল দিয়া গোবিন্দর চোখের রক্তধারা মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ধ আক্রোশে গম্ভীরভাবে বলিল—দাদার গায়ে-হলুদের রং !

জগন্নাথের মা অম্নি বলিয়া উঠিলেন—ষাট্ ষাট্ ! শুভকর্মের সূত্র-

পাতেই দেইজিপনা সাধ্‌ছ! চিরকেলে শত্রু তোমরা! তোমাদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাবা!

রাসমণি গোবিন্দর উপর যে দোষারোপ করিলেন, তাতে প্রকৃত-পক্ষে দোষী তাঁরাই। গোবিন্দর পিতা মৃত্যুকালে আপনার স্ত্রীপুত্র ও সম্পত্তি রক্ষার ভার দাদার উপর দিয়া যান। জগন্নাথের পিতা নাবালক গোবিন্দর সম্পত্তি অনেকখানি গ্রাস করিয়া ফেলিলে কমলা টের পাইলেন যে তাঁর পুত্রের সর্ব্বনাশ হইতেছে। কমলা শান্ত স্বভাবের লোক হইলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণ ও দৃঢ়-চরিত্র; তিনি তাঁর ভাসুরকে জেদ করিয়া ধরিলেন পৃথক হইবেন। গাঁয়ের লোকে কমলাকে ধিক্কার দিল, জগন্নাথের পিতা স্নেহের অভিমান করিয়া অনুযোগ করিলেন, রাসমণি কলহ করিলেন, তাঁর শিক্ষা অনুসারে জগন্নাথ খুড়িমাকে কখনোই ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে না বলিয়া আগ্রহ দেখাইল, কিন্তু কমলা কিছুতেই টলিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পুত্রের স্বল্পাবশেষ সম্পত্তি রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় পৃথক হওয়া। অবশেষে বাধ্য হইয়া জগন্নাথের পিতা যেন ব্যথিতের মতন অকৃতজ্ঞতায় আহত হইয়া কমলাকে পৃথক হইতে দিলেন; গ্রামের লোক কমলাকে নিন্দা ও জগন্নাথের পিতাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। মৃত্যুকালে জগন্নাথের পিতার মন বোধ হয় অনুতপ্ত হইয়াছিল. তিনি গোবিন্দকে ডাকিতে পাঠাইয়া রাসমণিকে বলিলেন লোহার সিন্দুকটা খুলিতে; কিন্তু গোবিন্দ আসিয়া দাঁড়াইতেই জগন্নাথ ও রাসমণি এমন করিয়া ঝাঁপাইয়া তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল যে জগন্নাথের পিতা গোবিন্দকে কি বলিতে বা দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তাহা আর জানিতে পারা গেল না। সেই অবধি কমলা ও গোবিন্দ রাসমণি ও জগন্নাথের মৌখিক আত্মীয়তার মূল্য বুঝিয়া রাখিয়াছে। রাসমণির কথা শুনিয়া স্পষ্টবাদী ও তেজস্বীস্বভাব

গোবিন্দ পাছে কিছু বলিয়া বসে এই ভয়ে তার মা তাড়াতাড়ি চুপিচুপি বলিলেন—চুপ্! দিদির পায়ের ধুলো নিয়ে পেন্নাম কর্।

গোবিন্দ মায়ের আদেশ পালন করিল।

গোবিন্দ জগন্নাথের আচরণে যেমন বিরক্ত হইয়াছিল, তেমনি আশ্চর্য্য হইয়াছিল। তার দাদা জুলিয়াস্ সীজারের মতন আসিয়াই দেখিল ও জয় করিল বলিয়া তার মন ঈর্ষায় ভরিয়া উঠিল ও নিজের অকর্ম্মণ্যতার ধিক্কারে সে আপনাকে শতবার লাঞ্ছনা করিতে লাগিল।

গোবিন্দর বাসায় মাত্র দুখানি ঘর। সুতরাং একখানি ঘরে পুরুষ তিনজনের ও একখানি ঘরে আটজন মেয়ের থাকিবার ব্যবস্থা হইল। দ্বারকেশ্বর ডাক্তারের বাড়ীর দিকের ঘরখানি ছোট বলিয়া সেই ঘরে পুরুষদের বাসা হইল। অনেকদিন পরে আজ গোবিন্দ আসিয়া কদম-ডালে-আচ্ছন্ন জানলার ধারে দাঁড়াইল। বহুকাল পরে গোবিন্দকে দেখিয়াই আভার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু গোবিন্দর ম্লান গম্ভীর মুখ দেখিয়া আভার মুখের হাসি তখনই মিলাইয়া গেল। কোথা হইতে অরুণ দৌড়িয়া আসিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—গোবিন্দ-বাবু, পরশু দিদির বিয়ে!

গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আজ এইমাত্র টের পেলাম ভাই, তুমি আগে আমাকে বলোনি কেন?

অরুণ চেঁচাইয়া উঠিল—আমি ত এখানে ছিলুম না, মামার বাড়ী গিয়েছিলুম্। কাল এসেছি দিদির বিয়ে দেখ্‌ব বোলে।

আভা ম্লান মুখে আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

বিয়ের দিনে বর কনের বাড়ীতে যাত্রা করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছে. বরকর্ত্তা হইয়া জগন্নাথের গ্রাম-সম্পর্কে দাদামশায় গোকুলচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাজিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন. বরযাত্ররূপে গোবিন্দর চাকর ভূতো

ও গাঁয়ের নাপিত ভূষণ প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু গোবিন্দ তখনও গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি পরিয়া কোঁচার কাপড়টা কোমরে বাঁধিয়া বসিয়া একমনে এগ্‌জামিনের পড়া করিতে ব্যস্ত ছিল।

জগন্নাথ বলিল—গবা, কাপড়-চোপড় পরে নে।

গোবিন্দ বিস্মিত হইয়া তার দিকে তাকাইয়া বলিল—কাপড় ত পরেই আছি, আবার কি পর্‌ব ?

জগন্নাথ বিরক্ত হইয়া বলিল—তুই ঐ ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কোমরে কাপড় বেঁধে যাবি নাকি ?

গোবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথায় যাব ? আমি ত কোথাও এখন যাব না।

জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—তুই তা হলে বরযাত্রী যাবিনে ?

গোবিন্দ বইএর উপর চোখ নামাইয়া বলিল—আমার এগ্‌জামিন।

জগন্নাথ বলিল—এতদিন এগ্‌জামিনের চাড় ছিল কোথায় ?

গোকুল মুখুয্যে বলিলেন—যাও ভায়া, একদিন না পড়লে আর কোনো ক্ষেতি হবে না ; ওঠ, চল।

গোবিন্দ গোকুলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—দাদা-মশায়, দাদার শ্বশুর আমায় বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল—সে তোমারই গুণে !

গোবিন্দ ধীর ভাবে উত্তর করিল—আমার গুণ ত বদ্‌লায়নি, সুতরাং আমারও যাওয়া চল্‌বে না।

জগন্নাথ উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—দাদা-মশায়, আপনি চলুন, ওটা গোঁয়ার-গোবিন্দ, ও যা জেদ ধরেছে তা ও ছাড়্‌বার পাত্রই নয়।

গোবিন্দ একমনে পড়িতে লাগিল।

জগন্নাথের মা বলিয়া উঠিলেন—এ দেইজিপনা ! আমাদের ভালো

দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে একেবারে। যেদিন থেকে আমরা এসেছি, সে দিন থেকে মুখ কোরে আছে দেখনা, যেন নুনের নৌকো বুড়ি হয়েছে।

গোবিন্দর মা আসিয়া তার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া ধীর মৃদু স্বরে ডাকিলেন—গোবি!

গোবিন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল—কেন মা?

—তুই কি সত্যিই যাবিনে?

—না মা, আমি যেতে পার্‌ব না।····· আমার এগজামিন, আর ওদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়াও হয়েছিল······

—তুই গেলিনে বলে দিদি রাগ কর্‌ছেন।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—তাঁকে ত আমার ওপর প্রসন্ন কখনো দেখেছি বোলে মনে পড়ে না।

গোবিন্দর মা ভয় পাইয়া চকিতে রাসমণির দিকে চাহিলেন। রাসমণি ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—পেসন্ন থাকা কি অম্‌নি কথার কথা! তোদের যে কচুযি্য বাক্যি আর ব্যাভার!······

গোবিন্দ ও গোবিন্দর মা চুপ করিয়া রাসমণির অনর্গল তিরস্কার শুনিতে লাগিল।

বর ও বরকর্ত্তা সভাস্থ হইলে দ্বারকেশ্বর-বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কৈ গোবিন্দ এল না?

গোকুল বলিলেন—না, তার এগ্‌জামিন······

দ্বারকেশ্বর হাসিয়া বলিলেন—এগ্‌জামিন নয়, তার রাগ। আমার বাড়ীতে পদার্পণ কর্‌বে না······

গোকুল বলিয়া উঠিলেন—না না, তা কেন, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আঢ্য গুরুজন, ও-কথা বল্‌লে তার অকল্যাণ হবে······

অরুণ এক পাশে দাঁড়াইয়া বর দেখিতেছিল। সে ছুটিয়া বাড়ী

ভিতর গিয়া আভার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দিদি ভাই, তোমাকে বিয়ে কর্তে কথক-ঠাকুর আর একটা বুড়ো বাবাজী এসেছে। গোবিন্দ-বাবু রাগ করে আসে নি, বাবা বল্লে। গোবিন্দ-বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না ?

আভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গোবিন্দর ঘরের দিকে চাহিল ; দেখিল সাম্নে আলো রাখিয়া গোবিন্দ বই খুলিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তার দৃষ্টি পড়িয়া আছে আভা যেখানে লাল চেলী পরিয়া আল্পনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর চণ্ডীর পুঁথি কোলে করিয়া বসিয়া আছে সেইখানে। আভাও তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সাত

পরদিন প্রভাতে জগন্নাথ গাঁটছড়ায় বাঁধিয়া আভাকে টানিতে টানিতে লইয়া গোবিন্দর বাসায় আসিল। এয়ো পাঁচজনে বরণ করিয়া বর-কনেকে ঘরে তুলিল।

এয়োরা একটু আড়ালে গিয়াই চোখ টেপাটিপি করিয়া বলাবলি করিতে লাগিল—কনে-বউ নয় ত, একেবারে একটা ধেড়ে মাগী।

একজন হাসিয়া বলিল—বউএর কোলটা হাৎড়ে দেখেছিস ?—ছেলে কোলে কোরে আসেনি ত ?

অপরজন বলিল—ডাগর দেখেই ঠাকুরপো আমার মরেছেন ! নইলে এমন কি আহামরি দেখ্তে !

গোবিন্দর মা জগন্নাথ ও আভাকে বলিলেন—জোগু, দিদিকে পেন্নাম কর্। বউমা, উনি তোমার শাশুড়ী, পেন্নাম করো।

উভয়ে প্রণাম করিল।

গোবিন্দর মা বলিলেন—এস, এদিকে সব্বাইকে পেন্নাম করোসে।

জগন্নাথ ও আভা একে-একে সকলকে প্রণাম করিয়া গোবিন্দ যে-ঘরে বইএর উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া ছিল সেই ঘরে আসিল। আভাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই গোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। আভা থতমত খাইয়া মুখ লাল করিয়া গোবিন্দকে প্রণাম করিতে যাইতেছিল, গোবিন্দর মা বলিয়া উঠিলেন—ওকে পেন্নাম কোরোনা বৌমা। ও তোমার ছোট দেওর!

আভা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। গোবিন্দ একবার আভার ঘোমটা-ঢাকা মুখের দিকে তাকাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

জগন্নাথ গোবিন্দর অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া বলিল—তোমার এগ্‌জামিনের পড়ার ব্যাঘাত হচ্ছে? আর একটা দিন চোখকান বুজে সয়ে থাকো, কি আর করবে বলো! সন্ধ্যের গাড়ীতেই ত আমরা বিদেয় হচ্ছি।

বিকেল-বেলা যখন বরকনে ও বরযাত্রীরা দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন গোবিন্দও নিজের বইগুলাকে তোরঙ্গে ভরিয়া বিছানা বাঁধিয়া যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত। জগন্নাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তুই কোথায় যাবি?

গোবিন্দ বিছানার গাঁটে দড়ি কষিতে কষিতে বলিল—বাড়ী।

—বাড়ী যাবি কিরে?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—বিয়ের ভোজটা খেতে পাইনি. বৌভাতের ভোজটা ছাড়্‌ব নাকি? বৌদিদির হাতের রান্নাটা খেয়ে দেখ্‌তে হবে না?

—তোর যে টেষ্ট-এগ্‌জামিন সোমবার?

গোবিন্দ বিছানার মোটটা বাঁধা শেষ করিয়া গড়াইয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আর এগ্‌জামিন টেগ্‌জামিন দেবো না। লেখা-পড়ায় ইস্তফা দিলাম।

—লেখাপড়া ছেড়ে দিবি ? কর্‌বি কি ?

—অকাজ।

—লেখাপড়া না কর্‌লে খাবি কি কোরে ?

—লোকের মধ্যে ত আমরা দুটি—মা আর আমি। মা বুড়ো হয়েছে, দুদিন বাদেই খাবি খাবে, আর আমার একলার খাবার কোনো রকমে জুটে যাবে।

গোকুল বলিলেন —এও কি একটা কথা হলো ভায়া ? বে-থা কর্‌লে খাবার লোকে যে ঘর ভরে উঠ্‌বে।

গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল—বিয়ের আর সখ নেই দাদামশায়।

গোকুল ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—কেনরে, দাদার সঙ্গে এজ্‌মালিতেই চল্‌বে না কি ?

গোবিন্দ উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—পাছে ভাইএর ভাগে পড়ে বলে দাদা তাড়াতাড়ি নাম খারিজদাখিল করে চুকেছেন !

জগন্নাথের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া একটা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে আঁচিয়া গোবিন্দর মা তাড়াতাড়ি বলিলেন—সবাই হঠাৎ এসে চলে যাচ্ছে, তাই ওর মন-কেমন কর্‌ছে। চলুক, দুদিনের জন্যে বাড়ী ঘুরে আস্‌বে।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—দুদিনের জন্যে নয় মা, চিরদিনের জন্যেই।

তার মা বলিলেন—আচ্ছা আচ্ছা তাই, এখন ওঘরে গিয়ে আমার বিছানাটা বেঁধে দিবি আয় ত।

পাশের ঘরে বসিয়া আভা গোবিন্দর সব কথা শুনিতেছিল। সেই কেবল কতকটা বুঝিতে পারিতেছিল কিসের ব্যথায় গোবিন্দ লেখাপড়া ছাড়িতে চাহিতেছে, কখনো বিয়ে করিবে না বলিতেছে, কেন কলিকাতা

ছাড়িয়া সে দেশে চলিল। সে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, হঠাৎ গোবিন্দ সেইঘরে ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিল।

জগন্নাথের মা বলিয়া উঠিলেন—"ছোট দেওরকে দেখে আবার ঘোমটা! ন্যাও ঘোম্‌টা তোলো।" বলিয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া তুলিয়া দিলেন।

আভা চকিতে একবার গোবিন্দর দিকে চাহিয়া আবাব ঘোম্‌টা নামাইয়া দিল. গোবিন্দর দিকে চাহিতে তার চোখ যে ছলছল করিয়া উঠিতেছে, তা সে ঘোম্‌টায় লুকাইয়া রাখিতে চায়।

জগন্নাথের মা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—বাবা মেয়ে বাবা! এমন কথাব অবাধ্য এখন থেকে? কচিতেই এমন, ঝুনো হলে না জানি কি হবে!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—আমরা ঝুনো হতে দেবো কেন জেঠিমা, থেঁৎলে থেঁৎলে নরম তল্‌তলে কোরে রাখ্‌ব।

জগন্নাথের মা গোবিন্দর শ্লেষ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—হ্যাঃ! তোবা আজকালকার ছেলেরা আবার বউকে থেঁৎলাবি! সে ছিলেন আমাদের ওঁরা, উঠ্‌তে কোস্তা বস্‌তে লাথি! তবে না আমরা এমন ভব্যিতা শিখ্‌তে পেরেছি।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ভয় নেই জেঠিমা; দাদা আমার তেমন খারাপ ছেলে মোটেই নয় যে বাপ-পিতম'র ধারা বৌএর খাতিরে বদ্‌লে ফেল্‌বে।

জগন্নাথের মা গোবিন্দর কথা পুত্রের প্রশংসা মনে করিয়া গর্ব্বিতভাবে বলিলেন— হ্যাঁ, তা নিজের ছেলে বোলে বল্‌ছিনে, জোগু আমার সোনার ছেলে? দেব-দ্বিজে বিশ্বাস. বাপ-মায়ে ভক্তি তার খুব।

তোদের মতন ও কালাপাহাড় নয়। ওকে উঠ্‌তে বল্‌লে ওঠে, বস্‌তে বল্‌লে বসে।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ জেঠিমা, ঐটি আমার বিশেষ দোষ যে আমি নিজের মতটাকেই বড় কোরে দেখি, পরের দোহাই মোটেই মানেনি। দাদা ও-বিষয়ে অতি সৎ!

আভা ঘোম্‌টার ভিতরে স্বামীর গুণের কথা শুনিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইতেছিল। সে আজ সদ্য শ্বশুরবাড়ী আসিয়া শাশুড়ীর কাছে যেরূপ কোমল সম্ভাষণ পাইতেছে ও স্বামীকে যেরূপ পিতৃমাতৃভক্ত বলিয়া শুনিতেছে, তাতে গোবিন্দর উপহাসে সে কিছুতেই হাসিতে পারিতেছিল না। আরব্য-উপন্যাসের কলসী-রুদ্ধ দৈত্য যেমন কলসীর মুখ খোলা পাইয়া প্রথমে ধোঁয়ার আকারে বাহির হইয়া বিকটাকার ধরিয়া মারমুখো হইয়াছিল, গোবিন্দর কথায় ও শাশুড়ীর সায়ে আভার আতঙ্ক তেমনি প্রথমে অস্পষ্ট ধোঁয়া হইতে বিকট আকার ধরিয়া তাকে ভয় পাওয়াইয়া অভিভূত করিয়া তুলিল। বাপ-ভাইকে ছাড়িয়া যাইবার বেদনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ীতে অভ্যর্থনার আভাস মিশিয়া তাকে বিমর্ষ ম্লান করিয়া তুলিল। কিন্তু সে আশৈশব বেদনা সহ্য করিতে অভ্যস্ত; ব্যাকুল হইয়া লোককে জানিতে দিল না, তার মনের মধ্যে কি ঝড় বহিতেছে।

আট

রাসমণি অত্যন্ত স্বার্থপর কড়া মেজাজের লোক। তাঁর বিনা অনুমতিতে জগন্নাথ আভাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া আভাকে তিনি সুনয়নে দেখিতে পারেন নাই। তার উপর জগন্নাথ তাঁর একমাত্র পুত্র; সে আগে যতক্ষণ বাড়ীতে থাকিত ততক্ষণ মার কাছে-কাছেই

থাকিত ; তিনিও ছেলের কাছে-কাছে থাকিতেন। কিন্তু পুত্রবধূ আসিয়া দুজনের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাতাপুত্রে যে বিচ্ছেদ ঘটাইল ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। আভা যেখানে থাকে জগন্নাথ যে এখন সেইখানেই থাকিবার জন্য ছটফট করে ও মাকে এড়াইয়া চলিবার জন্য ছল খোঁজে, ইহা রাসমণির চক্ষে আভার অমার্জ্জনীয় অপরাধ! যতক্ষণ জগন্নাথ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ তিনি মুখ ভার করিয়া থাকেন, কিন্তু জগন্নাথ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইয়া বাহিরে গেলেই তিনি বলিয়া উঠেন—বাবা মেয়ে বাবা! কাউকে একটু গেরাহ্যি নেই! দিনের বেলা শাশুড়ীর সাক্ষাতে সোয়ামীর সঙ্গে কেবল ফুস্থর-ফুস্থর গজর-গজর। এতে গুরুজনের অপমান হয়, অতবড় ধাড়ি মেয়ে এও তুমি জানো না।

শাশুড়ীর তিরস্কারে লজ্জিতা ও ব্যথিতা আভা স্বামীকে এড়াইয়া চলিতে যত চেষ্টা করে, জগন্নাথের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া উঠে। এবং জগন্নাথের ব্যস্ততা দেখিয়া রাসমণি মনে মনে তত জলিতে থাকেন।

জগন্নাথ দেখিতেছিল আভা তাকে এড়াইয়া চলিতে চায়, কিন্তু বাড়ীতে গোবিন্দ আসিয়াছে সাড়া পাইলেই সে উচ্চকিত হইয়া উঠে। তার সঙ্গে লজ্জানত আভা কথার উত্তরে মাত্র হাঁ না করিয়া কথা সারে, কিন্তু গোবিন্দর কণ্ঠস্বর শুনিলেই সে চোখ মুখ উজ্জ্বল করিয়া বলিয়া উঠে—ঐ ঠাকুরপো এসেছেন! এতে জগন্নাথের মনের মধ্যে ঈর্ষা প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একদিন আভাকে স্পষ্ট করিয়া বলিল—তুমি গোবিন্দর কাছে ঘোম্‌টা খুলে বার হয়ো না, কথা কয়ো না, বলে দিচ্ছি ; ওটা ভালো লোক নয়, ওকে তোমার বাবাও পছন্দ করেন না, জানোই ত। তোমার ওপর ওর নজর আছে।

এই কথার পর আভা স্বামীকে বলিতে পারিল না যে সে গোবিন্দর সাম্‌নে ঘোম্‌টা খুলিয়া বাহির হয় না বা কথা বলে না ; গোবিন্দর সম্পর্কে কোনো রকম উৎসাহ দেখানোও আভার পক্ষে লজ্জার কারণ হইল। অথচ তার সমস্ত দেহ মন যে গোবিন্দর এতটুকু আভাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, নিবারণ শুনিতে-চায় না,সে যে গোপন করিতেও পারে না।

রাসমণি জগন্নাথকে বৌএর আঁচল ধরিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া হাড়ে হাড়ে জ্বলিতেছিলেন। কত জায়গা হইতে কথকতা ও পুরাণ পাঠের ডাক আসিতেছে, কিন্তু জগন্নাথ সমস্তই প্রত্যাখ্যান করিতেছে। রাসমণি বর্‌দাস্ত করিতে না পারিয়া একদিন বলিলেন— হ্যাঁরে জগা, তুই পের্‌বাস-টের্‌বাস যাবি, না বৌএর আঁচল ধরে ঘরে বসে থাক্‌বি ? এইজন্যেই আমাদের হিঁদুঘরে ধেড়ে বৌ আন্‌তে নেই। আর বৌমাকেও বলি ধিক্ ! এমন বেহায়া মেয়ে আমি বাপের জন্মে দেখিনি ! জগন্নাথকে একবার অনুমতি করো, দুদিন পের্‌বাস ঘুরে আসুক, শুধু পিরিতে ত পেট ভর্‌বে না !

আভা লজ্জায় ত মাটিতে মিশিয়া যাইতেছিল। শাশুড়ীর মুখে এ কি কথা ! জগন্নাথ মায়ের কথায় ভয় ও লজ্জা পাইয়া বাড়ী হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু আভার ত পলাইবার উপায় নাই।

রাসমণি ডাকিলেন- ওগো বিবি, ঘর ছেড়ে নরলোকে বেরুবে, না কোটরেই থাক্‌বে ? ঘরকন্নায় এক সোয়ামী ছাড়া কি আর কিছু নেই ?

আভাকে এই লজ্জা-দেওয়া তিরস্কারের মুখেই বাহির হইয়া আসিতে হইল।

রাসমণি ডাকিলেন—এসে আনাজগুলো বানিয়ে দিতে পার্‌বে, না শুধু গিল্‌বে ?

আভা নীরবে আসিয়া বঁটি পাড়িয়া তর্‌কারি কুটিতে বসিল।

এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত। গোবিন্দকে দেখিয়াই আভা তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা দিল। রাসমণি বলিলেন—তোমার এই কাষ্ঠলজ্জা রাখো বৌমা। ছোট দেওরকে দেখে আবার ঘোম্‌টা! সোয়ামীর সঙ্গে সারা দিন বক্‌তে ত লজ্জা করে না। খোলো ঘোম্‌টা!

কিন্তু ঘোম্‌টা দিতে স্বামীর যে আদেশ আছে। আভা কেমন করিয়া ঘোম্‌টা খুলিবে? আর গোবিন্দর কাছে মুখ দেখাইতে তার যে বিষম লজ্জা আর দুঃখ বোধ হয়, তাই বা সে ঘোম্‌টা বিনা ঢাকিবে কেমন করিয়া? আভা মাথা নত করিয়া তরকারি কুটিতে লাগিল, ঘোম্‌টা খুলিল না।

রাসমণি ক্রুদ্ধ হইয়া লাফাইয়া পড়িয়া আভার মাথার ঘোম্‌টা খুলিয়া দিলেন। তাঁর মুখে কথার ঝড় বহিতে লাগিল—এত বড় হেনস্থা! এমন কথার অবাধ্যি! তুমি কি মনে কর—ও একটা দাসী-বাঁদী বকে মর্‌ছে মর্‌কগে! আমার চোখ-রাঙানি দেখে জগা এখনো ডরায়, তা জানো! তুমি মনে কর্‌ছ তার আস্কারা পেয়ে আমায় অপমান কর্‌বে, তা মনের কোণেও ঠাঁই দিয়ো না……

গোবিন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল—জেঠিমা, রান্নাঘরে ডাল উথ্‌লে পড়্‌ছে।

রাসমণি ছুটিয়া রান্নাঘরে গেলেন। গোবিন্দ আভাকে বকুনি হইতে নিস্তার করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল; আভাও চকিতে নত চোখ তুলিয়া চাহিতেই ম্লান হাসি তার রাঙা ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল।

ঠিক সেই সময় জগন্নাথ বাড়ীতে ঢুকিয়া দেখিল আভার মাথায় ঘোম্‌টা নাই এবং গোবিন্দ ও আভার হাসির বিনিময়। জগন্নাথের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে আসিয়া আভার সাম্‌নে চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল। আভা তাকে দেখিয়া মাথার ঘোম্‌টা নামাইয়া দিল।

রাসমণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ও পোড়াকপাল! ও কি রকম করে পটল বানানো হচ্ছে! সমস্ত খুব্‌লে খুব্‌লে! ঝোলের পটল বুঝি তেরছা করে কোটে! একি চচ্চড়ি হবে যে অমন করে কুটুলে?

রাসমণি আসিয়া আভার নিকট হইতে বঁটি কাড়িয়া লইয়া তাকে ঠেলিয়া দিলেন। আভা পড়িতে-পড়িতে সাম্‌লাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—জেঠিমা, তেরছা পটলও সেদ্ধ হয়, গোল পটলও সেদ্ধ হয়, আর খেতে দুই সমানই লাগে।

রাসমণি নাক ঘুরাইয়া বলিলেন—তা যে-তরকারির যেমন রীতি তেমন না হলে কখনো তরকারি মানায়! হ্যাঁগা বৌমা, সব কটি পটলই শেষ করে ছেড়েছ? ভাতে দেবার জন্যে একটা রাখোনি!

গোবিন্দ বলিল—ঐ কোটা পটলই ভাতে দাও না জেঠিমা, চটকে নিলে গোটা কোটা ত সব সমান হয়ে যাবে।

—তোর বিধান আমি শুনতে চাইনে। ওগো কশ্মিষ্ঠি, রুটি সেঁকতে পারো যদি ত রুটি কখানা সেঁকে নাওগে একটু পায়ে করে। কেবল হাসিমস্করা নিয়ে থাকলেই সংসার চলে না।

আভা লোকের সাম্‌নে থেকে পলাইয়া রান্নাঘরে লুকাইয়া বাঁচিল। রাসমণি ছেলেকে শুনাইয়া বৌকে তিরস্কার করিলেন; জগন্নাথ কিন্তু মনে করিল রাসমণি বোধ হয় গোবিন্দ ও আভার হাসিকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। গোবিন্দ ও আভাকে মা তিরস্কার করিতেছেন মনে করিয়া জগন্নাথ খুসী হইয়া উঠিল।

রাসমণি উঠিয়া ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতে গিয়া দেখিলেন আভা ঘর ঝাঁট দিয়া বিছানা পাতিয়া গিয়াছে। রাসমণি তপ্ত হইয়া চীৎকার

করিলেন—বৌমা, তোমার সকল তাতে এত কর্ত্তাত্ব কেন? কে তোমায় ঘর ঝাঁট দিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি বিছানা পাত্‌তে বল্‌লে!

এর মধ্যে যে অপরাধ কোথায় তাহা আভা বা গোবিন্দ ধরিতে পারিল না। রাসমণি রাগে আগুন হইয়া পাতা বিছানা টানিয়া হিঁচ্‌ড়াইয়া তুলিয়া ছড়াইয়া দুমদাম শব্দ করিয়া ঘর তোলপাড় করিতে লাগিলেন; তার পর আবার ঘর ঝাঁট দিয়া নিজে বিছানা পাড়ার কাজ আরম্ভ করিলেন। কোথায় যে ত্রুটি হইয়াছিল, তা একবারও প্রকাশ করিয়া বলিলেন না।

রসমণি ঘরের কাজ সারিয়া রান্নাঘরে আসিয়া দেখিলেন, আভা রুটিতে ঘি মাখাইতেছে। রাসমণি কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—রুটিতে ঘি মাখ্‌তে তোমায় কে বল্‌লে শুনি? রুটিতে জলের হাত বুলিয়েছ?

আভা ভয়ে আকাট হইয়া মৃদু স্বরে বলিল—না। জল দিলে রুটি প্যাক্‌পেঁকে হয়ে যায় বলে দিইনি।

রাসমণি রুটিগুলা টানিয়া উঠানে ফেলিয়া দিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—ঝকমারি করেছি মা, তোমায় কাজ কর্‌তে বলেছি! যাও পটের বিবি, বিছানা পাড়া হয়েছে, শোওগে। পদসেবা করে দেবো গিয়ে?

গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। গোবিন্দকে দুঃখ পাইতে দেখিয়া জগন্নাথ যেমন সুখী হইল তেম্‌নি হিংসায় জলিয়াও উঠিল।

আভা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া ঘরে গিয়া লুকাইল। সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথও ঘরে গেল। জগন্নাথকে দেখিয়াই আভার দুই চোখ ছাপাইয়া জল উথলিয়া পড়িতে চাহিল। কিন্তু জগন্নাথের কথার ধাক্কা খাইয়া তার পড়-পড় চোখের জল থমকিয়া গেল। জগন্নাথ বলিল—তুমি আবার

গোবিন্দর সঙ্গে হাসাহাসি কর্‌ছিলে? এরকম নষ্ট মেয়েমানুষকে জুতিয়ে সোজা না কর্‌লে কি কথা শোনানো যায় না!

স্বামীর সম্ভাষণ আভাকে স্তম্ভিত করিল। জগন্নাথ মায়ের অকারণ বকুনির জন্য তাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে মনে করিয়া অভিমানে আভার চোখে যে অশ্রু ছলছল করিতেছিল তাহা অপমানে শুকাইয়া গেল। গোবিন্দর হাত হইতে তাকে কাড়িয়া লইয়া অকারণে আবার গোবিন্দকেই কটু কথা বলিয়া অপমান! আভাকে গোবিন্দ হেন স্বামী লাভে বঞ্চিত করিয়া দুঃখের উপর অকথ্য অপমান করিতেও এর সঙ্কোচ হয় না! এই হৃদয়হীনের কাছে আভাকে হৃদয়মন সমর্পণ করিয়া আত্মদান করিতে হইবে! আভার সমস্ত অন্তর তাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল; এতদিন যে সে স্বামীর আদর সোহাগ সহ্য করিযাছে তাহা তার বিদ্রূপ বলিয়া মনে হইল, তাতে তার নিজেকে ব্যভিচারিণী বলিয়া মনে হইল—তার নিজের কাছে নিজের লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

আভাকে নীরব ও মলিন দেখিয়া জগন্নাথ নিজের পৌরুষগর্বে পুলকিত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দ জগন্নাথের বাড়ী হইতে ম্লান মুখে বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া দেখিল তার মা গায়ে একখানি নামাবলী জড়াইয়া বসিয়া হরিনাম জপ করিতেছেন। গোবিন্দ আসিয়া ছেলেমানুষের মতন মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া মাটিতেই শুইয়া পড়িল। মা পুত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন—কবে কল্‌কাতায় যাবি গোবি?

গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া বলিল—আর গিয়ে কি হবে মা?

পুত্রের কথায় একটি প্রচ্ছন্ন বেদনা মায়ের মন অনুভব করিতে পারিল। তিনি বলিলেন—হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিবি কেন বল্ ত?

—আর ভূতের বেগার খেটেই বা কি হবে? পাশ-টাশ করা ত

লোকের কাছে বাহাদুরীর পরিচয় জানিয়ে নিজের প্রতিপত্তি জমিয়ে নেওয়ার জন্যে? তার আমার আর দরকার কি মা? নিজের জন্যে যে-টুকু লেখাপড়ার দরকার তা ঘরে বসেও হবে। আমরা ত দুটি প্রাণী—তুমি বিধবা, আমি ব্রহ্মচারী—আমাদের একবেলার হবিষ্যির জন্যে লোকের কাছে আর মিথ্যে আপনাকে জাহির কর্‌তে যাই কেন?

—ষাট ষাট ওকি কথা গোবি? তুই বি-এ পাশ কর্‌লেই যে খাসা বৌ এনে আমার ঘর আলো কোরে দিবি বোলে সেদিন চিঠি লিখেছিলি!

—সেইরকম আশা তখন ছিল মা। কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হল অন্যরকম। সেই খাসা বৌটি অন্য ঘর আলো করেছেন; তোমার ঘর আলো কর্‌বার জন্যে আমিই একলা এসে বাড়ীতে রইলাম।

—জগৎব্রহ্মাণ্ডে কি শুধু সেই একটিই মেয়ে ছিল? সুন্দর ভালো মেয়ে কি আর মিল্‌বে না, যে, তুই এমন হতাশ হচ্ছিস?

গোবিন্দ মায়ের কোলে একটু নড়িয়া শুইয়া বলিল—হতাশ হবার ছেলে কি তোমার গোবিন্দ? যাকে ভালো লেগেছিল তাকে পেতাম ভালো, না পেলাম চুকে গেল—অনেক পণ্ডশ্রম বেঁচে গেল—রাত জেগে পড়া, এগ্‌জামিন দেওয়া, বুকের মধ্যে ধুক্‌পুকুনি নিয়ে দিন গোণা, তার পর পাশফেলের জুয়াখেলা! এ একেবারে পরম নিশ্চিন্ত, মায়ের কোলে ছেলে দিব্যি আরামে থাক্‌বে।

গোবিন্দর মা চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি ত ছেলেকে চিনিতেন ছেলেবেলা হইতে সে কিরকম একগুঁয়ে। একদিন বৈশাখ মাসের দুপুর বেলা কাঠফাটা প্রচণ্ড রৌদ্রে গোবিন্দ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া তার মা বারবার বারণ করিয়াও যখন তাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন তাকে ধরিয়া আনিয়া প্রতপ্ত সানের উপর দাঁড়

করাইয়া বলিয়াছিলেন—'হতভাগা ছেলে! থাক দেখি এই রোদ্দুরে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে!' গোবিন্দ সেই তপ্ত সানের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। মা মনে করিয়াছিলেন যে-সানের উপর তিনি পা পাতিতে পারিতেছেন না, তার উপর কচি পা রাখিতে না পারিয়া পুত্র তখনি ঘরে ছুটিয়া আসিবে। কিন্তু একগুঁয়ে গোবিন্দ সেই রৌদ্র মাথায় করিয়া তপ্ত সানের উপর ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। মা পুত্রের জেদ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন; প্রথমে ডাকাডাকি করিলেন, ধমক দিলেন, ধমক ক্রমে অনুনয়ে পরিণত হইল; তিনি নিজে সানে পা দিতে পারেন না, তবু পা পুড়াইয়া ছেলের হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন; তথাপি গোবিন্দ নড়িল না, কেবল গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'এখনো এক ঘণ্টা হয় নি।' অনেক টানা-টানি করিয়া গায়ের জোরে যখন তাকে ঘরে তুলিলেন তখন দেখা গেল গোবিন্দর দুই পায়ের তলায় মস্ত মস্ত ফোস্কা হইয়াছে ও জ্বরে তার গা পুড়িয়া যাইতেছে। আর একবার গোবিন্দ অসময়ে জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিতেছিল, তাহা দেখিয়া তার মা বলিয়াছিলেন—'রোস্ ত তোকে ডুবিয়ে দিচ্ছি।' ইহাতে গোবিন্দ নিজেই এমন ডুব মারিয়াছিল যে পাড়ার লোকদের ডাকিয়া মৃতকল্প তাকে জলের তল হইতে তুলিতে হইয়াছিল, সে জলের তলে একটা খুঁটি আঁকড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া ছিল। অন্য একবার সে গাছে উঠিয়াছিল দেখিয়া তার মা শাসন করিয়াছিলেন—'নাব দেখি গাছ থেকে একবার, তারপর তুই আছিস কি আমি আছি।' গোবিন্দ সেই গাছের উপরেই সমস্ত দিন বসিয়া রহিল, না নাওয়া না খাওয়া। শেষে তার মা যখন সাধ্যসাধনা করিয়াও তাকে নামাইতে পারি-লেন না তখন আঁকুষীতে খাবারের পুঁটুলি বাঁধিয়া তুলিয়া ধরিয়া ছেলেকে খাওয়াইলেন। গভীর রাত্রে যখন গোবিন্দ নিজের কাপড় দিয়া ডালের সঙ্গে নিজেকে বাঁধিয়া গাছের উপরই ঘুমাইয়া পড়িল, তখন বাড়ীর চাকর

ভুতো তাকে কোলে করিয়া অনেক কষ্টে নামাইয়া আনিয়াছিল। বড় হইয়াও গোবিন্দর সেই একগুঁয়েমি একটুও কমে নাই। সে যখন যাহা ধরিয়াছে তখনই তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। গোবিন্দর চরিত্রের এই জেদ ও তেজস্বিতা, দৃঢ়তা ও শক্তি তার মাতার নিকট হইতেই সে পাইয়াছিল, কমলা কোমল-চিত্ত হইলেও যাহা উচিত বা উত্তম বলিয়া বুঝিতেন, তাহা সমর্থন ও সম্পন্ন করিতে একটুও ইতস্তত করিতেন না, কোনো বাধাবিঘ্নই তাঁকে সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিত না; তাঁর এই দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই তিনি ভাসুরের সংসার হইতে পৃথক হইয়া পুত্রের জন্য সামান্য সম্পত্তিও রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, কাহারও বাধা তাঁকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই; তারপর গোবিন্দ বড় হইলে তিনি সমস্ত গ্রামের নিষেধ ও প্রতিকূলতা উপেক্ষা করিয়া তাকে ইংরেজী পড়িতে দিয়াছিলেন; গুরু-গোষ্ঠীর ছেলে ইংরেজী পড়িতেছে বলিয়া গ্রামের আত্মীয়েরা ও দূরের শিষ্যেরা সকলেই তাঁকে অনুযোগ করিল; কিন্তু কমলা সকলকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন যে গোবিন্দ কখনো গুরুগিরি করিবে না, সুতরাং কাহারও শঙ্কিত হওয়া অনাবশ্যক। কমলা নিজের এই মানসিক বল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, এইজন্য তিনি পুত্রের সজীব স্বাধীনতা কখনো শাসনের দ্বারা দমন করিতে চেষ্টা করিতেন না; তিনি বরং পুত্রকে নিজে বুঝিয়া কাজ করিবার যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়া তার মনকেও সতেজ ও বলিষ্ঠ হইতে সাহায্য করিতেন। কমলা এইরূপে নিজের প্রকৃতি দিয়া গোবিন্দকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পুত্রের মতকেও মান্য করিতেন এবং পুত্রের স্বভাব বেশ চিনিতেন। সুতরাং তিনি বুঝিলেন গোবিন্দ যখন ধরিয়াছে সে আর লেখাপড়া করিবে না তখন তাকে বুঝানো বৃথা; যদি তার কখনো নিজের খেয়াল হয় তখন আবার হয় ত পড়িতে যাইবে; কিন্তু কয়েকটা দিনের জন্য এগ্‌জামিন না দিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়াও

জন্য তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—নাই যদি পড়্‌বি ঠিক করেছিস্‌ তবে কল্‌কাতায় বাসা রেখে মাসের মাস ভাড়া গোনা কেন? বাড়ীটা ছেড়ে দিলেই ত হয়।

গোবিন্দ হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না মা, ও বাড়ীটা থাক, মধ্যে মধ্যে আমায় হয়ত কল্‌কাতায় গিয়েও থাক্‌তে হতে পারে। আমি আপাতত সোমবার কল্‌কাতায় যাব।

তার মা পুত্রের এই দীর্ঘনিশ্বাস নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করিয়া বলিলেন—সেদিন ত জগন্নাথের বৌও বাপের বাড়ী যাবে শুন্‌ছি।

গোবিন্দ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল—তা যাবে হয় ত। কিন্তু আভাকে তুমি জগন্নাথের বৌ বোলো না মা. হয় আভা বোলো, নয় বৌমা বোলো—বৌমা বল্‌লেও আমি বুঝ্‌তে পারব। জগন্নাথের বৌ বল্‌লে আমার ভালো লাগে না।

গোবিন্দর মা পুত্রের ব্যস্ততার কারণ কতক আন্দাজে বুঝিয়া এবং কতক না বুঝিয়া ব্যথিত হৃদয়ে তার মুখের দিকে চাহিলেন এবং অস্ফুটস্বরে বলিলেন—হরিহে দীনবন্ধু!

নয়

জগন্নাথের ঘৃণিত সন্দেহ আভাকে এমন আঘাত করিয়াছিল যে সে স্বামীর কাছে কিছুতেই প্রফুল্ল হইতে পারিতেছিল না, জগন্নাথের সঙ্গ তার আগ্রহ না জাগাইয়া তার বিরক্তি জাগাইত।

ইহা অনুভব করিয়া জগন্নাথ স্ত্রীর প্রতি বেশী সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে করিতেছিল তার স্ত্রীর তার প্রতি এই যে উপেক্ষা ও অবহেলা তাহা গোবিন্দর প্রতি আসক্তির জন্যই। সে ত লক্ষ্য

করিয়া দেখিয়াছে, গোবিন্দর সাড়া পাইলে আভার চোখ মুখ কি রকম প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।

গোবিন্দ যখন-তখন ঘন ঘনই এ বাড়ীতে আসে। ইহা জগন্নাথের ভালো ত লাগেই না, অধিকন্তু সে আভাকে জিজ্ঞাসা করে—গোবিন্দ যে এত ঘন ঘন এ বাড়ীতে আসে তার মানে কি?

আভা এ কথার কোনো উত্তর দিতেও ঘৃণা বোধ করে। সে কী জানে যে গোবিন্দ তার দাদার বাড়ীতে কেন আসে? গোবিন্দ হয়ত তাকেই বার বার দেখিবার লোভেই আসে; কিন্তু এ দেখা ত শুধু দেখা মাত্রই, তার অতিরিক্ত কামনার পরিচয় ত তারা কোনো দিন আচারে আচরণে বাক্যে ব্যবহারে প্রকাশ করে নাই। তবে লোকে এমন অসঙ্গত প্রশ্ন করিবে কেন? গোবিন্দর সঙ্গে তার কথা কহিতে স্বামীর বারণ, আবার সে গোবিন্দর সঙ্গে কথা কহে না বলিয়া শাশুড়ীর নির্য্যাতন; সে একজনের কাছে অন্যজনের আদেশের কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, মাঝে পড়িয়া নির্য্যাতন সহিতে হয় তাকেই। সে গোবিন্দর সাম্‌নে ঘোম্‌টাই ছায়, কথাও বলে না—ইহা তার স্বামীর আদেশ মান্য করিয়া নহে। প্রথম কারণ, তার নিজের দুঃখ সে গোবিন্দর সাম্‌নে গোপন রাখিতে পারিবে না বলিয়া; দ্বিতীয় কারণ, তার স্বামীর মনে যে অন্যায় সন্দেহ জমিয়া উঠেতেছে তার কাছে গোবিন্দকে অধিকতর দায়ী ও দোষী করিয়া তুলিবে না বলিয়া।

রাসমণি দেখিতেছিলেন তাঁর বারম্বার আদেশ সত্ত্বেও আভা তাঁর কথা মান্য করে না। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া যখন-তখন ছেলের কাছে নালিশ করেন—ওরে জগা, তোর বিবি বৌএর কি আমি বাঁদি না দাসী, যে আমার একটা কথা ও গেরাহ্যি করে না?

এইটুকু মাত্র শুনিয়াই, কি আদেশ পালন করে না তাহা না জিজ্ঞাসা

করিয়াই, জগন্নাথ গর্জ্জন করিয়া ওঠে—মার কথা শোনো না কেন? জুতিয়ে তোমার হাড় ভেঙে দেবো জানো।

ছেলে বৌকে শাসন করিতেছে দেখিয়া রাসমণি খুসী হইয়া বলেন—জোগু আমার যাই একালের ছেলের মতন নয়; মায়ের ওপর ওর ভক্তি ছেদ্দা আছে, নইলে ত ও বৌ আমার মুখে লাথি মেরে মেরে চলত।

আভা নীরবে নত মুখে দুই পক্ষের ইতর গালাগালি ও তিরস্কার সহ্য করে, সে স্বামীকে মুখ ফুটিয়া বলে না যে তোমার আদেশ মান্ত করিতে গিয়াই তোমার মার আদেশ অবহেলা করিতে হয়।

একদিন এইরকম অকারণ তিরস্কার খাইয়া রোদ-লাগা ফুলটির মতন মুখখানি ম্লান করিয়া আভা একলা একঘরে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। হঠাৎ তার পিছনে তার শাশুড়ীর কর্কশ সম্ভাষণ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল—বলি হ্যাঁগা বড়মানুষের ঝি, ভর সন্ধ্যেবেলা গেরস্তর বৌ ঘরের কোণে বসে করছ কি? তোমার বড়মানুষ বাপ তোমায় কেবল কতক-গুলো বইই পড়িয়েছে, ঘরসংসারের কাজকর্ম্ম কিছু কি শেখায়নি?

আভা অকারণে পিতাকে লাঞ্ছিত হইতে শুনিয়া ব্যথিত হইয়া ধড়মড় করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া ছলছল চোখে একবার শাশুড়ীর নিরেট ভাঁটার মতন কঠিন মুখের দিকে চাহিল, এবং নিজের উচ্ছ্বসিত বেদনা দমন করিয়া লইয়া মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কি করতে হবে মা?

শাশুডী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—করতে হবে তোমার বাপের ছেরাদ্দ! ভর সন্ধ্যেবেলা ঘরে চৌকাঠে জল দিতে হয়, ঘরে ঘরে সন্ধ্যো দেখাতে হয়, তাও কি জানো না বাছা!

জগতে আভার ভালোবাসার লোক ছিল দুটি—তার বাবা আর ভাই। অকারণে তার বাবাকে কটু গালাগালি করাতে আভার অন্তরে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। কিন্তু সে ছেলেবেলা হইতে সমস্ত দুঃখ নিজের

মধ্যে সংরুদ্ধ রাখিতে অভ্যাস করিয়া নির্ভীক দৃঢ় প্রকৃতির হইয়া উঠিয়াছিল। সে কাজ করিতে যাইবে বলিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শাশুড়ীর অকারণ তিরস্কারে বিমুখ হইয়া কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া শাশুড়ীর দিকে পিছন ফিরিয়া জান্‌লায় গিয়া বসিল।

তার শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—উঃ! এত বড় তেজ! আসুক জগা বাড়ী, আগে তোমায় জুতো খাওয়াব তবে আমার অন্য কাজ!

রাসমণি হনহন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া দালানে গিয়া ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িলেন আর আপন মনে বলিতে লাগিলেন—আসুক একবার জগা! আসুক একবার জগা!

আভা দুটি গরাদে ধরিয়া গরাদের উপর মুখ রাখিয়া বাহিরে আকাশের গায়ে একটি তারার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার একবার মনে হইল উঠিয়া গিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে দিয়া আসে। কিন্তু তখনই আবার মনে হইল তার শাশুড়ী মনে করিবেন জুতো খাইবার ভয়ে সে কাজ করিতে গিয়াছে। আর সে নড়িতে পারিল না, স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

বাড়ীর ঝি প্রদীপ জ্বালিতে গিয়া গিন্নির ধমক খাইল। তখন সে আভার কাছে আসিয়া বলিল—বৌমা, ঘরে দোরে সন্ধ্যে না পড়্‌লে গেরস্তর অকল্যেণ হয়, উঠে গিয়ে বাছা পিদ্দিম কটা জ্বেলে দেবে চলো।

আভা যেমন আকাশের তারার দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া রহিল, একটু নড়িলও না।

ঝি আভার জেদ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—তুমি ত বাছা ভালো মেয়ে নও! শাউড়ী তোমায় এমন কি বলেছে যে এত বড় খোট! সোয়ামি এসে খোয়ার কর্‌বে সেই কি ভালো? এখনো উঠে চলো বাছা!

আভা নড়িল না। রাসমণি ধমক দিয়া ঝিকে বলিয়া উঠিলেন—সৈরবী, তোর এত মাথা ব্যথা কেন বল্ ত? তুই চুপ কোরে বোসে থাক্‌গে যা।

ঝি ফর্‌কাইয়া চলিয়া গেল। আভা তেমনি বসিয়াই রহিল।

অন্ধকারে বাড়ী ভরিয়া উঠিল। কোথাও কারো সাড়াশব্দ নাই। সমস্ত বাড়ী হানাবাড়ীর মতন ছমছম করিতেছে।

অনেক রাত্রে জগন্নাথ বাড়ীতে ফিরিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ অন্ধকার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ডাকিল—মা!

তার মা গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন—কেন?

—আলো-টালো জ্বালা হয় নি, রান্না চড়েনি, ব্যাপার কি?

রাসমণি ভারী গলায় বলিলেন—ব্যাপার কি তোমার বৌকে জিজ্ঞাসা করো।

জগন্নাথ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—হয়েছে কি?

রাসমণি ঝাঝিয়া বলিয়া উঠিলেন—হবে আর কি? নবাবনন্দিনীকে সন্ধ্যা জ্বাল্‌তে বল্‌লাম, তিনি নড়্‌লেন না। ঐ ত সৈরবী রয়েছে, বলুক, আমি ওকে এর বেশী একটা কথা কিছু বলেছি যে ও অমন অপমানটা আমায় কর্‌লে? তাই আমি দিব্যি করেছি তোকে দিয়ে ওকে জুতো খাওয়াব তবে জলগ্রহণ কর্‌ব। ভেঙে দে ত জুতো মেরে ওর দেমাক।

জগন্নাথ আশৈশব এই দজ্জাল উগ্রপ্রকৃতির মায়ের শাসনে মানুষ; মায়ের আদেশ নির্ব্বিচারে পালন না করিলে তার পিঠ ভাঙিয়া যাইত, দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত থাকিত না; সেই অভ্যাস তার প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; সে মায়ের শাসনে ক্রমাগত পরিচালিত হইয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্য হইয়া উঠিয়াছিল; সে নিজে বিচার করিয়া একটা কাজও করিতে পারিত না, সে শাস্ত্রের শাসন, লোকাচারের শাসন,

মায়ের শাসন, নির্ব্বিচারেই পালন করিয়া চলিত; বড় হইয়া লেখা-পড়া শিখিয়া মায়ের কড়া আদেশ পালন করাকে সে মাতৃভক্তির জাঁকালো নাম দিয়া পালিশ করিয়া লইয়াছিল—তাতে তার মন কোনো রকম গ্লানি অনুভব করিত না এবং সস্তায় গাঁয়ের লোকের প্রশংসা ও বাহবা পাইয়া যাইত। সে মায়ের আদেশ পালন করিয়া করিয়া এমন যন্ত্রের মতন হইয়া গিয়াছিল যে কাওয়াজের সৈনিকের মতন আদেশ মাত্রই সে তাহা পালন করিত, বিচার করিবার অবসর সে পাইত না। সুতরাং এখন মায়ের আদেশ পাইয়াই জগন্নাথ চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায় গেল সে?

রাসমণি মিহি সুরে বলিলেন—ঐ ঘরে বসে আছেন! বাপে দশটা দাসী বাঁদী দিয়েছে, তারাই কাজ করুছে!

জগন্নাথ অন্ধকারে হাৎড়াইয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া একটা সিন্দুকের ধাক্কা খাইল। চোট খাইয়া আরো চটিয়া গিয়া পায়ের জুতা খুলিয়া আভাকে ঘা-কতক লাগাইয়া দিতে দিতে হাত ধরিয়া হ্যাঁচ্কা টান দিয়া বলিল—যা বল্‌ছি, আলো জ্বাল্‌তে।

জগন্নাথের হ্যাঁচ্কা-টানে আভা জান্‌লা হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না।

ঝি বলিয়া উঠিল—আর মেরো-ধরোনি বাপু, আমি আলো কটা জ্বেলে দিচ্ছি।

গোবিন্দদের বাড়ী জগন্নাথের বাড়ীর পাশেই। বাড়ী হইতে চেঁচা-মেচি শুনিয়া গোবিন্দ তাড়াতাড়ি এ বাড়ীতে ঢুকিয়াই ঝিয়ের কথা শুনিতে পাইল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে না পাইয়া কে কাহাকে মারিতেছে বুঝিতে পারিল না। থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঝি আলো জ্বালিয়া আনিতেই হঠাৎ উঠানে গোবিন্দকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—কে গা?

'আমি গোবিন্দ'—বলিয়া গোবিন্দ আলোর সঙ্গে-সঙ্গে অগ্রসর হইয়া আসিল।

তাকে আসিতে দেখিয়াই রাসমণি প্রথমে লজ্জায় থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া পরে রাগে ফুলিতে লাগিলেন। জগন্নাথ হাতের জুতোটা ফেলিয়া দিয়া অপ্রতিভ মুখে আভাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া আসিল। আভা অপমানের লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া ঘোমটা টানিয়া গোবিন্দর দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেল।

গোবিন্দ ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে পূর্ণ হইয়া বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিল—দাদা বুঝি বৌদিদির সঙ্গে প্রেমালাপ কর্‌ছিলে ?

জগন্নাথ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলিল—মা দিব্যি করেছিলেন, কি করি.........

গোবিন্দ তেমনি হাসিয়া বলিল—বেশ করেছ দাদা! পরশুরাম বাপের আজ্ঞায় মাকে কেটেছিলেন, আর তুমি মায়ের আজ্ঞায় বৌকে জুতোই মেরেছ বই ত নয়। মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কোনো পুত্রেরই করা উচিত নয়।

রাসমণি গোবিন্দর শ্লেষ বুঝিতে না পারিয়া আশ্বস্ত ও শান্ত হইলেন; গোবিন্দকে দেখিয়া যে লজ্জা ও রাগ হইয়াছিল তাহা কাটিয়া গেল। তিনি গর্ব্বিতভাবে বলিলেন—জোগু আমার শাস্তর পড়েছে কি না, তাই ও সকল শাস্তর মেনে চলে। ছেলে যদি হতে হয় ত আমার জোগুর মতনই যেন হয়।

গোবিন্দ ঘৃণা-ভরা বিদ্রূপের হাসি জগন্নাথের দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল—তা জেঠিমা একশোবার! আমার মা যদি বৌকে মারতে বল্‌তে ত আমি কিছুতেই শুন্‌তাম না; বৌ নিয়ে মায়ের কাছ থেকে ভিন্ন হতাম। সেই জন্যেই ত ঠিক করেছি বিয়ে কর্‌বো না।

রাসমণি খুসী হইয়া বলিলেন—বেশ করেছিস্ গোবি। তুই যেরকম কাঠগোঁয়ার, তাতে তুই বিয়ে করলে ছোটবৌকে জলে পুড়ে মরতে হবে।

গোবিন্দ আর কোনো জবাব না দিয়া ঘরের সামনে গিয়া ডাকিল—বৌদি, এস রান্না চড়াবে এস। আমি আজ তোমার হাতের রান্না না খেয়ে বাড়ী ফিরব না। এস বৌদি।

আভা চুপ করিয়া ঘরে লুকাইয়া রহিল। রাসমণি তাহাতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এমন দস্যি দজ্জাল বৌ বাবা বাপের জম্মে দেখিনি। এখনই একটা চোরের মার খেলে, তবু হায়া নেই ? ছোট দেওর আদর করে ডাক্‌ছে তা নড়া হচ্ছে না। আমি এখনি ঝাঁটা মারতে মারতে নড়া ধরে টেনে বার করব বলে দিচ্ছি। আপনার ভালাই চাও ত কথা শোনো।

গোবিন্দ ঘরে গিয়া স্বরে মিনতি ও বেদনা ঢালিয়া বলিল—এস বৌদি, আমার কথা শোনো।

অন্ধকারে আভা একটু নড়িল। তাহা যাইবার সম্মতি বুঝিয়া গোবিন্দ ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিল, আভাও ঘোমটা দিয়া তার সঙ্গে-সঙ্গে বাহির হইল। আভার মনের সমস্ত গ্লানি গোবিন্দর অকথিত সান্ত্বনায় দূর হইয়া গিয়াছিল। আভা রান্নাঘরে গিয়া একখানা পিঁড়ি গোবিন্দর সামনে পাতিয়া দিল। কিন্তু গোবিন্দ তাতে না বসিয়া আভার মনের দুঃখ নিঃশেষে ভুলাইয়া দিবার জন্য বলিল—আমি কুটুম্বর মতন বোসে থাক্‌তে আসিনি বৌদি, আমি তোমার রান্নার জোগাড় করে দেবো। কি কি রান্না হবে বলো।

আভা গোবিন্দর সঙ্গে কথা বলিত না। পাছে গোবিন্দর প্রতি অনুরাগ আলাপ-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় আরো বাড়িয়া তার প্রাণমন ছাইয়া ফেলে এই ভয়ে আভা আপনাকে সাবধানে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিল। তার

পর তার স্বামীর আচরণে তার মন স্বামীর প্রতি যতই বিরূপ ও বিমুখ হইয়া আসিতেছিল, সে গোবিন্দর নিকট হইতে যতই সহানুভূতি ও মমতা পাইতেছিল, তার ভয় ততই বাড়িয়া চলিতেছিল। সুতরাং সে গোবিন্দর প্রস্তাবে মনে মনে অধিক পরিমাণে খুসী হইল বলিয়া শঙ্কিতও হইল ততখানি। সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গোবিন্দ আভাকে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—বৌদি, চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু রাত বাড়াচ্ছ, আজ আমি তোমার হাতের রান্না না খেয়ে নড়্‌বো না।

এমন সময় রাসমণি আসিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, আভা ঘোম্‌টা টানিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর গোবিন্দ বকিয়া যাইতেছে। রাসমণি কর্কশকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—এতও তোমার কাষ্ঠ-লজ্জা বৌমা! গোবিন্দ ছোট দেওর, তোমার বাপের বাড়ীর পাশে অত দিন ছিল, জানা শোনা লোক, তাকে দেখে ও কি ঠাট লজ্জা! নেও, ঘোম্‌টা খুলে কথা কও। ও তোমার হাতে খেতে চাচ্ছে, এ ত ভাগ্যি! আমাদের হাতে কেউ খেতে চাইলে আমরা বর্তে যাই। নেও খান-কতক লুচি আর বেগুন চট করে ভেজে নেও—জোগুও খাবে, আমারও জল খাওয়া হবে; তোমার আর সৈরবীর জন্যে ভাত চড়িয়ে দাও—পোন পালি চাল নিলেই তোমাদের দুজনের হবে, আর ময়দা এক একজনের জন্যে হাতের এক-এক কোষ নিলেই হবে। নেও চটপট করে নেও, নইলে জোগুর খেতে রাত হয়ে যাবে।

আভার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল—যারা এখনি তাকে জুতা খাওয়াইয়াছে, তাদেরই খাওয়ার জন্য তাকে লুচি তৈয়ারি করিতে হইবে। আভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

কি কি রান্না হইবে জানিতে পারিয়া গোবিন্দ রাসমণিকে বলিল—

জেঠিমা, তুমি ততক্ষণ একটু শোওগে যাও, আমরা এক্ষুনি সব রেঁধে ফেলছি।

রাসমণি জানিতেন গোবিন্দ কি-রকম কাজের লোক; সে রান্নার কাজেও কম পটু নয়। তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া একটু গড়াইতে গেলেন। গোবিন্দ না আসিলে তাঁকেই যে রান্নার জোগাড় দিতে বৌএর কাছে বসিয়া থাকিতে হইত, এবং হ্যাকড়ঁ বৌ তাঁর কথা না শুনিলে তাঁকেই যে হাঁড়ি ঠেলিতে হইত, ইহা মনে করিয়া তিনি গোবিন্দর উপর খুসী হইয়াই গেলেন।

আভা তবুও নড়িল না। গোবিন্দ আভাকে আর কিছু না বলিয়া ঝিকে বলিল—সৈরবী, ভাঁড়ার-ঘরে কোথায় ময়দা চাল আছে বার করে এনে দে ত।

সৌরভী ময়দার ভাঁড় ও ঘিয়ের ভাঁড় আনিয়া দিয়া চাল ধুইতে গেল।

গোবিন্দ ময়দা আন্দাজ করিয়া লইয়া ময়ান দিয়া ময়দা মাখিতে লাগিল। ময়দা মাখিয়া নেচি পাকাইয়া সে চাকি-বেলন লইয়া লুচি বেলিতে বসিলে সৌরভী বলিল—ছোট দাদাবাবু, আমি বেলে দেবো?

গোবিন্দ বলিল—না। তুই দাদাকে একটু তামাক দিয়ে জেঠিমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিগে যা; আমরা দুজনে আজ রাঁধ্‌বো।

সৌরভী ধোয়া চাল ধুচুনি-সুদ্ধ মেঝেয় রাখিয়া দিয়া বলিল—বৌমা, এ ত তোমার ভারি গোস্‌সা গো! পতি পরম গুরু, সে দু ঘা মেরেছে বলে এত রাগ! যা হয়ে বয়ে গেল, তা আর মনে রাখা কেন?

গোবিন্দ বিরক্ত হইয়া বলিল—তুই যা ত সৈরবী, দাদা অনেকক্ষণ তামাক খেতে পায়নি।

সৌরভী চলিয়া গেল। গোবিন্দ আর আভার দিকে না চাহিয়া

হেঁট হইয়া বসিয়া লুচি বেলিতে লাগিল। গোবিন্দ লুচি বেলিতে খুব ভালো পারে ; কিন্তু সে ইচ্ছা করিয়া লুচিগুলাকে টেরাবেঁকা সাত-কোণা করিয়া বেলিতে লাগিল। আভা দেখিয়া দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না ; পুরুষমানুষের এই আনাড়িপনা দেখিয়া সে মুচ্‌কি হাসিয়া গোবিন্দর হাত হইতে চাকি-বেলন হঠাৎ ছিনাইয়া লইয়া অষ্টাবক্র লুচিগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখ তুলিয়া আভার স্মিত মুখের দিকে চাহিয়া খুসী হইয়া হাসিয়া বলিল—আহা-হা ! আমার অমন অপূর্ব্ব কারিগরি ভেঙে ফেল্‌লে বৌদি ! জ্যামিতি-শাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধে হত ! তোমার হাতে লুচি হবে শুধু বৃত্তাকার, আর আমার হাতে হয়েছিল কিম্ভূতকিমাকার !

গোবিন্দর কথা শুনিয়া আভার অত্যন্ত হাসি পাইল ; সে মাথা ঝুঁকাইয়া হাসি লুকাইল। গোবিন্দ তাহা দেখিয়া আরো খুসী হইল, আভার মনের মেঘ সে উড়াইয়া দিতে পারিয়াছে। গোবিন্দও হাসিতে হাসিতে উননের উপর কড়া চাপাইয়া ঘি ঢালিয়া দিল।

আভা মাথা নত করিয়াই মৃদু স্বরে বলিল—থাক্, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না—ঢের বাহাদুরী হয়েছে।

গোবিন্দ দেখিল ঘোম্‌টার ভিতর হইতে আভার নত মুখের বক্র কটাক্ষ তাকে বিদ্রূপ করিয়া চকিতে সরিয়া গেল। গোবিন্দ আভার এই প্রথম সম্ভাষণ শুনিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—না বৌদি, তোমার দেওরটিকে তুমি যতটা আনাড়ি ভাব্‌ছো, সে ততটা আনাড়ি নয়।

গোবিন্দ শিক্ষিত দক্ষতার সঙ্গে লুচি ভাজিয়া তুলিতে লাগিল।

দুজনে মিলিয়া চটপট সমস্ত রান্না শেষ করিল। গোবিন্দ সৌরভীকে ডাকিয়া খাওয়ার ঠাঁই করিতে বলিল।

সৌরভী ঠাঁই করিতে যাইতেছিল, আভা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বলিল—সৌরভী, তুমি রাখো, আমি সব কর্‌ছি।

আভা শাশুড়ী ও স্বামীর কাছে অপমানিত হইয়া উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; এখন গোবিন্দর মমতা-ভরা ব্যবহারে শান্ত হইয়া যখন ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল তখন আভা স্থির করিল বাড়ীর সমস্ত কাজ সে একা, কেহ না বলিতেই, সম্পন্ন করিবে; দ্বিতীয়বার অপমান হইবার অবকাশ সে রাখিবে না। তাই সে নিজের হাতে খাওয়ার ঠাঁই করিয়া সকলকে পরিবেষণ করিয়া খাওয়াইল।

আভার এই অতিরিক্ত উৎসাহ দেখিয়া গোবিন্দ আবার ভয় পাইয়া দমিয়া গেল। সে মনে করিল আভা রাগ করিয়াই এ সব করিতেছে হয়ত। গোবিন্দর সন্দেহ হইল আভা আজ কিছু খাইবে না বা।

আভার উৎসাহ দেখিয়া জগন্নাথের হইতেছিল বিষম ক্রোধ। এতক্ষণ সে আর তার মা তাকে কাজ করাইবার জন্য হিমসিম খাইতেছিল, আর গোবিন্দ আসিতেই আভার এত উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি! জগন্নাথ খাইয়া উঠিয়াই গোবিন্দর সঙ্গে কথা না বলিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

আঁচাইয়া উঠিয়া গোবিন্দ তখনি বাড়ী চলিয়া যাইতে পারিল না, জগন্নাথের ঘরে গিয়া বসিল। কিন্তু যে পাষণ্ড নিজের সদ্যবিবাহিতা তরুণী বধূকে প্রহার করিতে পারে তার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেও গোবিন্দর ঘৃণা বোধ হইতেছিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। জগন্নাথও নীরবে শুইয়া পড়িয়া তামাক টানিতে লাগিল। গোবিন্দকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জগন্নাথ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে-ছিল। সে মনে করিতেছিল গোবিন্দ নিশ্চয় তাকে তিরস্কার করিবার জন্য আসিয়া বসিয়া আছে। যদিও গোবিন্দ মাতাপিতার আজ্ঞায় অতি অসৎ কাজও করা যায় বলিয়া তার কাজ সমর্থন করিয়াছিল, তথনই গোবিন্দ

জগন্নাথকে দুদশ কথা কড়া কড়া না শুনাইয়া দিয়া হাসিয়া কথা কহিয়াছিল, তথাপি সেই আচরণটা গোবিন্দর স্বভাবের সঙ্গে এমন বেখাপ্পা ও বেমানান ঠেকিয়াছিল, যে, জগন্নাথ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, যে, গোবিন্দ অসন্তুষ্ট হয় নাই। যদি অসন্তুষ্ট না-ই হইয়াছে তবে খাওয়া-দাওয়ার পর এত রাত্রে বাড়ী না গিয়া তার ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার হেতু কি? জগন্নাথ প্রতি মুহূর্ত্তে গোবিন্দর তিরস্কার শুনিবার প্রতীক্ষায় মনে মনে তার জবাবের নানা রকম খসড়া মুসাবিদা করিয়া রাখিতেছিল। জগন্নাথ তামাক টানিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াও যখন দেখিল গোবিন্দ কিছুতেই বকিতেছে না, তখন সে আর সহ্য করিয়া থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—কি বল্‌তে চাও বলেই ফেলো। আমি অতি পাষণ্ড, কাজটা অতিশয় গর্হিত করেছি, যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ,······ আর কি বল্‌বে সেরে নেও ·····

গোবিন্দ উঠিয়া পড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—আমার বল্‌বার আর কিচ্ছু বাকী নেই।

গোবিন্দ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। জগন্নাথ গোবিন্দর কথার গূঢ় শ্লেষগর্ভ অর্থ ধরিতে না পারিয়া হতভম্ব ও অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া রহিল। অন্ধকার খাদের ধারে ঝুলিতে ঝুলিতে ক্লান্ত হইয়া মানুষ যখন অতল অন্ধকারে তলাইয়া গুঁড়া হইয়া মরিবার জন্যই মরীআ হইয়া হাত ছাড়িয়া দ্যায় ও হঠাৎ নিতান্ত অগভীর গর্ত্তের তলা পায়ে ঠেকিয়া থমকিয়া দাঁড়ায়, তখন তার যেমন নিরাশার দুঃখ ক্রমশ আনন্দে পরিণত হয়, জগন্নাথের ঠিক সেই রকম হইল, সে গোবিন্দর নীরবতা সহ্য করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিল নিজেই খোঁচা দিয়া উস্কাইয়া গোবিন্দর বক্তব্য বাহির করিয়া লইবে, কিন্তু গোবিন্দ অতি সহজে তাকে নিষ্কৃতি

দিয়া রণে ভঙ্গ দেওয়াতে সে প্রথমটা একটু ক্ষুণ্ণ হইলেও ক্রমশ আরাম ও স্বস্তিই বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু এ স্বস্তি তার বেশীক্ষণ টিকিল না, তার মনে হইল—এত রাত পর্য্যন্ত যে গোবিন্দ এ বাড়ীতে ঘুরঘুর করিতেছে তা নিশ্চয় আভারই লোভে। জগন্নাথের মন হিংসার ক্রোধে তপ্ত হইয়া উঠিল।

গোবিন্দ জগন্নাথের ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল আভা ভাত খাইয়া উঠিয়া আঁচাইতে আসিতেছে। গোবিন্দ আর না দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোবিন্দ বাড়ী ফিরিয়া যাইতেই তার মা বলিলেন—ও-বাড়ীতে কিসের গণ্ডগোল হচ্ছিল রে?

গোবিন্দ উষ্ণভাবে বলিল—রামায়ণ-মহাভারতের পুনরভিনয় হচ্ছিল মা।

কমলা হাসিয়া বলিলেন—কুলুক্ষেত্তর না কিচ্‌কিন্দে কাণ্ড?

গোবিন্দ না হাসিয়া তেমনি উগ্রস্বরেই বলিল—দাদা পরশুরামের সাগ্‌রেদ হয়েছেন—মাতার আজ্ঞায় স্বর্ণপ্রতিমাকে পাদুকা-প্রহার কর্‌ছিলেন।

কমলা ব্যথিত হইয়া বলিলেন—আহাহা মরে যাই বাছারে! ঐ সোনার অঙ্গে জুতো! দিদিরই বা কি আক্কেল!

গোবিন্দ কড়া স্বরে বলিল—কেন, দোষটা কি হল?—পরের মেয়ে বই ত নয়, আর বাংলা-দেশে মেয়েও যখন সস্তা, এবঞ্চ দাদা আমার সুপাত্র!

কমলা পুত্রের কথার ভঙ্গীতে বুঝিলেন গোবিন্দ অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়াছে। তিনি অল্পে অল্পে বুঝিতে পারিতেছিলেন, গোবিন্দর মন আভার প্রতি কতখানি অনুরক্ত, এবং সে যে আভাকেই

বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল ও আভার পিতা তার চেয়ে জগন্নাথকেই সুপাত্র স্থির করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়া গোবিন্দর মনে কতখানি আঘাত দিয়াছেন, ইহাও কমলার অগোচর ছিল না। তাই তিনি গোবিন্দর কথার কোনো জবাব দিলেন না, কথায় কথা বাড়াইয়া পুত্রের ব্যথিত মনকে পীড়িত করিতে চাহিলেন না।

গোবিন্দ মায়ের কোনো একটা কথা শুনিবার জন্য একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—ভাগ্যিস্ মা আমি বিয়ে করিনি! তা হলে অমন আদর্শ মাতৃভক্ত ছেলে আমি ত কিছুতেই হতে পার্‌তাম না—তোমার আজ্ঞা আমায় অবহেলা কর্‌তেই হত।

কমলা বুঝিলেন যে গোবিন্দ তার মনের সঞ্চিত রাগটা তাঁর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিয়া খরচ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন—নে নে আর কোঁদল কর্‌তে হবে না, এখন খাবি চল্!

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়াই বলিল—আমি বৌদিদিকে দিয়ে রাঁধিয়ে খেয়ে আস্‌ছি, নইলে আজ ও-বাড়ীর কারুর অন্ন জুট্‌তো না।

এতক্ষণে কমলার আভার কথা মনে পড়িল, তিনি ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌমা খেয়েছেন ত?

'হ্যাঁ।' বলিয়া গোবিন্দ নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। তার বুকের ভিতরটা আজ অনিবার্য্য বেদনায় তোলপাড় করিতেছিল। এক-একবার তার তন্দ্রা আসিতেছে আর ভাঙিয়া যাইতেছে—সে কেবলই ভাবিতেছে, পাষণ্ড জগন্নাথটা মিষ্ট কথা সস্নেহ ব্যবহার দিয়া আভার অপমানের লজ্জা ও বেদনা মার্জ্জনা করিয়া লইতে পারিল কি?

বাস্তবিকই জগন্নাথ বা তার মা আভার নিকট ক্ষমা চাওয়া বা ত্রুটি স্বীকার আবশ্যক মনে করিল না। রাসমণি খাইয়া গিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন; জগন্নাথও নিজের ঘরে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—সে অকস্মাৎ

যে-কাজটা করিয়া ফেলিয়াছে তার জন্ম তার মন এক-একবার লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সে নানাবিধ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া আপনার ত্রুটি স্খালনের চেষ্টা কারতেছিল; সে ভাবিতেছিল, কি করিব, মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ! স্ত্রী ত স্বামীর চরণের দাসী, সুতরাং তাকে জুতা মারাতে তার এমন কি অগৌরব বা অপমান হইয়াছে! কোনো হিন্দু স্ত্রীরই স্বামীর পদাঘাত বা পাদুকাঘাত মাথা পাতিয়া লইতে আপত্তি হইবার কথা নয়; ভরত বড় ভাইএর খড়ম মাথায় করিয়া পূজা করিতেন, যদিও ভরত স্ত্রী নন ও রামচন্দ্র স্বামী নন, তবু ত তিনি গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনে আদর্শ। অনেক পতিব্রতা স্ত্রী ত বিধবা হইয়া স্বামীর খড়ম পূজা করিয়া থাকে। এ সমস্ত আভার জানা থাকা উচিত। যদি জানা না থাকে, তবে তাকে জানাইয়া দিতে হইবে। এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ এবং উনবিংশ সংহিতা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ও পতিব্রতাদের উপাখ্যান আভাকে শুনাইতে হইবে; এবং বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে কোথায় কবে কোন্ পতিব্রতা স্বামীর পাদুকাপ্রহার লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিল। পতিব্রতাদের কথা মনে হইতেই জগন্নাথের মনে হইল আভার চরিত্রে কত ত্রুটি আছে; সে স্বামীর প্রতি ত অনুরক্ত নয়ই, অধিকন্তু গোবিন্দর প্রতিই অনুরক্ত। ভাবিতে ভাবিতে জগন্নাথের রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। সে যে আভাকে অপমান করিয়া একটুও অন্যায় অপকার্য্য করে নাই ইহা তার মনে হইতে লাগিল; তার মন হইতে ক্ষণিক লজ্জার গ্লানি দূর হইয়া গেল। এইরূপে নিশ্চিন্ত হওয়াতে আস্তে আস্তে জগন্নাথের একটু তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছিল, সে একটুও ভাবিয়া দেখিল না যে ঐ অপমানের পর পত্নীকে একটু আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া আনাও দরকার।

আভা আঁচাইয়া আসিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল যে-স্বামী তাকে অমন অনাদর অপমান করিতে পারিল তার ঘরে তারই শয্যায় তারই পার্শ্বে গিয়া সে শয়ন করিবে কেমন করিয়া। চিন্তা মাত্রই তার সমস্ত দেহমন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

রান্নাঘরের ভিতরে খাইতে খাইতে সৌরভী বাহিরের দাওয়ায় কাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে শুনিয়া দরজার দিকে ঝুঁকিয়া আলো হইতে অন্ধকারে দেখিবার জন্য দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ওখানে কে? বৌমা?

আভা বলিল—হ্যাঁ।

—এখনো শুতে যাওনি, শুতে যাও শুতে যাও, রাত যে ঢের হয়েছে গো!

আভার ইচ্ছা হইতেছিল সে বাহিরেই কোথাও পড়িয়া থাকিয়া রাতটা কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু আবার একটা হৈ চৈ বা অপমানকর ব্যাপার ঘটিবার ভয়ে সে আস্তে আস্তে স্বামীর শয়নকক্ষের দিকেই অগ্রসর হইয়া গেল। সে একান্ত মনে কামনা করিতেছিল তার স্বামী যেন ঘুমাইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্বামীর শয্যার তক্তপোষের পাশে শুইয়া পড়িয়া ভোর না হইতেই উঠিয়া পলাইবে। আভা পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরে ঢুকিতেই জগন্নাথের কাকতন্দ্রা ভাঙিয়া গেল, সে বলিয়া উঠিল—কে? সৈরবী?

আভা বলিল—না, আমি।

জগন্নাথ মর্ম্মপীড়িতা পত্নীকে সোহাগ সমাদর করিয়া ডাকিয়া লইল না, উঠিয়াও তাকে একটু মমতা দেখাইল না; চিত হইয়া শুইয়া থাকিয়াই বলিল—সৈরবীকে একটু তামাক দিতে বোল্‌গে ত।

আভা স্বামীর অসভ্য তুইতোকারি অগ্রাহ্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—সৈরবী খেতে বসেছে।

জগন্নাথ মুখ খিচাইয়া বলিয়া উঠিল—নবাবনন্দিনী! তুমি কি তোমার স্বামীকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিতেও পারো না? গোবিন্দর সঙ্গে রাত বারোটা পর্য্যন্ত ত রান্নাঘরে বেশ থাকৃতে পারো।

আবার বাপ তুলিয়া কথা বলা, চরিত্রের প্রতি দোষারোপ, তাহাও আবার স্বামীর মুখে! আভা অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইল। কিন্তু সে বুঝিয়া লইয়াছিল, এ বাড়ীতে ইহাই ইহাদের ধারা, ইহাই নিত্য সহিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা হাওড়াহাওড়ি-কাওড়াকাওড়ি চলিতেই থাকিবে; ছোট-লোকদের ছোটলোকপনা প্রকাশ করিবার অবসর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। স্নতরাং আভা একবার স্বামীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নাঘরের দাওয়ায় গিয়া ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, সৌরভী পা ছড়াইয়া বসিয়া নিদ্রালস স্তিমিত নয়নে পুঁইডাঁটা চিবাইতেছে। আভা নিজেই তামাক সাজিতে বসিল। সে স্থির করিয়াছিল, এ বাড়ীতে যখন কাজের সঙ্গেই লোকের সম্পর্ক তখন সে কোনো কাজেই আর 'না' বলিবে না।

আভা কখনো নিজে তামাক ত সাজেই নাই, তামাক সাজা দেখেও নাই, তার বাবা তামাক খান না। সে ত জানে না যে কল্কের মধ্যে প্রথমে ঠিক্‌রা দিয়া তারপর তামাক সাজিতে হয়; স্বামীর মুখ অনেকক্ষণ বন্ধ থাকিবে বলিয়া অনেকখানি তামাক লইয়া বেশ করিয়া চাপিয়া চাপিয়া কল্কের পেট ভরিল; তার উপর বেশ করিয়া টিকে ও গুলের আগুন চড়াইয়া ফুঁ দিতে দিতে স্বামীকে দিতে চলিল। গুলের আগুনে আভার মুখের ফুঁ এক-একবার লাগিতেছে আর সেই আগুনের আভায় সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই দেখিতে পাইয়া সৌরভী

ডাকিয়া বলিল—কে, বৌমা? দাদাবাবুকে তামুক দিতে যাচ্ছ? যাও যাও। এম্‌নি কোরেই ত সোয়ামির সেবাশাস্তি কর্‌তে হয়!

সৌরভীর কথা শুনিয়া আভার মুখ কৌতুকহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তার উপর ক্ষণে ক্ষণে আগুনের আভা লাগিয়া আভাকে অপরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। সে ঘরে ঢুকিতেই জগন্নাথ সেই মনোরম সৌন্দর্য্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—অকম্মার ঢেঁকি! এক ছিলিম তামাক সাজ্‌তে এক ঘণ্টা!

আভার মুখখানি আবার নিষ্প্রভ ম্লান হইয়া পড়িল। সে হুঁকার উপর কল্কেটি বসাইয়া দিয়া ঘরের দরজা দিতে সরিয়া গেল।

জগন্নাথ হুঁকা লইয়া খুব জোরে জোরে পাঁচ সাত টান দিল, কিন্তু ধোঁয়া বাহির হইল না বা বাতাস চলাচল বোধ করিল না। সে একটা কাঠি দিয়া কল্কের নীচে খোচা দিয়াই বুঝিল তাহাতে ঠিক্‌রে দেওয়া হয় নাই, তামাকের গুড় তাত পাইয়া গলিয়া গড়াইয়া আসিয়া জগন্নাথের হাতে পড়িল। জগন্নাথের মন আভার উপর উষ্ণ হইয়াই ছিল; তার উপর গরম গুড়ের ছেঁকা লাগিয়া তার মন প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। আভা তখন দরজায় খিল দিয়া ফিরিয়া শুইতে আসিতেছিল। জগন্নাথ কল্কেটা লইয়া আভার গায়ে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কেবল গিল্‌তে জানো একটা কাজও কি কর্‌তে পারো না। তামাক সেজেছ, না ছাই সেজেছ। যাও, সৈরবীকে বলোগে-ভালো করে এক ছিলিম তামাক সেজে দেবে।

কল্কের সমস্ত আগুনটা আসিয়া আভার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িল। আভা একটু শব্দ মাত্র করিল না। তাড়াতাড়ি দুই হাত দিয়া গা হইতে সমস্ত আগুন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল; যেখানে যেখানে কাপড় ধরিয়া উঠিয়াছিল, সেই সেই জায়গা হাত দিয়া রগ্‌ড়াইয়া নিবাইয়া

দিল ; তারপরে মেঝেময় ছড়ানো আগুন কল্কে-ভাঙা খাপ্‌রা দিয়া কুড়াইয়া জড়ো করিতে বসিল।

জগন্নাথের গর্জ্জন ও কল্কে ভাঙার শব্দে সৌরভী আকৃষ্ট হইয়া ডাঁটা চিবানো ছাড়িয়া হাতে মুখে জল দিয়া দৌড়িয়া আসিয়া ডাকিল—বৌমা, কি হলো গো ? দোর খোলো দেখি।

আভা দরজা খুলিল না, তার অপমান সে লোকের কাছে বারবার দেখাইতে লজ্জা বোধ করিতেছিল।

জগন্নাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া রুষ্টস্বরে বলিল—দ্যাখ্‌দিখি সৈরবী, তামাক সেজে এনেছে ত ঠিক্‌রে দেয়নি।—যত দম মারি ধোঁয়াই বেরোয় না, ধোঁয়াই বেরোয় না ! ……

সৌরভী হাসিয়া বলিল—আ আমার পোড়া কপাল ! এক ছিলিম তামুক সাজ্‌তেও জানোনি !…… নাও, এখন সরো, আমি আগুনগুনো কুইড়ে নে যাই।

সৌরভী আভার হাত ধরিয়া সরাইয়া দিল। আভা আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আভা বাহিরে উঠানের এক কোণে অন্ধকারে গিয়া দাঁড়াইল। তার সর্ব্বাঙ্গ গুল ও টিকের আগুনে পুড়িয়া ছোট ছোট ফোস্কা হইয়া উঠিয়া হুহু করিয়া জ্বলিতেছে ; কিন্তু তার চেয়ে বেশী জ্বলিতেছিল তার মন ! তার কাপড়খানা ঝুরো আগুনে পুড়িয়া ঝাঁঝ্‌রা হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তার চেয়েও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল তার অন্তর। আভা শুষ্ক চক্ষে একবার আকাশের নীরব নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, একটু কাতরতা ব্যক্ত করিল না।

রাসমণি শয়ন করিয়া থাকিয়াই ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সৈরবী, কি হলো রে ?

সৌরভী আগুন ছাই কুড়াইয়া লইয়া বাহিরে যাইতে যাইতে হাসিয়া বলিল—আর বলো কেন মা ঘেন্নার কথা, এমন বৌ এনেছ যে এক ছিলিম তামুক পর্য্যন্ত সাজ্‌তে জানেনি! তামুক সেজেছে ত ঠিক্‌রে দ্যায়নি, তাই দাদাবাবু ছিলিমটা আছ্‌ড়ে ফেলে চূর্‌মার করেছে।

রাসমণি শুনিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—তুই এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে শুগে যা।

আভার মন এই সবকটি লোকের হৃদয়হীনতায় বিস্ময় মানিতেছিল। সে যে পুড়িয়া গেল তার জন্য কারো মুখে একবার আহা ফুটিল না, কিন্তু সে তামাক সাজিতে জানে না বলিয়া হাসি আসিল বিস্তর। আভা স্তব্ধ স্তম্ভিত দাঁড়াইয়া রহিল।

তামাক সাজিয়া দিয়া সৌরভী ডাকিল—বৌমা কম্‌নে গো? শোওগা।

আভা জবাব দিল না, নড়িলও না।

—ভ্যালা মেয়ে যা হোক! এত রেতে আবার কম্‌নে ঘুপ্‌ টিমেরে রইল!—বলিয়া বকিতে বকিতে সৌরভী প্রদীপ হাতে করিয়া আভাকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

আভাকে দেখিতে পাইয়া বলিল—এখানে দাঁড়িয়ে কচ্ছ কি? শোওগা।

আভা তার দিকে তাকাইল না, কথা বলিল না, নড়িলও না।

সৌরভী দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া ডাকিল—ও দাদাবাবু, বৌকে সাধোসিঞে, বৌ যে গোসা করে দাঁইড়ে রয়েছে, নড়েও না, চড়েও না।

রাসমণি চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—কাজ বিগড়ে আবার গোসা! যা ত জোগু ওর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আয় ত। জোগু গেলি?

জগন্নাথ মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়াও বটে আর নিজের ক্রোধের তাড়নাতেও বটে শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বাহির হইল। আভার কাছে গিয়া বলিল—ভালো চাস্ ত ঘরে আয় বল্‌ছি।

আভা তেম্‌নি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পুরুষের ক্রোধ আর সম্বরণ করা গেল না. জগন্নাথ আভার খোঁপা ধরিয়া টানিল। তবু আভা নড়িল না। তখন জগন্নাথ ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে আভাকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া আপনার ঘরে আনিয়া বিছানার উপর জোরে ফেলিয়া দিল। তারপর হাঁপাইতে হাঁপাইতে হড়াৎ করিয়া দরজায় খিল দিয়া আপনিও বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বাহিরে সৌরভী হিহি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল- এরা রাতভোর কি রঙ্গই কর্‌তে নেগেছে!

তাহা শুনিয়া রাসমণিও খিলখিল করিয়া হাসিতে হাসিতে বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলিলেন—ভাগ্যিস আমার জোগু একালের ছেলের মতন ভেড়ো নয়, নইলে ও-বৌ হতে আমাদের চোখের জলে নাকের জলে হতে হত।

জগন্নাথ মায়ের সমর্থন ও প্রশংসা পাইয়া খুসী হইয়া নড়িয়া চড়িয়া শুইল।

আভা পতনের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইয়াই বিছানা হইতে তড়াক করিয়া নামিয়া পড়িল, ঐ স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় থাকা তার অসম্ভব মনে হইল; জগন্নাথের গাত্রস্পর্শ শুলের আগুনের ছেঁকার চেয়েও অসহ্য লাগিল।

জগন্নাথ চীৎকার করিয়া উঠিল—কোথায় যাচ্ছিস্!

আভা উত্তর না দিয়া আগাইয়া গিয়া দরজার খিলে হাত দিতেই জগন্নাথ একলম্ফে তার উপর পড়িয়া তার খোঁপা ধরিল। তারপর

আবার জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া আভার দুই হাত ও দুই পা একখানা কাপড়ের দুই প্রান্ত দিয়া কষিয়া বাঁধিল। তারপর তার খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া বিনুনিটা তক্তপোষের খুরোর সঙ্গে টানিয়া বাঁধিয়া শ্রমে ও রাগে হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—থাক্ এমনি কোরে পোড়ে।

আভা বন্দিনী হইয়া পড়িয়া রহিল। তার চোখে এক ফোঁটা জল নাই, তার সর্ব্বাঙ্গ ও সারা মন হুহু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। অল্পক্ষণ পরেই তার পাশে স্বামীর নাসিকাগর্জ্জন সে শুনিতে লাগিল।

জগন্নাথের বাড়ীতে যত কোলাহল হইতেছিল গোবিন্দ নিজের বাড়ী হইতে সব অস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল। সে আর শুইয়া থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া উঠানে পায়চারি করিতে লাগিল। অত রাত্রে সে অপরের বাড়ীতে যাইতেও পারিতেছিল না, আবার সহ্যও হইতেছিল না। এক-একবার তার মনে হইতেছিল জগন্নাথের বাড়ীর সদর দরজা ভাঙিয়া বা পাঁচিল ডিঙাইয়া সে গিয়া পড়ে; কিন্তু আবার মনে করিতেছিল তার মধ্যস্থতায় আভার অদৃষ্ট নূতনতর কষ্টে দুঃসহ হইয়া উঠিবে হয়ত। সে নিষ্ফল ক্রোধে ও অসহ বেদনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল; আভা না জানি কি লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করিতেছে মনে করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। কমলা পুত্রকে অধীর হইয়া উঠানে পায়চারি করিতে দেখিয়া আস্তে আস্তে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তার পাশে দাড়াইলেন। গোবিন্দ মাতাকে লক্ষ্য না করিয়া একমনে বেড়াইতে লাগিল। কমলা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাকিলেন—গোবি!

গোবিন্দ নীরবে ব্যথাভরা চঞ্চল দৃষ্টি তুলিয়া একবার মায়ের মুখের দিকে চাহিল।

কমলা পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন—পরের বাড়ীর অন্যায় কি অত্যাচার তুই কি কোরে নিবারণ কর্‌বি?

গোবিন্দ সেই উপায়ই খুঁজিতেছিল. পাইতেছিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা বলিলেন—শুবি আয়।

এবার গোবিন্দ কথা বলিল এবং উষ্ণ রুষ্ট ভাবেই বলিল—একটা ছোট্ট মেয়েকে পাশের বাড়ীতে একটা দানব অপমান করছে আর তোমার ছেলেকে নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে বলতে তোমার লজ্জা করল না মা?

কমলা লজ্জিত হইয়া উঠান হইতে দালানে উঠিবার সিঁড়ির ধাপের উপর বসিয়া পড়িলেন। গোবিন্দ আবার পায়চারি করিতে লাগিল।

অনেক রাত্রে যখন জগন্নাথের বাড়ীতে আর কোনো চালা শোনা গেল না, সমস্ত নিঃশব্দ নিস্তব্ধ, তখন আবার কমলা ভয়ে ভয়ে বলিলেন—এখন শুতে চ গোবি।

গোবিন্দ বলিল—তুমি শোওগে।

—তুই কি সমস্ত রাত জেগে কাটাবি?

—ঘুম পেলে শোবো।

একগুঁয়ে ছেলেকে অনুরোধ করা বৃথা জানিয়া কমলা ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। গোবিন্দ উঠানেই পায়চারি করিতে লাগিল। কতক-ক্ষণ এমনি করিয়া কাটিল তার হুঁস ছিল না, হঠাৎ কাক কোকিল কলরব করিয়া উঠিতেই গোবিন্দ চমকিত হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল আকাশ ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। সে অধিকতর অধীর হইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, বেলা হইলেই সে একবার জগন্নাথের বাড়ী যাইতে পায়।

প্রভাত হইতে না হইতেই জগন্নাথ উঠিয়া হাতমুখ ধুইতে চলিয়া গেল। আভা বন্দিনী হইয়া শয্যায় তেমনি পড়িয়া রহিল. তাকেও যে মুক্তি দেওয়া আবশ্যক তাহা জগন্নাথের মনেও হইল না।

আভা বাঁধা পড়িয়া থাকিয়া ভাবিতেছিল, আজ সুপ্রভাতে তার কপালে আরো কি লাঞ্ছনা গঞ্জনা আসন্ন হইতেছে। এ বাড়ীতে নিয়ম, যে বউ, সে সবার শেষে শুইবে ও সবার আগে উঠিবে। একদিন সে ঘুমাইয়া ছিল, তার আগে শাশুড়ী উঠিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বধূকে ঝাঁটা মারিয়া জাগাইয়া দিয়াছিলেন, এবং এইরূপ হইবে জানিয়াও তার স্বামী তাকে জাগাইয়া দিয়া যায় নাই। একদিন খাওয়া-দাওয়া হইতে অনেক রাত্রি হইয়া গিয়াছিল, আভা রান্নাঘরেই শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া শাশুড়ী খুন্তি তাতাইয়া তার গায়ে ছেঁকা দিয়া জাগাইয়াছিলেন। আজও ত সে শয়ন করিয়া আছে, শাশুড়ী উঠিয়া তাকে কেমন প্রিয় সম্ভাষণ না জানি করিবেন! আভা প্রবলতম চরমতম দুঃখও সহ্য করিবার সঙ্কল্প করিয়া মন বাঁধিতেছিল। এমন সময় সে সাড়া পাইল শাশুড়ী উঠিলেন।

রাসমণি ঘরের বাহির হইয়াই একবার বাড়ীর সর্ব্বত্র চোখ বুলাইয়া আভাকে দেখিতে না পাইয়া ডাকিলেন—বৌমা!

আভা কোনো জবাব দিল না। রাসমণি ডাকিলেন—সৈরবী!

রান্নাঘরের ভিতর হইতে জবাব আসিল—কি মা?

—বৌমা কই?

—এখনো ওঠেনি।

—জোগু?

—তিনি ঘাটে গেছে।

রাসমণি দাঁতে দাঁত রাখিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন—আর নবাবকন্তে শুয়ে আছেন? সমস্ত রাত দুপুরে-মাতন কোরে একপহর বেলা পর্য্যন্ত ঘুম! ঝেঁটিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছি ভালো কোরে!

বলিয়া একগাছা ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া রাসমণি হনহন্ করিয়া

জগন্নাথের ঘরে গিয়া ভেজানো দরজা দড়াম করিয়া খুলিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন হাত পা বাঁধা আভা পড়িয়া আছে, তার চুলের বিনুনিটাও খাটের খুরোর সঙ্গে বাঁধা, আভা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইতেছে। রাসমণি এই দৃশ্য দেখিয়া এমন খুসী হইলেন যে তাঁর রাগ ত পড়িয়াই গেল, তাঁর বাঁটুলের মতন নিরেট আঁটালো মুখখানা হাসিতে একেবারে ভরিয়া উঠিল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—থাক্ অমনি কোরে পোড়ে। যেমন জানোয়ার তেমনি খোয়ার! ও বাঁদর কলা খাবি?

নির্য্যাতনের চেয়ে এই নীচ ব্যঙ্গ আভার মর্ম্মে অধিক বাজিল। তার চোখ দুটি ঘৃণার ধিক্কারে জলিয়া উঠিল। সেই দৃষ্টিতে এমন একটা দৃপ্ত তেজ ফুটিল যে রাসমণি যে রাসমণি তিনিও সঙ্কুচিত হইয়া যেন দেখেন নাই এমনি ভাবে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

সৌরভী এঁটো বাসন মাজিতে গিয়াছে। জগন্নাথ পাড়ায় গিয়া বেণী-ময়রার দোকানে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে রেল হওয়াতে ছানা কি রকম আক্রা হইয়া উঠিতেছে তারই আলোচনা করিতেছে; রাসমণি আজ খুসী মনে তরকারি কুটিতে বসিয়াছেন—আভা আসিয়া অবধি তিনি ঘরকন্নার কাজে হাত দিলেন আজ এই প্রথম আর অত্যন্ত খুসী মনেই। সৌরভী ও জগন্নাথ ফিরিয়া আসিলে এবং পাড়াপড়শী কেহ জুটিলে তাহাদের সম্মুখে আভাকে লইয়া একটু মজা করিবার প্রলোভনে আভাকে তিনি মুক্তি দিতে পারিলেন না।

গোবিন্দ আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়াই রাসমণিকে তরকারি কুটিতে ও অমন প্রফুল্ল থাকিতে দেখিয়াই আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া গেল। গোবিন্দ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—জেঠিমা, তুমি তরকারি কুটছো? বৌদিদি কই?

রাসমণি চোখ মট্‌কাইয়া জগন্নাথের শয়নঘর নির্দ্দেশ করিয়া একমুখ হাসিয়া বলিলেন—শয়নে পদ্মলাভ কোরে আছেন!

এত বেলা পর্য্যন্ত আভা শুইয়া আছে! এবং তাতে তার শাশুড়ীর এমন হর্ষ! গোবিন্দ অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—অসুখ করেছে নাকি?

রাসমণি হাসিয়া বলিলেন—অহল্যা পাষাণী হয়ে আছেন! মুখপোড়া হনুমান হয়েছেন! যা না দেখ্‌গে না।

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গোবিন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া জগন্নাথের ঘরের দিকে চলিল।

গোবিন্দ আসিতেছে টের পাইয়াই আভার লজ্জা দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল। যারা হৃদয়হীন দানব, তাদের কাছে তার কুণ্ঠা নাই লজ্জা নাই; কিন্তু যে লোক মমতা দিয়া ব্যথার ভাগ লয়, তার কাছে অপমানের বেদনা প্রকাশ পাইবে বলিয়া আভার অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, তার জ্বালাময় রুক্ষ দৃষ্টি কোমল সজল ম্লান হইয়া আসিল। তার হাত পা বাঁধা, মুখ ঢাকিবারও উপায় নাই; তার চুল খাটের পায়ায় বাঁধা, উঠিয়া বসিবারও জো নাই। সে দুঃসহ লজ্জায় অভিভূত হইয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। তার হৃদয় ছাপাইয়া পুঞ্জীকৃত দুঃখ চোখের জলে গলিয়া পড়িতে চাহিতেছিল।

গোবিন্দ দরজার কাছে আসিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, তাকে যেন কে শপাশপ করিয়া চাবুক্ মারিয়া পথরোধ করিয়া থামাইয়া দিল। আভার মুখে হাতে পায়ে ছোট ছোট অসংখ্য ফোস্কা হইয়াছে; তার কাপড়খানি ঝাঁঝ্‌রা হইয়া পুড়িয়া গিয়াছে; তার হাত পা চুল বাঁধা? গোবিন্দর ইচ্ছা হইল জগন্নাথটার টিকি ধরিয়া হেঁচ্‌ড়াইয়া টানিয়া আনিয়া তার মুখে নুড়ো জ্বালিয়া দ্যায়; রাসমণির সমস্ত কটা দাঁত কিল মারিয়া

কাঁদাইয়া স্থায়! গোবিন্দ এমন জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যে, তার প্রকাণ্ড চওড়া বুকটা অনেকখানি উঁচু হইয়া দমিয়া গেল, যেন আর-একটু চাড় পাইলেই ফাটিয়া যাইত। সেই দীর্ঘনিশ্বাস গিয়া আভার বুকের দুঃখ-চাপা পাথরখানা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল, আভার মুদিত চক্ষুর কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গোবিন্দ ঘরের মধ্যে আসিয়া আভার হাত-পায়ের বাঁধন খুলিতে খুলিতে বেদনাবিদ্ধ উগ্রস্বরে বলিল—কেঁদো না বৌদি, এ লজ্জা তোমার নয়, এ লজ্জা আমাদের; তোমার মুখ কতটুকু পুড়িয়েছি, তার চেয়ে আমরা নিজেদের মুখ পুড়িয়েছি ঢের বেশী!

আভা খোলা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া গায়ের কাপড় সাম্‌লাইয়া লইয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

গোবিন্দ চুপিচুপি বলিল—বলো বৌদি, তোমাকে কল্‌কাতায় রেখে আসি, গাঁসুদ্ধ লোক মিলেও আমাকে আটকে রাখতে পারবে না, তুমি শুধু আমাকে অনুমতি কর।

গোবিন্দ উত্তরের জন্য আভার মুখের দিকে চাহিল। আভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, সে যাইবে না।

—তবে বলো বৌদি, তোমার বাবাকে আসতে জরুরি টেলিগ্রাম করি

আভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, তারও দরকার নাই।

গোবিন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া ফেলিল—তোমার এ কষ্ট আমি যে সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি নে। কাল সমস্ত রাত আমার দাঁড়িয়ে কেটেছে।

আভা মাথা নত করিল। ঘোমটার মধ্যে তার চোখের জল ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

গোবিন্দ আভার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া আবার একটা বুকভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গোবিন্দকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াই রাসমণি হাসিয়া বলিলেন—মুখপোড়া হনুমান দেখ্‌লি ?

গোবিন্দ ক্রোধ গোপন করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—দেখ্‌লাম জেঠিমা, সীতাদেবীর বরে হনুমানের জ্ঞাত্‌গোষ্ঠী সকলেরই মুখ পোড়া—তফাৎ এই, একজন ভালো কাজের জন্যে মুখ পুড়িয়েছিল, অন্যগুলো উপহাসের হাসির আঁচে মুখ পুড়িয়েছে।

রাসমণি অন্তরের মধ্যে সন্দেহে অনুভব করিলেন যে গোবিন্দর কথাগুলা বিশেষ সরল ও নির্বিষ নহে ; কিন্তু তার মুখে হাসি দেখিয়া হাসিমুখের কথায় রাগ প্রকাশ করিতে পারিলেন না। গম্ভীর হইয়া শুধু বলিলেন—জ্ঞাত্‌গোষ্ঠীর মুখ পুড়্‌লো কিসে ?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—হনুমানের পোড়ামুখের জ্বালায়।

রাসমণি খুসী হইয়া বলিলেন—তুই এক-একটা কথা বড় ঠিক বলিস্ গোবি ! বৌটোর জ্বালায় পাড়ায় আর আমাদের মুখ দেখাবার জো রইলো না। কি দজ্জাল মেয়ে বাবা !

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া বলিল—সত্যি, দাদা হেন ছেলের কপালে এমন বৌ জুটলো জেঠিমা ! দাদা যাই তাই অমন করতে পারছে, অন্য লোক হলে মাথায় কোরে রাখ্‌তো হয়ত।

—তুই হলেই রাখ্‌তিস। আমার কি কম ভয় হয়েছিল, হয়ত বা বৌএর চাঁদপানা মুখ দেখে জগা ভেড়ো বোনে থাক্‌বে। কিন্তু তেমন ছেলে আমি পেটে ধরিনি, আর কেমন বাপের বেটা ! এত বয়স পর্যান্ত আমরা কোনোদিন ওঁর কাছে মুখ তুলে কথা কইতে পেরেছি ? পান থেকে চুন খস্‌লে খড়ম দিয়ে দিতেন পিঠ ভেঙে। আর তাঁর মা আমার শাশুড়ী ত ছিলেন না, যেন রাইবাঘিনী ! তাঁদের কাছেই ত আমার শিক্ষে ! তাঁরা বল্‌তেন—কুকুর আর বৌ শাসনে

না রাখ্‌লে মাথায় চড়ে। জোগুও ওসব কথা জানে, শাস্তর পড়েছে কিনা!

এমন সময় জগন্নাথ পাড়া বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়াই আত্মপ্রশংসা শুনিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

গোবিন্দ অতি কষ্টে বিদ্রোহী হাত দুটাকে ঐ বর্ব্বরের টিকি ধরিয়া এক কিলে দাঁতগুলা ঝরাইয়া দিবার প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া হাসিয়া বলিল—তা দাদা, স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করলে কেমন কোরে?

জগন্নাথও গোবিন্দর কপট হাসি দেখিয়া প্রতারিত হইয়া হাসিয়া বলিল—আরে দেখ্ না. তামাক সেজেছে ত ঠিক্‌রে খায় নি! এতে রাগ হয় কি না-হয়! কল্‌কেটা ছুড়ে ফেলে দিতে গায়ে লেগে গেল।

ইতিমধ্যে আভা তাড়াতাড়ি গিয়া বাড়ীর পিছনের পচা ডোবা হইতে একটা ডুব দিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া শাশুড়ীর বঁটি ধরিয়া নীরবে জানাইল—আমায় বঁটি দাও আমি তরকারি কুটে নিচ্ছি।

তাকে দেখিয়াই গোবিন্দ বলিয়া উঠিল—এ তোমার ভারী অন্যায় বৌদিদি, কেমন কোরে তামাক খেতে হয় তাও শেখোনি! মহাদেবের স্ত্রী দুর্গা, জানো ত. তিনিই হলেন আদর্শ সতী; কেন. না, তিনি স্বামীর গাঁজা ভাং চরস সব নেশার তত্ত্বই জানেন. আর যখন যেটির দরকার. নন্দী ভৃঙ্গীর হাত জোড়া থাক্‌লে. সেটি সেজে দিতে পারেন!

রাসমণি বঁটি ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে হাসিয়া বলিলেন—তুই ত চিরটা কাল ইংরিজি পড়্‌লি গোবি. তুই এত শাস্তর শিখ্‌লি কোথায়?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—দাদা যে আমার কথক।

রাসমণি ও জগন্নাথ খুসী হইয়া উঠিল।

যে কলহ ও ক্রোধের বিষ সঞ্চিত হইয়া আভাকে জ্বালাইবার জন্য ছিল তাহা গোবিন্দ নিজের হাসি ও বিদ্রূপ দিয়া ঢাকিয়া আভাকে

বাঁচাইতে গিয়া নিজে সে যে কতখানি জ্বালা সহ্য করিল, তাহা গোবিন্দর চেয়েও বেশী বুঝিল আভা, এবং কিছুই বুঝিল না রাসমণি ও জগন্নাথ। বাতাসে যখন বেশী বিদ্যুৎ জমে তখন পৃথিবী যেমন বুক পাতিয়া বজ্রাঘাত সহিয়া বাতাসকে হাল্কা করিয়া দেয়, গোবিন্দও তেমনি নিজের ক্রোধ ও দুঃখ দমন রাখিয়া রাসমণি ও জগন্নাথের ক্রোধ ভুলাইয়া আভার অবস্থা একেবারে হাল্কা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

যাইবার সময় গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—বৌদিদি সোমবার বাপের বাড়ী যাবে, না ?

রাসমণি বলিল—হ্যাঁ, জোগু একবার পেরবাসে যাবে, বেয়াই বৌমাকে নিয়ে যাবার কথা লিখ্ছেন, ঘুরে আসুক একবার। বেয়াই সোমবার সকালে এসেই বারোটার গাড়ীতে নিয়ে যাবেন, ডাক্তার মানুষ বেশী দেরী ত করতে পারবেন না।

আভা বুঝিল গোবিন্দ কেন ঐ প্রশ্ন করিল। আভা এবাড়ী থেকে গেলে গোবিন্দ নিশ্চিন্ত ও সুখী হইবে। আভার কিন্তু এই দুর্দশা দেখাইয়া পিতা ও ভাইকে অসুখী করিবার ইচ্ছা হইল না; তার বাবা রাগী মানুষ, তিনি আসিয়া কন্যার দুর্দশা দেখিলে আভার শাশুড়ী ও স্বামীর সঙ্গে যে বচসা হইবে তাহা আভার প্রীতিকর হইবে না। আভা আহারাদির পর বাবাকে চিঠি লিখিল, তিনি যেন এখন তাকে লইতে না আসেন, সে এখন যাইতে পারিবে না। তার যখন যাইবার ইচ্ছা হইবে সে তখন জানাইবে।

দশ

সোমবার সকালে উঠিয়াই গোবিন্দ বিছানা ও তোরঙ্গ বাঁধিতে বসিল। তার মা বলিলেন—কিরে গোবি, আজকে কল্কাতা যাবি নাকি ?

বিছানার গাঁটে একটা দড়ির গেরো কষিতে কষিতে গোবিন্দ বলিল—হ্যাঁ মা।

—ছোট্ট তোরঙ্গটা নিচ্ছিস্? বই-টই কিসে নিবি?

—বই নেব না।

—এগ্‌জামিন্ দিতে যাচ্ছিস্ যে?

—কে বল্‌লে এগ্‌জামিন দিতে যাচ্ছি? সে সব ছেড়ে দিয়েছি অনেক কাল।

—তবে এখন খরচপত্তর কোরে আবার কল্‌কাতা যাবার মানে?

—গাঁয়ে থাক্‌তে ভালো লাগ্‌ছে না।

কমলা মনে করিলেন জগন্নাথের বাড়ীতে বধূপীড়ন দেখিতে পারিতেছে না বলিয়া গোবিন্দ দূরে পালাইতেছে। কমলা বলিলেন—জগন্নাথ পরবাসে যাচ্ছে, বৌমা যাচ্ছে বাপের বাড়ী, ওরা ত একমাস পরে ফিরে আস্‌বে।

—তখন আমিও ফির্‌ব।

পুত্রের কথা শুনিয়া কমলা বুঝিলেন তবে তাঁর অনুমান মিথ্যা। রহস্যময় পুত্রটির উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। গোবিন্দ জগন্নাথের বাড়ীতে গেল।

আভা ম্লান মুখে ব্যস্ত তৎপরতার সহিত কাজ করিয়া বেড়াইতেছিল। ভাঁড়ার-ঘরের রকে বসিয়া ছিলেন রাসমণি আর জগন্নাথ। রাসমণি আভার দিকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা বৌমা, তুমি এমন গোম্‌রামুখো মেয়ে কেন বাছা? পোড়ার মুখে কি একটু হাস্‌তে নেই? কি এমন নুনের নৌকো ভরাডুবি হয়েছে তোমার? বাড়ীতে রাতদিন গোম্‌রা মুখ আর দাঁতের বাদ্যি দেখে শুনে লক্ষ্মী চঞ্চলা হন, গেরস্তর অকল্যেণ হয়। তোমার বদ স্বভাবের জন্যে যে আমাদের সুদ্ধ

স্বভাব বিগ্‌ড়ে গেল ! অমন রাগ কোরে কোরে তোমার কাজ কর্‌তে হবে না, রাখো বাছা ! একটু হাসো দেখি ?

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া বাস্তবিক আভার হাসি আসিল, কিন্তু তখনই গোবিন্দকে বাড়ীতে ঢুকিতে দেখিয়া তার আর হাসা হইল না, তার মুখ ম্লানতর হইয়া গেল।

তাহা দেখিয়া ও গোবিন্দ আসিতেছে না দেখিয়া জগন্নাথ বলিয়া উঠিল—হাস্ বল্‌ছি। নইলে মেরে হাসাব তোকে।

গোবিন্দ উঠানে আসিয়া হাসিয়া বলিল—দাদার মুখে মারের কথা শুনেই আমার হাসি আস্‌ছে ; মার খেলে ত বৌদিদি হাস্‌তে হাস্‌তে দমফেটে মরেই যাবে। মারটা দেখ্‌ছি দাদা "লাফিং গ্যাসের" চেয়েও হাসির ওষুধ !

জগন্নাথ অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিল। রাসমণি পুত্রের অবস্থা দেখিয়া গম্ভীর হইয়াও নরম স্বরেই বলিলেন—গবা, তুই সমান গোঁয়ারই আছিস্, তবে আগের চেয়ে ঢের শেয়ানা হয়েছিস। আগে কথায় কথায় রেগে চটে লোকের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া দাঙ্গা কর্‌তিস, এখন চিপ্‌টেন চিপ্‌টেন কথায় হেসে হেসে লোককে চিমটি কাটিস্, লোকের রাগ কর্‌বার জো থাকে না।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ঠিক ধরেছ জেঠিমা। আগে ঝগড়া কর্‌তাম, তোমরা বাড়ী ঢুক্‌তে দিতে না, আমিও বাড়ী ঢুক্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু আপনার লোকের বাড়ীতে আসা বন্ধ হয় যাতে এমন করা কি ভালো ?...

আভা বুঝিল কেন গোবিন্দ তার উগ্র ক্রোধ দমন করিতেছে, এবং তার ক্রোধ কতবড় উগ্র যে দমন হইয়াও ঐরূপ শ্লেষ ও ব্যঙ্গের বাক্যে ঝলকে ঝলকে বাহির হইয়া আসিতেছে। রাসমণির মুখে কিন্তু ক্রোধ ও বচসা স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখিয়া গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বলিল—এ আপদ কিছুদিনের জন্যে গাঁ ছেড়ে যাচ্ছে জেঠিমা।

রাসমণি তার কথার জবাব না দিয়া বলিলেন—বৌমা, আজ বেয়াই আস্‌বে। মুগের দাল রাঁধো, নারকোল-কুমড়ি করো, পালং শাগের ঘণ্ট করো, আর সৈরবা জেলেবাড়ী থেকে বড় গল্‌দা চিংড়ি হোক কি পোনা হোক যা পায় মাছ আনুক, তাই দিয়ে কপি দিয়ে কালিয়া করো, আর আমের অম্বল করো। বেয়াইএর জন্যে সেই যে আমাদের ক্ষেতের বাদ্‌শাভোগ চাল আছে তাই আলাদা চারটি রেঁধো।

আভা শাশুড়ীর কাছে আসিয়া মৃদু স্বরে বলিল—বাবা আস্‌বেন না।

রাসমণি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—কেন ?

আভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি এখন যাবো না।

রাসমণি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—বাপকে আস্‌তে বারণ করা হয়েছে বুঝি ! যে মেয়েমানুষ লেখা পড়া জানে তার অসাধ্যি কি আছে ? কখন্ চুপিচুপি বাপকে চিঠি লেখা হয়েছে—একখানা কথাকে সাতখান কোরে লাগিয়ে ! তা তোর বাপ আমাদের কি করবে লা হারামজাদী ' যে একখানা তালুক মুলুক দিত তা না হয় না দেবে। এইজন্যেই বলে মেয়েলোককে লেখাপড়া শেখাতে নেই ! গোসা কোরে বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না লেখা হয়েছে, বাপ মনে কর্‌বে আমরা মেয়েকে নাজানি কত কষ্টই দিচ্ছি, আমরাই বা যেতে দিতে চাচ্ছিনে।......

রাসমণির এই অকারণ ক্রোধ ও যুক্তিশূন্য তিরস্কার থামাইবার জন্য গোবিন্দর মন ছটফট করিতেছিল, কিন্তু সে রাসমণির অনর্গল বাক্য-স্রোতের মধ্যে এমন একটু ফাঁক পাইতেছিল না যে কথা পাড়িয়া তাতে বাধা দ্যায়। অনেকখানি একদমে বকিয়া রাসমণি বকুনির সমের ঘরে যেমন নিশ্বাস ফেলিতে থামিলেন, অমনি গোবিন্দ বলিয়া উঠিল—তা নয় জেঠিমা। আমাদের নিন্দে কোরে লিখ্‌লে ত তালই মশায় ছুটেই আস্‌তেন। বৌদিদি তোমাকে একলা ফেলে রেখে কেমন কোরে এখন

যাবে বলো ত? দাদা যাচ্ছেন প্রবাসে, কবে ফিরবেন ঠিক নেই; তুমি বুড়ো মানুষ, তায় শরীর ভালো নয়, তোমায় একলা ছেড়ে বাপের বাড়ী যেতে চাইবেন বৌদিদি তেমন ছেলেমানুষ ত নন। উনি গেলে তোমার সেবা করবে কে? দাদা ফিরে এলে তখন যাবেন। না বৌদি?

আভার মন গোবিন্দর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, সে বুঝিল কতখানি ভালোবাসা লইয়া গোবিন্দ অহরহ তাকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ফিরিতেছে। তার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, মুখ উজ্জল হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া জগন্নাথ বলিল—গোবি ঠিক কথাই বলেছে। গুরুজনের বশে থাকাই ধর্ম্ম, এ আমি শিখিয়েছি।

গোবিন্দ বলিল—হ্যাঁ, বাক্যে ও আচরণে তোমার দৃষ্টান্ত ত বৌদিদি অষ্টপ্রহরই পাচ্ছেন. সে শিক্ষা ভোলা শক্ত বটে।

রাসমণি নরম হইয়া খুসী মনে বলিলেন—হ্যাঁ উচিত কথা বলব, বৌমা দুষ্টু দজ্জাল হোক, যে শিক্ষাটি একবার পায় তা আর ভোলে না।

গোবিন্দ বলিল—তোমরা একেবারে মনে গেঁথে দাও কিনা। অন্য লোকে এরকম পারে না।

রাসমণি গর্ব্বিতভাবে বলিলেন—পারবে কোত্থেকে? আমার শাশুড়ী-সোয়ামীর কাছে শিক্ষে. আর জোগু আমার কাছেও শিখেছে শাস্তর পড়েও শিখেছে। আর কেউ কি এমন শাস্তর জানে?

গোবিন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন—তুই ত আজ কলকাতা যাবি? তা জগন্নাথের জন্যে ত সকাল-সকাল ভাত হবে, তুইও এইখানে খেয়ে যাস।

গোবিন্দ যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আমার হয়ত যাওয়া হবে না জেঠিমা; তবে খেয়ে যাব, নেমন্তন্ন পেয়ে কি ছাড়ি—হাজার হোক পেটুক বামুন ত!

রাসমণি ও জগন্নাথ হাসিতে লাগিল। জগন্নাথ বলিল—ওটার মতিস্থির নেই; এই বল্লে কল্‌কাতা যাব, এই বলে বস্‌ল যাব না; বলে গেল খাব, হয়ত নিজের বাড়ীতেই খেয়ে বসে থাক্‌বে!

আভা কিন্তু বুঝিল গোবিন্দ কিছুতেই এ বাড়ীর নিমন্ত্রণ ভুলিবে না; এ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পাইলে গোবিন্দর কেন অত উৎসাহ হয় আর কেনই বা সে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়া হঠাৎ স্থগিত করিল তারও কারণ আভার অগোচর রহিল না।

গোবিন্দ বাড়ীতে গিয়াই বাঁধা মোটগুলা খুলিয়া ফেলিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তার মা জিজ্ঞাসা করিলেন—আবার খুল্‌ছিস যে?

—যাব না।

—কেন?

—খুসী।

—এই খুসীটাই কেন হল তাই ত জান্‌তে চাচ্ছি।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—বল্‌ব না।

কমলাও হাসিয়া বলিলেন—আমি বল্‌ব?

গোবিন্দ হাসিয়াই বলিল—না, বল্‌তে হবে না।

—তা হলে আর রান্নার তাড়াতাড়ি কর্‌ব না?

—না, আমায় জেঠিমা নেমন্তন্ন করেছেন।

—বেয়াই এসেছেন?

—না, তিনি আস্‌বেন না, বৌদিদি বারণ করেছেন আস্‌তে। আমাদের যাতে লজ্জা পেতে হবে তা তিনি বাপের কাছে প্রকাশ কর্‌বেন না বোলেই যাবেন না।

আভার কথায়, গোবিন্দর উৎসাহ ও তার প্রতি এর মনের টান

কমলার অগোচর ছিল না। তিনি গম্ভীর হইয়া বলিলেন—গোবিন্দ, তুই আর অত বেশী ও-বাড়ীতে যাস্‌নে।

গোবিন্দ মায়ের মুখের দিকে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তুমি আমাকে ভয় করছ মা?

কমলা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—না, তোকে আমি ভয় কি অবিশ্বাস করিনে। তবু, কাজ কি?

গোবিন্দ বলিয়া উঠিল—আভা, মা, বড় ভালো মেয়ে; তাকেও ভয় নেই।

—আমার চেয়ে তুই তাকে ভালো জানিস, হয়ত তাকেও ভয় নেই। কিন্তু আরো ত লোক আছে, যারা মন্দ রটাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—গাঁয়ের গাড়োলদের ভ্যাভ্যা ডাকে তোমার গোবিন্দ কোনোদিন ডরিয়েছে?

কমলা পুত্রের বলিষ্ঠ সৎ চরিত্র চিনিতেন; সে যাহা সৎ বলিয়া জানে তাহা সে নিঃসঙ্কোচে সকল বাধা ঠেলিয়া সকল নিন্দা স্বীকার করিয়া করে, তাহা কমলা জানিতেন। তাই আর কিছু তিনি বলিলেন না। গোবিন্দ বিছানাটাকে খুলিয়া আবার খাটে বিছাইতে লাগিল।

এগারো

দ্বারকেশ্বরবাবু আভার চিঠি পাইয়া হাসিলেন, মনে মনে ভাবিলেন—মেয়ের আমার এরই মধ্যে শ্বশুরবাড়ীর ওপর এম্‌নি টান হয়েছে যে বাপের কাছেও আর আস্‌তে চান না, অরুণের জন্যেও আর মন-কেমন করে না।

এই কথা মনে হইতেই তাঁহার হাসি ম্লান হইয়া উঠিল, তিনি আবার

ভাবিলেন—মেয়ে কত শিগ্‌গির বাপ-মা-ভাই-বোন ভুলে অচেনা পরের আপনার হয়ে যায়। আভা সুখে আছে তাই আমাদের ভালো; আভার আমার যে সুখ হবে তা আমি জগন্নাথকে দেখেই বুঝেছিলাম। আমি শুধু লোকের নাড়ী টিপে রোগই চিনি তা নয়, লোকটাকেও চিন্‌তে পারি। অমন সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করতে পারা ভাগ্যের কথা। আহা আভা আমার মায়ের আদরযত্ন পায়নি; শাশুড়ীর আদরযত্নে আর স্বামীর ভালোবাসায় সে সুখে আছে, সে যেখানে থাক্‌তে চায় সেখানেই থাকুক।

এই রকম ভাবিতে ভাবিতে দ্বারকেশ্বরের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি চোখের জল মুছিয়া আভাকে পত্রের উত্তর লিখিলেন।

গোবিন্দ রাসমণির নিমন্ত্রণে জগন্নাথের বাড়ীতে খাইতে আসিয়াছে; জগন্নাথ বারোটার গাড়ীতে প্রবাসে শিষ্যবাড়ী ঘুরিতে ও কথকতা করিতে যাইবে। জগন্নাথ ও গোবিন্দ ভাঁড়ার-ঘরের রকে গিয়া রাসমণির কাছে বসিয়া আছে, আভা ঠাঁই করিতেছে। এমন সময় ডাকপিয়ন আভার নামের চিঠি দিয়া গেল। জগন্নাথ চিঠি তুলিয়া লইয়াই খাম ছিঁড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া গোবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ও চিঠি যে বৌদিদির নামের, তুমি খুল্‌ছ?

জগন্নাথ খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া কাগজের ভাঁজ খুলিতে খুলিতে বলিল—তাতে দোষ কি? স্ত্রী ত স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী, তার ত এমন কিছু গোপনীয় থাক্‌তে পারে না যে স্বামী পড়্‌তে পারে না। ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি!

গোবিন্দ চুপ করিয়া রহিল। রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—চিঠি কে লিখেছে?

—শ্বশুর-মশায়।

—কি লিখেছে বেয়াই, পড়্ ত।

জগন্নাথ চিঠি পড়িতে লাগিল।—

কল্যাণীয়াসু।—

মা আভা, তুমি এখন আস্‌তে চাও না জেনে আমার যেমন দুঃখও হলো তেম্‌নি সুখও হলো। শ্বশুরবাড়ীই স্ত্রীলোকের আপনার বাড়ী, শ্বশুর-শাশুড়ী গুরুজনের সেবাশুশ্রূষা ও স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী হওয়াই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। আমি সুখী হচ্ছি এই ভেবে যে তোমার লেখাপড়া শিক্ষা বিফল হয় নি, তুমি আপনার কর্ত্তব্য বুঝ্‌তে পেরেছ। তোমাকে যখন আমি সর্ব্বগুণান্বিত সৎপাত্রের হাতে সমর্পণ কর্‌তে পেরেছি, তখনই আমি জানি যে তোমার সুখের অবধি থাক্‌বে না; তুমি যে তোমার বাবার কাছেও আস্‌তে চাও না তাতেই বুঝ্‌ছি যে তুমি সেখানে শাশুড়ীর কাছ থেকে মায়ের স্নেহ আদর যত্ন পাচ্ছ। কিন্তু কেবল নিলেই হবে না মা; তোমার শাশুড়ী আর স্বামীর আদর যত্ন ভালোবাসার ঋণ তোমাকে শোধ কর্‌তে হবে কায়মনোবাক্যের সেবাশুশ্রূষা দিয়ে। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মায়ের যে অভাব তোমার শাশুড়ী পূরণ করেছেন তা তোমার ভাগ্যে চিরস্থায়ী হোক, তোমার স্বামীসৌভাগ্য অক্ষয় হোক। অমন স্নেহপরায়ণা শাশুড়ীমাতা ও স্নেহময় স্বামীকে ছেড়ে অল্পদিনের জন্যেও আস্‌তে তোমার কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু মা, তোমার বাবা আর ভাইকেও ত এক-একবার দেখা দেওয়া উচিত। উমা মেনকার ঘরে বছরে তিনটি দিনের জন্যে আস্‌তে পান, আমিও মা তার বেশী তোমায় ধোরে রাখ্‌ব না। তোমার ইচ্ছা হলে তোমার শাশুড়ীমাতার ও স্বামীর অনুমতি নিয়ে আমায় লিখো, আমি গিয়ে নিয়ে আস্‌ব। অরুণ ভালো আছে। সে রোজই জিজ্ঞাসা করে দিদি কবে আস্‌বে। অরুণ আমার অজ্ঞাতসারে লুকিয়ে লুকিয়ে গোবিন্দর

সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল; গোবিন্দ এখান থেকে চলে গেছে বলে অরুণ দুঃখিত হয়ে আমার কাছে তার গোপন কথা প্রকাশ কোরে ফেলেছে; সে রোজই জিজ্ঞাসা করে গোবিন্দ-বাবু কবে আস্‌বেন? তার খর্‌গোশ হরিণ ময়ূর অনেক নতুন বন্ধু জুটেছে, তবু সে তার দিদি আর গোবিন্দ-বাবুকে ভোলেনি। শীঘ্র শীঘ্র তোমাদের কুশল-সংবাদ জানিয়ে নিশ্চিন্ত রাখ্‌বে। বৈবাহিকা-ঠাকুরাণীকে আমার ভক্তি-কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রণাম জানাবে; জামাতা বাবাজীকে শুভাশীর্ব্বাদ জানাবে। তোমার শাশুড়ী যে তোমাকে আদর-যত্নে এমন মুগ্ধ বশ করেছেন তার জন্যে আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম। ইতি।—

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীদ্বারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

চিঠি শুনিতে শুনিতে জগন্নাথ ও রাসমণির মুখ আপনাদের প্রশংসায় আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল; আভার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল তার বাবা কি বিষম ভুলে প্রতারিত হইতেছেন ও ইহারা সেই ভুলটাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া কিরকম আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে দেখিয়া; গোবিন্দর মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল ও ঘৃণা আর বিরক্তিতে কুটিল কৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল অদৃষ্টের পরিহাস আর এই নির্লজ্জদের বর্ব্বর আচরণ এমন প্রচ্ছন্ন ছদ্মবেশে থাকিয়া প্রশংসা পাইয়াছে বলিয়া। অরুণের কথা শুনিতে শুনিতে আভার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল, সে একবার গোবিন্দর দিকে চাহিল; গোবিন্দর মনও সেই শিশু বন্ধুটির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেও ম্লান মুখে একবার আভার দিকে চাহিল; তাদের দুজনের মনের উপর দিয়া কত দিনের কত কথা বায়োস্কোপের চিত্রমালার মতন বহিয়া গেল, ঐ অরুণকে মধ্যস্থ রাখিয়া তাদের দুইজনের আলাপের কথাও মনে পড়িল।

চিঠি পড়া শেষ হইলে রাসমণি বলিয়া উঠিলেন—বেয়াই অতি মহাশয় লোক! অমন বাপের এমন দজ্জাল মেয়েও হয়!

জগন্নাথ গোবিন্দকে খোঁচা দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল—মহাশয় বলতে? যে গোবিন্দ বাড়ী চড়াও হয়ে অপমান করে এল, তার কথাই কত লিখেছেন!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—তোমার শ্বশুরমশায় লোক চেনেন, আমি হতভাগা তাঁর কাছে যেতেই গলাধাক্কা, আর তুমি সৎপাত্র যেতেই কন্যা সম্প্রদান!

জগন্নাথ হাসিয়া বলিল—তোর হিংসে হচ্ছে নাকি?

—তা একটু হয় বৈ কি।—বলিয়া গোবিন্দ হাসিমুখে আভার মুখের দিকে তাকাইল। আভা মাথা নত করিয়া সেখান হইতে রান্নাঘরে ভাত বাড়িতে চলিয়া গেল। জগন্নাথ গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বারো

জগন্নাথ বাড়ীতে নাই আভা যেন বাঁচিয়াছে—সে জগন্নাথের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে বলিয়া যতটা না, যে স্বামীকে সে শ্রদ্ধাভক্তি করে না, ভালোবাসে না, বরং ঘৃণা করে, সেই স্বামীর সঙ্গে একত্র বাস করা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে বলিয়া যতটা। সে এখনও সমস্ত দিন শাশুড়ীর মুখনাড়া খাইয়া কাজের মধ্যে হাবুডুবু খাইতে খাইতে সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি আটটা নয়টা পর্য্যন্ত খাটিয়া মরিতেছে বটে, কিন্তু এ খাটুনি ও খিচুনি জগন্নাথ বাড়ীতে থাকার সময়ের চেয়ে ঢের কম; জগন্নাথ পাড়া বেড়াইয়া রাত্রি এগারোটার আগে কোনোদিন বাড়ী ঢুকিত না, তার আহার কোলে করিয়া আভাকে বসিয়া থাকিতে হইত, তার আহার হইলে সেই পাতে প্রসাদ পাইয়া তবে আভা শুইতে

পাইত; এখন শাশুড়ীকে জল খাওয়াইয়া দিতে পারিলেই তার ছুটি, কোনোদিন বা সে নিজে খায়, কোনো দিন বা খায়ও না, অমনি গিয়া শুইয়া পড়ে। আগে, শুইয়াও তাহার নিষ্কৃতি ছিল না, হয় পিঠে সুড়সুড়ি দিয়া দীর্ঘ দিবানিদ্রায় নিদ্রাবেশশূন্য স্বামীপ্রভুকে ঘুম পাড়াইয়া দিতে হইত, নয়ত তার শাস্ত্রোপদেশের উদ্গার জাগিয়া থাকিয়া শুনিতে হইত, ঘুমে চোখ একটু ঢুলিয়া আসিলে অবজ্ঞাশঙ্কিত ক্রুদ্ধ স্বামীপ্রভু প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সে রাত্রির মতন আভার নিদ্রাটুকু ভাগাইয়া ছাড়িত; আর এখন, সে নিরুপদ্রবে পড়িয়া পড়িয়া আপনার অদৃষ্টেরই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়ে, সে ঘুম শাস্ত্রের উপদেশের কচ্‌কচিতে ব্যাঘাত পায় না, ভোর রাত্রে ধাক্কা খাইয়া উঠিয়া স্বামীদেবতার তামাক সাজিয়া দিতেও হয় না। বধূর নিকটে পুত্র থাকিতে রাসমণির সদাসর্ব্বদাই শঙ্কা হইত পাছে পুত্র বধূর অনুরক্ত হইয়া পড়ে, পাছে সে বধূর কোনো গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠে; তাই রাসমণি সর্ব্বদা বধূর দোষত্রুটি সন্ধানে বিশেষ ব্যগ্র থাকিতেন, এতটুকু ত্রুটি এতবড় করিয়া পুত্রের কাছে লাগাইয়া ছেলের মন ভারী করিবার চেষ্টা করিতেন, সেই ত্রুটির জন্য জগন্নাথ একগুণ বকিলে বা মারিলে রাসমনির যথেষ্ট মনে হইত না, তিনি পুত্রকে উত্তেজিত করিবার জন্য নিজেও সাতগুণ বকিয়া মারিয়া লইতেন; এখন জগন্নাথ বাড়ী না থাকাতে রাসমণি বধূর ত্রুটি অনুসন্ধানের কাজ হইতে দিন কয়েকের জন্য ছুটি লইয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন, সুতরাং আভা একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইয়াছিল। রাসমণি প্রাণপণ যত্নে আভাকে মন্দ প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেও তাঁর মনের মধ্যে আভার চরিত্রের মাধুর্য্য একটু একটু যেন জায়গা করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহাতে তিনি আরো শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, পাছে এই ডাইনীমায়ায় বদ্ধ হইয়া

তাঁর সোনার জোগু বিগ্‌ড়াইয়া যায়। রাসমণির মনের মধ্যে পুত্র সম্বন্ধে একটা বিকট ঈর্ষা ছিল ; ঐ একটি মাত্র ছেলেকে কোলে করিয়া তিনি বিধবা হইয়াছিলেন, কেবল তার কাছ হইতেই তিনি মমতা ভালোবাসা পাইয়াছেন, স্বামী ও শাশুড়ীর আদর তাঁর জানা ছিল না ; সুতরাং সেই ছেলে অপর কাকেও বেশী ভালো বাসিবে বা অপর কেহ তাকে বেশী ভালোবাসিবে ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না ; সকল মায়েরই বোধ হয় এই ঈর্ষা একটু আধটু থাকে, তাই অধিকাংশ শাশুড়ীই সেই ঈর্ষা দমন করিতে না পারিয়া বৌকাঁটকী হয় ; রাসমণির সেই ঈর্ষাটা অত্যধিক মাত্রায় ছিল ; তাই তাঁর চোখের সামনে দিয়া বৌ ছেলের ঘরে গেলে তাঁর গা জলিয়া উঠিত, তাতে তিনি শুধু বৌএর বেহায়া-পনা দেখিতেন না, বৌ তাঁকে অবজ্ঞা করিয়া অপমান করিল অনুভব করিতেন ; তাঁর উঠিবার আগে যদি বৌ উঠিয়া না থাকিত তাহা হইলে তাঁর ক্রোধের অন্ত থাকিত না। এখন জগন্নাথ বাড়ী না থাকাতে বধূর শয়ন ও উত্থানের নিয়ম সম্বন্ধে রাসমণির অনেক খানি উদার শিথিলতা দেখা যাইতেছিল এবং আভাও আরামে বিশ্রাম করিয়া বাঁচিতেছিল।

কিন্তু যার অদৃষ্টই খারাপ তার ভাগ্যে সুখ সহে না। জগন্নাথের সঙ্গে যে সেথো প্রবাসে গিয়াছিল সেই বাঞ্ছারাম বৈরাগী একদিন বাড়ীতে ঢুকিয়াই বাঁশের লাঠির ডগায় বাঁধা একটা পোঁটলা ও একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ আছ্‌ড়াইয়া উঠানে ফেলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তার কান্না শুনিয়াই রাসমণি ছুটিয়া আসিয়াই আশ্চর্য্য ও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ওরে বাঞ্ছা কাঁদিস কেন রে ? জগন্নাথ কই ? তুই ফিরে এলি কেনরে ?

"সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে মা !"—বলিয়া বাঞ্ছারাম আছ্‌ড়াইয়া রাসমণির

পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল। "গোসাঁইজু বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন মা! ভোরবেলা শুধু দুটিবার ভেদ-বমি আর অমনি হিম-অঙ্গ হয়ে গেল। "

রাসমণি শুনিতে শুনিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—ওরে জোগুরে কোথায় গেলিরে বাবা! তোর মনে এই ছিল ওরে জোগু! কি কুক্ষণে তুই পের্‌বাসে গেলিরে বাবা যে আর বাড়ী ফির্‌লিনে...

বাঞ্ছারামের কান্না শুনিয়া আভাও ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তার কান্নার কারণ অবগত হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তারপর তার শাশুড়ীকে আছড়াপিছড়ি করিয়া কাঁদিতে দেখিয়া সে তাঁকে ধরিবে বলিয়া আস্তে আস্তে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, আর সেই সময়ে অন্য দিক হইতে গোবিন্দ ও তার মা এবং পাড়াপড়্‌শী আরো পাঁচ সাত জন দৌড়িয়া আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। সকলে আসিয়া দেখিল রাসমণি লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতেছেন, কিন্তু আভার চোখে একটুও জল নাই, তার কোনো চাঞ্চল্য বা অস্থিরতাও নাই। রাসমণিও তাঁর কান্নার মধ্যে তাহা লক্ষ্য করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—দূর হ ডাইনী, সোয়ামী মর্‌ল ত চোখে এক ফোঁটা জল নেই, আস্‌ছেন যেন রঙ্গ দেখ্‌তে! দূর হ।

আভা পাড়ার লোকদের আসিতে দেখিয়াই ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল; এখন শাশুড়ীর আদেশ পাইযা সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া গিয়া ঘরের কোণে আশ্রয় লইল।

রাসমণি তখন পুত্রশোকের সমস্ত দায় আভার উপর আরোপ করিয়া বিলাপ করিতে সুরু করিলেন—ওরে বাবারে এমন রাক্কুসী বৌ ঘরে এনেছিলি রে যে বছর ঘুর্‌ল না বাপ! পোড়ারমুখী শতেক-খোয়ারী বাপ-ভাইএর মাথা না খেয়ে আমার বাছাকে গেরাস করলি কেন রে।

যেদিন থেকে দেখেছি যে ডাইনীর পোড়ারমুখে হাসি নেই, সেই দিনই বুঝেছিলাম বাপ, আমার বাড়ীর হাসি নিভে যাবে। ডাইনী বিদেয় হবে বোলে সব ঠিক ছিল যে রে বাবা, ডাইনী ছল কোরে নিজে না গিয়ে তোকে যমের মুখে ঠেলে পাঠালে রে। তুই আমার কোল খালি কোরে ডাইনীর বুক ভরিয়ে গেলিরে জোগু! আমার সোনার চাঁদকে যে রাহু গেরাস করেছে তাকে আমি গেরাস কোরে দেখাবো যে আমি কত বড় রাক্কুসী! আমার যে বুক ভেঙে যাচ্ছে বাবা, আর ডাইনী ছুঁড়ির চোখে এক ফোঁটা জল নেই—ওর নোয়া সিঁদুর ঘুচ্‌লো বলে যে ওর সুখ বাড়্‌ল রে! কে আর ঐ কালনাগিনীর বিষদাঁত ভাঙ্‌বে রে, ও যে আমার কল্‌জেতে ছোবল মেরেছে বাপ!

গোবিন্দ মাকে চুপিচুপি বলিল—মা, তুমি বৌদিদিকে দেখগে।

কমলা আভার কাছে গিয়া দেখিলেন আভা দেয়ালে ঠেসান দিয়া মুখ উঁচু করিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে, তার চোখে এক ফোঁটা জল নাই। কমলাকে আভার সন্ধানে যাইতে দেখিয়া আভাকে দেখিবার জন্য কৌতুহলী পড়্‌শীরাও সকলে গুটিগুটি আসিয়া সেখানেই জড়ো হইল। তারা আভার অশ্রুশূন্য মুখ দেখিয়া কেহবা কৌতুক কেহবা বিরক্তি কেহবা মমতা অনুভব করিল। একজন বলিল—ওমা এ কেমন মেয়ে গা! যারপরনাই সোয়ামী মারা গেল, চোখে এক ফোঁটা জল নেই! ধন্যি কলিকাল! মেয়েমানুষ নেকাপড়া শিখ্‌লে এম্‌নি খিষ্টানই হয়!

কেহবা মমতা দেখাইয়া বলিল—আহা ছেলেমানুষ, হঠাৎ শোকের চোট খেয়ে হক্‌চকিয়ে গেছে। স্বামী হেন ধন হারিয়ে বসা এই বয়েসে সেটা কি কম কথা গা!

একজন গলা বাড়াইয়া বলিলেন—নাও, এখন ওকে বার কোরে নিয়ে ঘাটে চলো, নোয়া সিঁদুর ঘুচিয়ে দাও।

এ কথা শুনিয়াই কাহারও আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া আভা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া একজন ওষ্ঠ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া চোখ মট্‌কাইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনীকে ইঙ্গিত করিল। একজন বলিল—এমন মেয়ের খুরে খুরে দণ্ডবৎ বাবা!

কমলা আভার পিঠের উপর দিয়া হাত দিয়া তাকে ধরিয়া লইয়া বাহিরে আসিতেই রাসমণির আক্রোশ ও আস্ফালন আবার দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। একজন পড়্‌শী আসিয়া তাঁকেও ধরিয়া বলিল—আর কেঁদে কি করবে? জীবন-ভোরই ত কাঁদতে হবে, এখন চলো একটা ডুব দিয়ে আসবে।

রাসমণি আস্ফালন করিয়া বলিলেন—হাঁ যাব বৈকি, ঐ হতভাগীর শুধু-হাত করা দেখ্‌লেও জোগুর শোক আমার কতক মিট্‌বে।

আগে আগে রাসমণিকে লইয়া একজন বয়স্কা প্রতিবেশিনী ও তার পর আভাকে লইয়া কমলা চলিলেন; আর তাদের পিছনে চলিল একটু দূরে থাকিয়া আর সকলে। গোবিন্দ সকলের পশ্চাতে।

পশ্চাৎবর্ত্তিনীদের একজন বলিল—উঃ! কি মেয়ে বাবা! আমরা মনে করতাম শাশুড়ী-সোয়ামীরই বুঝি দোষ; এ বউটোর মুখে রা নেই, বুঝি ভালোমানুষ। ও বাবা! এ যে দেখি আস্তমানুষখেকো ডাইনী!—জলজ্যান্ত সোয়ামীটেকে আলটপ্‌কা গিলে খেলে, তা একটু চোখে জল এল না?

গোবিন্দ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না. সে বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, বৌএর এ ভারী অন্যায়! 'কে আমায় পুড়িয়ে দেবে গো, কে আমায় জুতোপেটা করবে রে', বোলে ডুকরে ডুকরে স্বামীর গুণ বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা খুব উচিত ছিল!

মুখফোঁড় গোবিন্দকে সকলে বেশ ভালো রকমই চিনিত, সে যে

পিছনে আছে তাহা না জানিয়া তারা মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, এখন তার সাড়া পাইয়া সবাই চুপ করিয়া গেল, কারণ গোবিন্দকে ঘাঁটানো সুবিধার নয়, কবেকার কার কি দোষত্রুটি যে গোবিন্দর মনে টোকা থাকে তাহা কেহ বলিতে পারে না, একটু উস্কাইয়া দিলেই সে সব অকস্মাৎ ঠিকঠিক বাহির হইয়া পড়ে!

ঘাটে গিয়া কমলা আকুল অশ্রু মুছিতে মুছিতে আভার সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লোহা মুছিয়া খুলিয়া দিয়া বলিলেন—হায়রে মা, আমাকেই তোর এমন বেশ কর্‌তে হলো!

রাসমণি গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ছোটবৌ, ওর হাতের সোনার চুড়ি ঘোচাও, আমার সোনার চাঁদকে খেয়ে ও যে সোনার চুড়ি হাতে দিয়ে বেড়াবে সে আমার বুকে সইবে না।

কমলা কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—এখন ও-কগাছ থাক্ দিদি, পরে একদিন খুল্‌লেই হবে।

রাসমণি প্রতিবাদ করিয়া কিছু একটা উৎকট রকম কড়া কথা বলিবার উপক্রম করিতেই দেখিলেন আভা নিজেই সোনার চুড়িগুলি খুলিয়া ফেলিতেছে; আভা সোনার চুড়ি ও কানের ফুল খুলিয়া কমলার হাতে দিল। রাসমণি তাহা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন—আঃ! বুকটা আমার কতকটা জুড়ালো!

স্নান করিয়া উঠিয়া ধোয়া থান কাপড় পরিয়া আভা যখন দাঁড়াইল তাহাতেই তাহার অপূর্ব্ব শ্রী খুলিল। গোবিন্দ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল সেই দীর্ঘ ঋজু গৌর তনুখানি শাদা থান কাপড়েই কি সুন্দর মানাইয়াছে! আভার মুখে যে বেদনা-কাতর ম্লানিমা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাতে তাকে মূর্ত্তিমতী বৈধব্যদশা বলিয়া মনে হইতেছিল, না থাক তার চোখে জল আর না থাক তার আলুণ্ঠন বিলুণ্ঠন। আভার এই মূর্ত্তি দেখিয়া

কঠিন দৃঢ়চিত্ত গোবিন্দরও চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। কিন্তু অপর সকলের লক্ষ্য ছিল না আভার বেদনাবিদ্ধ মুখের দিকে, তারা বলাবলি করিতেছিল মেয়েটা কি রকম ডাকাত, নিজের হাতে কেমন করিয়া নিজের এয়োত ঘুচাইতে পারিল! সাক্ষাৎ ডাইনী রাক্ষসী না হইয়া যায় না। কেহবা আভার ঐ কাজের মধ্যে তাকে তেজে মটমট করিতে দেখিল, কেহবা এই অবস্থাতেও তার শাশুড়ীর কথায় রাগ করিতে দেখিল। গোবিন্দই একা আভার আচরণে আশ্চর্য্য হয় নাই। আভা শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া অবধি শাশুড়ী ও স্বামীর কাছে যে পরিমাণ গঞ্জনা লাঞ্ছনা অপমান আঘাত সহ্য করিয়াছে, তার সেই দুঃখের তুলনায় তার স্বামীবিয়োগ ত কতকটা নিষ্কৃতি; আবার যাহা এর পরে তাকে সহ্য করিতে হইবে, তার তুলনায় কয়গাছা সোনার চুড়ি বা পেড়ে কাপড় ত্যাগ করা ত তুচ্ছ ব্যাপার।

ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিয়াই রাসমণি বলিলেন—গোবি, তুই বেয়াই-মশাইকে একখানা চিঠি লিখে দে ত; একবার এসে মেয়ের কীর্ত্তিটা দেখুক।

গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া বলিল—তুমি যদি বলো জেঠিমা আমি গিয়ে বৌদিদিকে রেখে আস্‌তে পারি, বিধু বষ্টমীকে না হয় সঙ্গে দিয়ো…

রাসমণি উগ্র ঝাঁঝালো স্বরে বলিয়া উঠিলেন—ওকে আমি অম্‌নি ছেড়ে দেবো? ও আমার জোগুকে খেয়েছে, ওর আমি অশেষ দুর্গতি কোরে তবে ছাড়্‌ব।

যে কথাই হোক তাহাই আভার প্রতি রাসমণির ক্রোধ উদ্রেক করিতেছে দেখিয়া গোবিন্দ চুপ করিয়া গেল। রাসমণি আবার পুত্রের জন্ম বিলাপ করিতে লাগিলেন,—ওরে বাপরে আমার, কী কালনাগিনী ঘরে এনেছিলি রে, বছর না ঘুর্‌তে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে রে…

যথাসময়ে জগন্নাথের শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, এবং সে দিনও সমাগত নিমন্ত্রিতদের সাম্‌নে রাসমণি রাক্ষসী বৌএর জন্যই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে বলিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া বিলাপ করিলেন। দ্বারকেশ্বর-বাবুও এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া অরুণকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। দ্বারকেশ্বর বিধবা বেশা কন্যার সম্মুখে দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন—মা, তোর একি রূপ আমায় দেখ্‌তে হলো! তোকে যে আমি সুপাত্রে সমর্পণ কোরে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম মা! তোর যে মা ছিল না, মায়ের যত্নে তুই সুখে থাক্‌বি মনে করেছিলাম মা!

রাসমণি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ও কি তোমার তেমন মেয়ে বেয়াই যে ও আমাদের যত্ন আত্তি গায়ে মাখ্‌বে? এ বাড়ীতে এসে ইস্তক একটি দিন হাসেনি; মনের আগুনে গুম্‌রে গুম্‌রে বাছাকে আমার খাক্ কোরে তবে নিশ্চিন্দি হয়েছে। আমি ঐ সোনার কুচি আঁচলে বেঁধে বিধবা হয়েছিলাম, আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, রাক্কুসীর বুক ভর্‌ল। বিধবা হয়ে কাঁদে না, এমন রাক্কুসী মেয়ে তোমার, বেয়াই!···

দ্বারকেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া আভার মুখের দিকে চাহিয়া আভার অশ্রু-শূন্য শুষ্ক ম্লান মুখ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন আভার যে কি বিষম ক্ষতি হইয়া গেছে তাহা ছেলেমানুষ এখনো হয়ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; অথবা চিরকালের চাপা মেয়ে, নিজের দারুণ শোক অন্তরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে আর সেই অবরুদ্ধ শোকের ছায়ায় মুখখানি অমন মলিন ম্লান শুষ্ক দেখাইতেছে। যদি এই দ্বিতীয় অনুমান সত্য হয় তবে আভাকে বাঁচানো কঠিন হইবে মনে করিয়া দ্বারকেশ্বর চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। আভার শোক অশ্রুজলে যদি মুক্ত হইয়া বহিয়া যাইতে না পায় তবে ত আভার বুক ভাঙিয়া যাইবে।

কিন্তু রাসমণির একটা কথা দ্বারকেশ্বরের মনে আস্তে আস্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল—আভা এ বাড়ীতে এসে ইস্তক একটি দিন হাসেনি! কি ব্যথা বুকে পুষিয়া সে এই এক বৎসর এ বাড়ীতে আছে তাহা জানিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাসমণিকে মিনতি করিয়া বলিলেন—বেয়ান যদি অনুমতি করেন ত আমি দিনকতকের জন্যে আভাকে নিয়ে যাই।

রাসমণি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিলেন—না।

সুতরাং আর অনুরোধ করা চলিল না।

ক্ষুণ্ণমনে দ্বারকেশ্বর আভার কাছে বিদায় লইতে গেলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন আভা অরুণকে কোলে করিয়া ম্লান মুখে বসিয়া আছে; অরুণও কেমন বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছে; অরুণ এ বাড়ীতে আসিয়াই বিলাপের প্রবল ঝড়ের ঝাপটে কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে; এক বৎসর আগে যে-দিদির সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল, এ যেন তার সে দিদি নয়, এ দিদির মুখে হাসি নাই, প্রফুল্ল চঞ্চলতা নাই; একটা কি অবোধ্য দুঃখের গুমোট যেন তার দিদিকে ঘিরিয়া আছে; তাই সে কিছুতেই দিদির অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, সে খর্‌গোশ প্রভৃতি নূতন বন্ধুদের যেসব মজাদার খবর দিদিকে শুনাইবে বলিয়া স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহা ঐ গম্ভীরমূর্ত্তি বিষাদপ্রতিমা নির্ব্বাক দিদিকে বলিবার উৎসাহ তার আর ছিল না। তার পুরাতন বন্ধু গোবিন্দ-বাবুর সঙ্গেও তার তেমন করিয়া ভাব জমে নাই; তাকে দেখিয়াই যদিও তিনি "কি অরুণ-বাবু?" বলিয়া হাসিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, তথাপি সে চারিদিকে বিলাপধ্বনির মধ্যে অচেনা লোকদের সাম্‌নে আপনার উচ্ছল আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে নাই। তারপর গোবিন্দ, আভার কাছে অরুণ থাকিলে আভার মন প্রফুল্ল থাকিবে

মনে করিয়া, অরুণকে দিদির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে নাই।

দ্বারকেশ্বর-বাবু সজল নেত্রে কন্যার দুঃখাভিহত নিশ্চল মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমার শাশুড়ী ত তোমায় নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন না মা। তাঁর একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে তিনি বড়ই শোক পেয়েছেন, এ সময় তুমি কাছে থাক্‌লেও তাঁর কতকটা সান্ত্বনা, তাই তোমাকে তিনি কাছ-ছাড়া কর্‌তে চাচ্ছেন না। উনি অশিক্ষিত মেয়েমানুষ, শোকে কাতর হয়ে তোমায় যদি কিছু কটু কথাও বলেন তকিছু মনে কোরো না—সে-সব কথা শুন্‌তে কটু হলেও সেগুলো স্নেহেরই অভিব্যক্তি মনে কোরো। যাকে মানুষ বেশী ভালো বাসে দুঃখে শোকে বেদনা অসহ্য হলে তারই ওপর বেশী অত্যাচার করে। তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছি, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব। আমি এখন চল্‌লাম, আবার শিগ্‌গির আস্‌ব। অরুণ এখন তোমার কাছেই না হয় থাক কিছুদিন।

আভা এইবার বাবার সঙ্গে কথা বলিল—না, অরুণের থেকে কাজ নেই, তুমি ওকে নিয়ে যাও।

দিদির বিষণ্ন গম্ভীর নির্ব্বাক মূর্ত্তি দেখিয়া ও দিদির শাশুড়ীর নিরেট কঠোর মুখে কর্কশ তিরস্কার শুনিয়া অরুণ বেচারা ভয় পাইয়া গিয়াছিল, সেও তাড়াতাড়ি বাবার হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—আমি থাক্‌ব না বাবা, তোমার সঙ্গে যাব।

দ্বারকেশ্বর বলিলেন—তোমাকে আর বেশী কি বল্‌ব মা; সাবধানে থেকো; কোনো দুঃখকেই বড কোরে দেখো না; সমস্ত সুখ-দুঃখই ভগবানের আশীর্ব্বাদ বোলে মেনে নিতে পেরো।...

দ্বারকেশ্বর বিগলিত অশ্রুধারা মুছিয়া আর্দ্র রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—তবে আসি মা।

আভা নীরবে বাবাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারকেশ্বর কন্যার মাথায় হাত রাখিয়া মনে মনে তাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অরুণের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আভা শুষ্ক ম্লান মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তার জন্য তার বাবাকে ব্যথিত হইতে দেখিয়াও আভার দুঃখ হইতেছিল না; তার মনের মধ্যে একটা কেমন নির্ম্মম প্রতিহিংসার সুখ বোধ হইতেছিল; তার বাবা যাকে সুপাত্র বিবেচনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তার ঘরে আসিয়া আভা যে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে এখন তার বাবাও যে তার ভাগে বঞ্চিত হইলেন না ইহা তার সান্ত্বনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। এতদিন তার বাবার উপর অভিমানের রাগ ছিল, আজ সেই রাগ সান্ত্বনা পাইয়া শান্ত হইয়া আসিল।

দ্বারকেশ্বর-বাবু বাড়ী হইতে বাহির হইতেই গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। দ্বারকেশ্বর নমস্কার করিয়া বলিলেন--বাবা, চললাম, আভা রইল, দেখো।

গোবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—বৌদিদি যাচ্ছেন না?

—না, বেয়ান যেতে দিলেন না।

—কিন্তু নিয়ে যেতে পার্‌লেই ভালো হত।

—সেই ইচ্ছেই ত ছিল, কিন্তু আভাও ত যেতে চাইলে না একবার। তার শাশুড়ীর এই শোকের সময় তাঁকে একলা ফেলে যেতে চায় না বোধ হয়, আর স্বামীর স্মৃতিতে ঘেরা এই বাড়ী ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে না হওয়াই ত সম্ভব।

গোবিন্দ গম্ভীর হইয়া বিরক্তি চাপিয়া শুধু বলিল—হুঁ!

গোবিন্দকে গম্ভীর হইয়া যাইতে দেখিয়া বিদায় লইবার জন্য দ্বারকেশ্বর অরুণকে বলিলেন—অরু, তোমার গোবিন্দ-বাবুকে প্রণাম করো।

অরুণের কথায় গোবিন্দর হুঁস হইল ; সে প্রণাম করিতে উদ্ধত নত অরুণকে দুই হাতে ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া হাসিয়া বলিল—ভাই অরুণ-বাবু, আমার বাসার কদমগাছটায় ফুল ধর্‌লে আমায় চিঠি লিখো ; 'আমি কল্‌কাতায় গিয়ে কদমফুল দিয়ে একটা রথ তৈরী কোরে দেবো—সেটার ঘোড়া হবে তোমার হরিণটা, তার চূড়ায় বস্‌বে পেখম ধোরে ময়ূরটা, আর কোচমান হবে তুমি, খর্‌গোশ দুটো হবে সহিস ! কেমন হবে ভাই !

অরুণ খুসী হইয়া হাসিতে লাগিল। পুরাতন বন্ধুর সহিত এই চমৎকার প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ জরুরী আলোচনার আবশ্যক থাকিলেও অনেক দিনের অসাক্ষাতের পর লজ্জায় বাধিল। দ্বারকেশ্বর পুত্রকে লইয়া গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া ষ্টেসনের দিকে রওনা হইলেন। গোবিন্দও তাদের সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, সে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আবার একবার বাঁধা বিছানার মোট খুলিয়া রাখিল।

তেরো

কাল আভার প্রথম একাদশী। সন্ধ্যাবেলা হইতেই গোবিন্দ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে রাসমণির বাড়ীতে আসিয়া দেখিল রাসমণি আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া গুনগুন শব্দ করিয়া কাঁদিতেছেন আর আভা রান্নাঘরে পরোটা ভাজিতেছে। তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া গোবিন্দ বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

আভার বিকাল-বেলা হইতেই খুব জ্বর আসিয়াছিল ; বাসুদেবপুরের ম্যালেরিয়া তাকে ধরিয়াছে। সে জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে ধুকিতে ধুকিতে খাবার তৈয়ারি করিল। আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া সমস্ত ঢাকিয়া রাখিয়া সেই রান্নাঘরেই গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল। দশমীর

রাত্রে তার শাশুড়ী একঘুমের পর বারোটা একটা রাত্রির সময় জলখাবার খাইয়া থাকেন; আভাকেই উঠিয়া খাবার দিতে হয়। আজ ত সেও শাশুড়ীর সঙ্গী, কাল তারও প্রথম একাদশী। তাই আভা ঘরে শুইতে না গিয়া রান্নাঘরের মেঝেতেই উনুনের কাছ ঘেঁসিয়া শুইয়া পড়িল, তার ভয়ানক কম্প হইতেছিল। সৌরভী খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে যাইবার সময় একবার ডাকিয়া বলিয়া গেল—'বৌমা, আমি শুতে যেছি গো।' কিন্তু আভার কোনো উত্তর সে পাইল না।

রাসমণি কাঁদিতে কাঁদিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। এক ঘুমের পর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন আভার বিছানায় আভা নাই, সৌরভী শুইয়া ঘুমাইতেছে। রাসমণি ডাকিলেন—বৌমা।

কোনো জবাব না পাইয়া ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রান্নাঘরে প্রদীপটা নিবু-নিবু হইয়া জলিতেছে। রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌমা, খাবার করা কি এখনো হয়নি?

আভার কোনো জবাব নাই। রাসমণি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ লা বড়মানুষের বেটী! কানের মাথা খেয়েছ কি? বল্লে কথা গেরাহ্যি হয় না কেন? এত রাত পর্য্যন্ত পিদিমের তেল পোড়াচ্ছ?

তখনো আভার কোনো সাড়া না পাইয়া রাসমণি রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন আভা এলোমেলো হইয়া শুইয়া আছে; তার আঁচলটা কখন উনুনে গিয়া পড়িয়াছিল, তাহা পুড়িয়া পিঠের কাপড় পর্য্যন্ত খানিকটা পুড়িয়া গেছে; বোধ হয় পিঠে তাত লাগায় আভা গড়াগড়ি দেওয়াতে নিবিয়া গেছে। রাসমণি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন—ভ্যালা ঘুম পেয়েছিলি লা! এই সেদিন এমন সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল, তবু পোড়া চোখের ঘুম ঘুচ্‌ল না! আগুন লেগে আধখানা কাপড় পুড়ে

গেল তবু হুঁস নেই! ওলো ও গতরখাকী, তুমি ত এখনো আমার জোগুর কাছে যাওনি যে, এত ডাকা-হাঁকাতেও ঘুম ভাঙে না!

আভা কাতর কণ্ঠে "মাঃ!" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

রাসমণির ইহা অসহ্য বোধ হইল। তিনি বেগে আগাইয়া গিয়া আভাকে পা দিয়া জোরে জোরে দুতিনটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন—এখন নিদ্রে ত্যাগ কোরে উঠে গেলো। আমার বাছাকে গিলেছ, কাল যে আর জলবিন্দুও গিলতে পাবে না!

তবুও আভার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না, সে শুধু একবার কাতর স্বরে শব্দ করিল—উঃ!

রাসমণি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—না উঠিস্, মর্‌গে যা; কাল মজাটা টের পাবি।

তিনি আপনার খাবার বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিলেন।

খাইয়া উঠিয়া রাসমণি এঁটো হাতেই আর-একবার আভাকে পা দিয়া দুচারটা ঠেলা দিলেন। তাতেও তার চেতনার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া তিনি প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

ভোরে উঠিয়া সৌরভী রান্নাঘর মুক্ত করিতে আসিয়া দেখিল আভা আলুথালু হইয়া পড়িয়া আছে, তার গায়ের কাপড় পুড়িয়া গেছে। সৌরভী বলিয়া উঠিল—ওমা বৌমা, একি কাণ্ড গো? সারারাত এই খেনে পড়ে রয়েছ? দশুমীর রেতে একটু জলও মুখে দ্যাওনি—আজ যে তোমার পেরথম মরণ! ওঠো ওঠো, এখনো ঘোর-ঘোর আছে, একটু কিছু মুখে দেবে, ওঠো।

আভার কোনো সাড়া না পাইয়া সৌরভী তার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়াই দেখিল তার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। সৌরভী

কাতর হইয়া বলিয়া উঠিল—আহা বাছারে! জ্বরে দিশপাশ নেই। ওঠো, মুখে জল দিয়ে বিছানায় গিয়ে শোও গা।

আভা কোনোই জবাব গ্যায় না দেখিয়া সৌরভী বুঝিল আভা জ্বরে একেবারে অজ্ঞান অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। সে একবার তাকে তুলিবার চেষ্টা করিল, পারিল না। সৌরভী তার মা-ঠাকৃরুণকে ডাকিতে সাহস করিল না, কারণ তার মা-ঠাকৃরুণ আভার উপর যে কতখানি সকরুণ তাহা সে জানিত। সে মনে করিল এখন বাইরের ঝাঁটপাট করি, বেলা হইলে তখন মা-ঠাকৃরুণ উঠিলে ধরাধরি করিয়া আভাকে ঘরে শোয়াইয়া রান্নাঘর মুক্ত করিলেই হইবে। সৌরভী সদর দরজা খুলিয়া চৌকাঠে জল দিতেছে, দেখিল গোবিন্দ ঘাট হইতে হাত মুখ ধুইয়া গাড়ু হাতে করিয়া বাড়ীতে ফিরিতেছে। সৌরভীর কেমন মনে হইল এই লোকটিকে আভার খবরটা দিতে পারিলে এ সুখী হইবে। সৌরভী বলিল—ছোট দাদাবাবু, আমাদের বৌমার ত বড় জ্বর, সারা রাত রান্নাঘরেই অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। দশুমীর রেতে একটি ফোঁটা জলও মুখে পড়েনি! আর আজকে ওর পেব্‌থম একাদশী!

গোবিন্দ গাড়ু সেইখানেই নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি রাসমণির রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। আভার কাপড় পুড়িয়া গিয়া তার সুগৌর সুন্দর দেহখানি অনেকটা অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল। গোবিন্দ মুহূর্ত্তমাত্র থম্‌কিয়া দাঁড়াইল; সঙ্কোচ ঠেলিয়া সরাইয়া আভার কাছে গিয়া যতটা সম্ভব তার গা ঢাকিয়া দিল, তারপর তার কপালে হাত দিল। কপালে ঠাণ্ডা করস্পর্শ পাইয়া আভা আরাম অনুভব করিয়া বলিল—"আঃ!" সে একবার চোখ মেলিয়া চাহিল; গোবিন্দকে দেখিয়া সে আজ তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টানিয়া সঙ্কুচিত হইল না। গোবিন্দ দেখিল আভার চোখ দুটি লাল টক্‌টক্‌ করিতেছে; কপাল প্রতপ্ত; খুব জ্বর

হইয়াছে; আভার চেতনা অভিভূত ও জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সে তার বলিষ্ঠ দুই বাহু দিয়া ছোট ছেলের মতন আভাকে অনায়াসে তার প্রশস্ত বক্ষের উপর তুলিয়া ধরিয়া তাকে শুইবার ঘরে লইয়া গিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। তারপর সৌরভীকে ডাকিয়া বলিল—আমায় খুব ঠাণ্ডা জল আর একটু ফর্‌সা নেকড়া দিয়ে যা আর মার কাছ থেকে ও-ডি-কলমের শিশিটা চেয়ে আন্।

গোবিন্দ আভার শিয়রে বসিয়া তার কপালে মাথায় জল ও-ডি-কলম দিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রাসমণি মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন—গবা, তোর আর আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। বিধবা মানুষের মাথায় আর গন্ধ বাস দিতে হবে না, থো।

গোবিন্দ বলিল—এ গন্ধ বাস নয় জেঠিমা, এ ওষুধ। মাথা গরম হয়েছে, ঠাণ্ডা না করলে বিকারে দাঁড়াবে যে।

রাসমণি বলিলেন—বিকার হয়ে ও নিপাত গেলেই ত মঙ্গল।

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া গোবিন্দ আভার মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল।

আজ রাসমণির বাড়ীতে উনুন জলে নাই, গোবিন্দর বাড়ীতেও না; গোবিন্দও একাদশীর দিন সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রে আহার করে। সুতরাং গোবিন্দর মা'ও আসিয়া আভার কাছে সকাল হইতেই বসিয়া আছেন।

দুপুর বেলা আষাঢ় মাসের রোদের তাতে আর জ্বরের তাতে ব্যাকুল হইয়া আভা রক্ত-রাঙা চোখ দুটি একবার মেলিয়া কাতর স্বরে বলিল—একটু জল খাব।

রাসমণি অমনি বলিয়া উঠিলেন—আমার ছেলেকে খেয়েছ মনে নেই, আজকে জল খাবে কোত্থেকে?

আভা এ তিরস্কার ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; সে শুষ্ক ওষ্ঠ চাটিয়া আবার কাতর স্বরে বলিল—একটু জল।

গোবিন্দ ঘটী হইতে একটু জল আভার মুখে ঢালিয়া দিল। অমনি রাসমণি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—গবা, সব্বনাশ কর্‌লি? বিধবার জাত নষ্ট কর্‌লি! তুই খিষ্টান হয়েছিস্ বোলে আমরা ত খিষ্টান হইনি।

গোবিন্দ চুপ করিয়া আভার মাথায় হাওয়া করিতে লাগিল; সে যে-কাজ করিয়াছে তাতে সে তিরস্কার পাইবে জানিয়াই করিয়াছে।

রাসমণি গোবিন্দকে ছাড়িয়া কমলাকে ধরিলেন—আচ্ছা বলি ছোট বৌ, তুমিও কি বেটার সঙ্গে বয়ে গেছ নাকি! তুমি কোন্ আক্কেলে আজকে পের্‌থম একাদশী ভঙ্গ কর্‌তে চোখ মেলে চেয়ে দেখ্‌লে?

কমলা চুপ করিয়া রহিলেন। রাসমণি বলিতে লাগিলেন—তোমাদের বাড়ী বয়ে অত আত্তি জানাতে হবে না। তোমরা বেরোও আমার বাড়ী থেকে; এ বাড়ীতে পা দিলে আমি সৈরবীকে দিয়ে আঁস্তাকুড়-ঝাঁটানো ঝাঁটা-পেটা করাব তোমাদের।

গোবিন্দ ও কমলা চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। আভা আবার জল চাহিল, গোবিন্দ আভার মুখে জল ঢালিয়া দিল।

রাসমণি উঠিয়া আসিয়া ঘটীটা টানিয়া উঠানে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। চীৎকার করিয়া উঠিলেন—আমার জোগু মরেছে বোলে তোদের ভারী দেমাক হয়েছে, না?

গোবিন্দ ও কমলা তবু নির্ব্বাক।

তাহাদিগকে তাড়াইতে না পারিয়া রাসমণি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পাড়ায় সকলকে খবর দিতে গেলেন।

রাসমণির মুখে খবর পাইয়া পাড়ার মেয়েরা আভার উপর গোবিন্দর এতখানি টান হইবার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে যখন

কৌতুক দেখিবার জন্য আভার রোগশয্যার চারিধারে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল তখন আভা বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতেছে। তাহা দেখিয়া সকলে একবাক্যে বলিল উহাকে ডাইনে খাইয়াছে। রাসমণি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ডাইনকেও আবার ডাইনে খায়?

একজন বিজ্ঞ বলিলেন—কাগে কাগের মাংস খায় না বটে, কিন্তু ডাইনে ডাইনকে খায়।

রাসমণি বলিলেন—একবার তা হলে ও-বাড়ীর বড় মুখ্যেকে খবর দি. তিনি একবার দেখুন।

সংবাদ পাইয়া গোকুল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি লোকটি খুব কালো; বেঁটেখাটো.গোলগাল, নাদুস্নুদুস্; তাঁর নেড়া মাথায় টিকি, নাকের ডগা হইতে কপাল ব্যাপিয়া দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনাম আর চরণের ছাপ, গলায় তেকণ্ঠী মালা, পরণে কেঠে কাপড়। তিনি আসিয়াই গোবিন্দকে বলিলেন—হ্যাঁরে গবা, তোর কি সকল তাতে গোঁয়ার্ত্তুমি, বিধবার পের্থম একাদশী পণ্ড কর্লে কি হয় জানিস্? চুরাশি জন্ম তাকে কৃমি হয়ে থাক্তে হয়, আর যে পণ্ড করে সেও চুরাশি জন্ম চাতক হয়ে আকাশে ফটীক-জল ফটীক-জল কোরে ডেকে মরে।

গোবিন্দ জানিত তাদের গ্রামের চাঁই এই বুড়াটি ভেকে পরম বিজ্ঞ হইলেও নিরেট মূর্খ; তিনি মূর্খ লোকদের নিজের মনগড়া শাস্ত্রবিধি শুনাইয়া আপনার বিজ্ঞতার পসার বজায় রাখিতেন; অবস্থা অনুসারে শাস্ত্রের ব্যবস্থা চটপট বানাইয়া বলার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাই তাঁর শাসন শুনিয়া গোবিন্দ বলিল—সেও ভাল দাদা-মশায়, কৃমি-দের শ্বশুর-শাশুড়ীরা মানুষের মতন কসাই নয়, আর চাতক বেচারাকেও তৃষিত ধরণীর মুখে বৃষ্টিধারা নামিয়ে দেওয়ার জন্যে কারো কাছে গালা-গালি খেতে হয় না।

গোবিন্দর কথা শুনিয়া রাসমণির রসনা কটু কথার আস্বাদনে রসিয়া উঠিয়া ছটফট করিতে লাগিল. কিন্তু সম্মুখে শ্বশুর থাকাতে তিনি মুখ ফুটাইবার সুবিধা করিতে পারিলেন না। গোকুল গোবিন্দকে বেশী ঘাঁটাইতে ভয় পাইতেন বলিয়াও বটে আর গোবিন্দর সাধুভাষা ভালো বুঝিতে পারিলেন না বলিয়াও বটে, তিনি যেন একমনে আভার নাড়ী দেখিতে ব্যস্ত আছেন এম্‌নি ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ বাঁকাইয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—নাড়ী ত বড়ই বেতর। ডাইনে খাওয়াই বোধ হচ্ছে। একবার রমজানকে দেখালে ঠিক বোঝা যায়।

রমজান সেই গাঁয়ের ওঝা। পাড়ার ছেলেরা ডাইনের মজা দেখিবে বলিয়া রমজানকে ডাকিতে ছুটিল। রমজান বলিল সন্ধ্যার সময় সে আসিবে।

সন্ধ্যার সময় রমজান আসিল। আভাকে দেখিয়া রমজান গম্ভীর মুখে বলিল—ডাইনের দৃষ্টি বলেই ত মনে নিচ্ছে। পেরথম সন্ধ্যে জ্বালার পিদিমটা আর এক ঘটী জল এনে দেন।

সৌরভী প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। রমজান বলিল—পিদিম খালি মাটিতে রাখ্‌তে নেই. এই খ্যাড় গাছ পেতে রাখো।

রমজান এক টুক্‌রা খড় ফেলিয়া দিল, তার উপর সৌরভী প্রদীপটা রাখিল। তারপর একটা কাঁসার চুম্‌কী ঘটীতে করিয়া জল ও একটা লোহা আনিয়া দিল।

রমজান একগাছা খড় হইতে চার আঙুল মাপিয়া একটা টুক্‌রা কাটিয়া লইয়া বলিল—এই খ্যাড় যদি বেড়ে যায় তবেই নিচ্চয় ডাইনের দৃষ্টি।

সে খড় টুক্‌রা জলের মধ্যে ডুবাইয়া নাড়িতে নাড়িতে বিড়বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া খানিক পরে খড় তুলিয়া নিজেই মাপিয়া বলিল খড় বাড়িয়া

গিয়াছে। সুতরাং ডাইনে খাওয়া সম্বন্ধে এক গোবিন্দ ছাড়া কাহারও আর সন্দেহ রহিল না। রমজান বলিল—এই জলপড়া ওনাকে একটু খাইয়ে দেন, তাহলেই বোঝা যাবে কেমন ডাইন।

রাসমণি ঘটী আনিয়া আভার মুখের কাছে ধরিলেন। আভা পিপাসায় এতক্ষণ ছটফট করিতেছিল, এখন দুই হাতে ঘটী ধরিয়া এক চুমুকে সবটুকু জল পান করিয়া 'আঃ' বলিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িল।

রমজান তাহা দেখিয়া বলিল—এ খুব নরম ডাইন; এই জলপড়াতেই নজর কেটে যাবে হয়ত।

গোবিন্দ দালানের এক কোণে একটা জলের কলসী দেখাইয়া রমজানকে বলিল—রমজান, ঐ কলসী থেকে আমায় এক ঘটী জল গড়িয়ে দাও ত; আজ সমস্ত দিন একাদশীর উপোষ কোরে ভারী তেষ্টা পেয়েছে, আমি খাব।

সকলে ত অবাক। রমজান পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া সকলকার মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিল—এজ্ঞে আমার হাতের জল খাবেন এজ্ঞে!

গোকুল বলিলেন—তুই কি ক্ষেপেছিস গোবিন্দ?

গোবিন্দ গম্ভীর ভাবেই বলিল—ক্ষেপার লক্ষণটা কিসে দেখ্‌লেন?

—রমজানের হাতের জল খেতে চাচ্ছিস।

—কেন দোষ কি? এই ত আমার বৌদিদিকে আপনারা খাওয়ালেন।

রাসমণি আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হইয়া চাপা গলায় বলিলেন—তোর কি এটুকু আক্কেলও নেই গবা? ও যে জল-পড়া।

গোবিন্দ বলিল—না হয় রমজান জলের ওপর একটু মন্তর আওড়েই দেবে; তা হলে ত আমি খেতে পারি।

গোকুল বেগতিক দেখিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—আরে গোঁয়ার

ছোঁড়া, ঐ যে জলপড়া বৌ খেলে, ও ত ও খেলে না, যে ডাইনী ওর ওপর ভর কোরে আছে সে খেলে।

রংজ্ঞানও যেন এই ব্যাখ্যায় একটা অপকর্ম্মের কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—ওতে ত ওনার জাত যাবার নয়, ওতে জাত গেল যে ডাইনী ওনাকে পেয়ে আছে তানার !

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—এ যেন দাদা-মশায় সেই আপনার সোডার জল খাওয়ার ব্যাখ্যা। মুসলমানে সোডার বোতল ছুঁলে দোষ নেই, গেলাসে কোরে কেবল জল এনে দিলেই একেবারে মহাভারত অশুদ্ধ !

গোকুল এইবার জগন্নাথের বিবাহ দিতে কলিকাতায় গিয়া অম্বল হওয়াতে দোকানে গিয়া বোতল হইতে আল্‌গোছে সোডার জল খাইয়াছিলেন, দোকানী ছিল মুসলমান। গোকুলের খাওয়া হইয়া গেলে গোবিন্দ তাঁকে দোকানীর জাতি স্মরণ করাইয়া দিয়া নিজে তার কাছে এক গেলাস কেবল জল খাইতে চাহিলে গোকুল মহাক্রুদ্ধ হইয়া আপত্তি করেন। গোবিন্দ যে তাঁর যুক্তির অসারতা দেখাইয়া তখন তাঁকে কিরূপ জব্দ করিয়াছিল, এখন তারই ইঙ্গিত করিল। সেই অজানা লুকানো কথাটা পাছে এত লোকের কাছে গোবিন্দ ফাঁস করিয়া ফেলে এই ভয়ে গোকুল তাড়াতাড়ি বলিলেন—তুই ত আমাদের গ্রাহের মধ্যেই আনিস্‌নে, সকল তাতেই তোর ঠাট্টা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ! ঠাকুর বাড়ীতে আজ একটি সাধু এসেছেন—মহাপুরুষ ! একবার তাঁর সঙ্গে তর্ক করবি চল্ দেখি, তুই কত বড় তার্কিক।

সমবেত সকল স্ত্রীলোকই সন্তুষ্ট হইয়া গোবিন্দর মুখের দিকে চাহিল—এবার নিশ্চয়ই গোবিন্দকে পরাজয় স্বীকার করিয়া নিরুত্তর থাকিতে হইবে।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—কোন্ বেটা বদমায়েস, খুন কি চুরিডাকাতি কোরে ছাই মেখে জটা রেখে বুজরুকী কোরে বেড়াচ্ছে……

গোকুল জিভ কাটিয়া কানে হাত দিয়া বলিলেন—আরে রাম রাম! তিনি মহাপুরুষ! ছাইও মাখেন নি, জটাও রাখেন নি, গেরুয়াও পরেন নি, অথচ তিনি সন্ন্যাসী!

এমন একটি নূতন ধরণের সন্ন্যাসীর সংবাদ পাইয়া গোবিন্দ একটু কৌতূহলী হইয়া বলিল—আচ্ছা তাঁকে একবার নেড়েচেড়ে বাজিয়ে দেখ্‌ব তা হলে। আজকে ত আর বৌদিদিকে ছেড়ে যেতে পারব না, কাল সকালে যাব।

গোকুল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—রমজানের জলপড়া পড়েছে, আর কিছু ভয় নেই। ঐ ত বেশ ঘুমুচ্ছে।

আভা এক ঘটী জল খাইয়া শান্ত শীতল হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকল লোক তাহা দেখিয়া রমজানের জবর জলপড়ার মাহাত্ম্য বলাবলি করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কেবল রহিল গোবিন্দ ও কমলা।

আভার সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বর; অত্যন্ত বেগে প্রবল জ্বর হইয়াছিল বলিয়া সে প্রথমে অচেতন হইয়া পড়িয়া পরে প্রলাপ বকিয়াছিল। ভোর বেলাই বিজ্বর হইয়া তার চেতনা হইল।

সকালে নিশ্চিন্ত হইয়া গোবিন্দ ঠাকুরবাড়ীতে সন্ন্যাসীকে দেখিতে গেল।

চোদ্দ

বাসুদেবপুর গ্রামে গোকুলচাঁদের মন্দির। একজন সন্ন্যাসী মোহান্ত সেই বিগ্রহের সেবায়েত। এক মোহান্ত পরবর্ত্তী মোহান্তকে নির্ব্বাচন করিয়া যান; সেই পদলাভের প্রত্যাশায় তাঁহার চেলার সংখ্যা অনেক।

এই মোহান্ত বাঙালী। ইনিই আবার এই গ্রামের লোকেদের দীক্ষাগুরু; তিনি বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন; সুতরাং গ্রামের লোকেরা সবাই বৈষ্ণব, এবং অনেকে আবার গুরুগিরি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া গোসাঁই নামে পরিচিত। গোকুলচাঁদের মন্দিরটি অতি পুরাতন ও প্রকাণ্ড; প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যরীতিতে গঠিত সুগম্ভীর ভীমমূর্ত্তি। মন্দিরের সম্মুখে প্রকাণ্ড বিস্তৃত নাটমন্দির—সারি সারি ছড়-কাটা পল-তোলা থামের মাথায় ছাদের চন্দ্রাতপ, চারিপাশ খোলা; নাটমন্দিরের মাঝখানে ব্যাসবেদী; তার এক পাশে গোকুলচাঁদের দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, ঝুলনমঞ্চ; অপর পাশে অতিথিশালা, মোহান্তের প্রাসাদ। এই মন্দিরে যে-কেহ ত্রি-রাত্রি অতিথি হইয়া থাকিতে পারে, এবং তার সমস্ত আহার জোগাইতে সেবায়েত বাধ্য। গঙ্গাসাগরের মেলা উপলক্ষ্যে মাঘ মাসে ও শ্রীক্ষেত্রের উৎসব উপলক্ষ্যে রথ ও দোলের সময় এখানে অনেক তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হয়, তারা যাতায়াতের পথে এখানে আতিথ্য স্বীকার করিয়া বিশ্রাম করিয়া যায়। সুতরাং এই মন্দিরে কত রকমের সন্ন্যাসীই আসিতে দেখা যায়।

গোবিন্দ মনে করিয়া গেল সেইরূপ একজন কেহ হইবে। মন্দিরের নিকটে গিয়াই গোবিন্দ শুনিল কে একজন এস্‌রাজ বাজাইয়া অতি সুমধুর কণ্ঠে গানের কথায় প্রাণের ভাব মিলাইয়া গাহিতেছে—

"আমি মেল্‌ব না নয়ন, যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে।
তোরা গন্ধে আমায় বল্, বল্ রে শ্রবণে—
সে এসেছে, সে এসেছে পূরব-গগনে॥
তোরা বল্ গো ঘ্রাণে বল্, বল্ রে শ্রবণে,
তোর বন্ধু এসেছে, এসেছে সে পূরব-গগনে॥

কমল মেলে কি আঁখি
তারে সঙ্গে না দেখি,
তারে অরুণ এসে দিল দোলা রাতের শয়নে ।
আমি মেল্‌ব না নয়ন, যদি না দেখি তায় প্রথম চাওনে ।।

গোবিন্দ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এই গান শুনিল। এই সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া গোবিন্দর মন স্নিগ্ধ ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে যে বিদ্রোহ ও অবজ্ঞা মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত যুদ্ধ করিবে বলিয়া আসিয়াছিল তাহা অনেকটা দূর হইয়া গেল। তবু সে নম্র না হইয়া লোকটাকে ভালো করিয়া জানিবার জন্য উদ্ধত ভাবেই নাটমন্দিরে গিয়া উঠিল।

গোবিন্দ গিয়া দেখিল একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ দীর্ঘ আকারের সুশ্রী লোক কোলের উপর জোড়হাত রাখিয়া বসিয়া আছে, লোকটির বয়স বছর ত্রিশ-বত্রিশ মাত্র হইবে; মুখখানিতে তার এমন একটি মাধুর্য্য আর বুদ্ধির উজ্জ্বলতা আছে যে দেখিলেই চিত্ত আকৃষ্ট হয়। তার চোখ দুটিও বেশ বড় বড়, টানা টানা উজ্জ্বল। তার দাড়ি গোঁপ কামানো, মাথার চুল খাটো ও সমান করিয়া কাটা। পরণে তার একখানা শাদা থান, গায়েও একখানা থানের মোটা চাদর। এত সকালেই গ্রামের বহু লোক এই সন্ন্যাসীর চারিদিকে জড়ো হইয়া তার সুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিতেছে, এবং যে আসিতেছে সেই তাকে প্রণাম করিতেছে ও কেহ কেহ বা পায়ের ধূলাও লইতেছে।

গোবিন্দ গিয়া একপাশে বসিল। প্রণাম করিল না। তার চলা ও বসার ভঙ্গীতে এমন একটা চেষ্টাকৃত ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাইতেছিল যে সন্ন্যাসী তাহা দেখিয়া একটু হাসিল। গোকুল গোবিন্দকে বলিলেন—গোবিন্দ, প্রভুকে প্রণাম কর্। গুরুজনকে প্রণাম না কর্‌লে অকল্যাণ হয়।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—আগে উনি প্রমাণ করুন যে উনি প্রণম্য, উনি গুরু হবার যোগ্য, তবে আপনিই মাথা প্রণত হবে, কাউকে বল্‌তে হবে না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—ঠিক বলেছ ভাই! সবাই ত আমাকে শুধু সন্ন্যাসী জেনেই প্রণাম করছে, একা তুমিই আমাকে আরো বেশী যাচাই করতে চাইলে। যদি এখানে দুদিন থাকি তুমি আমার দর কষে নিতে পারবে। বাউলদের একটি গান আছে—

"গুরু বোলে কারে প্রণাম কর্‌'ব মন?
তোর যে অতিথ গুরু, পথিক গুরু, গুরু সর্ব্বজন।
গুরু যে তোর বরণমালা, গুরু যে তোর মরণজ্বালা.
গুরু যে তোর হিয়ার ব্যথা ঝরায় দুনয়ন।"

সন্ন্যাসীর গান শুনিয়া গোবিন্দ হাসিতে লাগিল। তাকে নিরুত্তর দেখিয়া গোকুল খুসী হইয়া বলিলেন—প্রভু, ওর ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন। ও একটা কাঠ-গোঁয়ার। ও বলে কিনা যে আপনি হয়ত খুন কি চুরি-ডাকাতি কোরে ফেরার হয়ে বেড়াচ্ছেন।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিল—উনি ঠিক বলেছেন, মানুষ ত ফেরারী আসামীই। বাউলের গানে আছে।—

আমারই সাঁই ফিরছে সদাই আমারই সন্ধানে;
পাছে আমার পায়রে নাগাল চাই না আমি তার পানে।
আমার মনে যায় আর আসে;—
আঁধার কোরে রাখি যে মন, তাই পায় না দিশা সে;
(আমার) মলিন মনের ধূলায় তারি পায়ের চিহ্ন সবখানে,
এড়ানো দায়, হয় কি উপায়, অলখ ডুরি প্রাণ টানে॥

এড়ানোর জো নেই ভাই, ধরা একদিন সকলকেই পড়তে হবে, তাঁর বিচারের আদালতে সবাইকেই দাঁড়াতে হবে।—

"পথ কোরে দে, পথ কোরে দে, পথ কোরে দে হৃদয় চিরে ;
পিছনে তোর আসছে যে ফুল মুকুল তুই আর থাক্‌বি কিরে ?"

গোবিন্দর মন সন্ন্যাসীর গানের কবিত্বময় কথায় আর রসপূর্ণ ভাবে আর তার সঙ্গে সুকণ্ঠের সম্মিলনে মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে দেখিল এই লোকটি বশ করিবার বিশেষ কিছু মন্ত্র জানে, তার মতন বিদ্রোহীর মনও ঐ লোকটির পায়ের ধূলা লইবার জন্য কেমন ছটফট করিতেছে। সে জোর করিয়া সেখান থেকে উঠিয়া পড়িল। সন্ন্যাসী গোবিন্দকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল—আমি আজকের দিনটাও আছি, আবার দেখা হবে ; কষ্টিপাথরে খাঁটি-মেকির দাগ কষা চল্‌বে।

গোকুল হাত জোড় করিয়া বলিলেন—আপনি কালকেই চলে যেতে পাবেন না ; এখন কিছু দিন এখানেই আপনাকে থাক্‌তে হবে প্রভু ; অনেক ভাগ্যবলে পুণ্যফলে আপনার দেখা পেয়েছি, আপনাকে আমরা শিগ্‌গির ছাড়্‌ব না।

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন—আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার এক জায়গায় আড্ডা গেড়ে বেশীদিন থাকতে নেই, মমতা পড়ে যাবার ভয় আছে কিনা।

গোবিন্দকে সন্ন্যাসী তুমি বলিয়া কথা বলিয়াছিল, গোবিন্দ তাতে বিরক্ত হইয়াছিল ; সেই বিরক্তি শোধ দিবার জন্য সে সন্ন্যাসীকে জোর করিয়া তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল—তুমি কি-রকম সন্ন্যাসী হে ? তোমার গেরুয়া কাপড় কই ? ধোয়া কাপড় পোরে একেবারে বাবু-সন্ন্যাসী ?

সন্ন্যাসী গোবিন্দর উগ্র উদ্ধত ভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া গাহিলেন।—

"ভিতরে রস না হইলে কি বাইরে কভু রং ধরে?
ফলে কি অমৃত নামে বাইরে তারে রং কোরে?"

গোবিন্দ নিজের মধ্যে কেমন একটা পরাভব অনুভব করিতেছিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইল না, ঘাড় সোজা করিয়া জোরে জোরে পা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

পনেরো

গোবিন্দ ক্রমশঃ দেখিল যে সন্ন্যাসীটি পণ্ডিত বটে, বহু ভাষা জানে, বিশেষতঃ নানা দেশের ভক্তিশাস্ত্রের কথা বেশ জানা আছে—য়ুরোপীয় মিষ্টিক সম্প্রদায়, পারস্যের সুফী সম্প্রদায়, চীনের লোৎসু সম্প্রদায় ও ভারতের বাউল কবীরপন্থী দাদূপন্থী নানকপন্থী প্রভৃতিদের ভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে তার পুঁজি একরকম অফুরন্ত। সে তার সুশ্রী প্রিয়দর্শন চেহারায় সুকণ্ঠে ও রসমধুর ভক্তিকথায় গ্রামের লোকের মন এমন হরণ করিল যে সবাই তাকে গুরুর ন্যায় অবতারের ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ছোট ছোট বৌ-ঝিরাও তার নিকট যখন-তখন যাইয়া বসিয়া থাকে ও তার সহিত কথা কহে, কিন্তু তাতে কারো মনে আপত্তি উঠে না। এমন কি বুড়া মোহান্ত পর্য্যন্ত তাকে হিংসা করা দূরে থাকুক, তার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহ ও যত্ন করিতেছে। গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—লোকটা খুব পাকা সয়তান!

সন্ন্যাসী গ্রামের লোকের অনুনয় ও মোহান্তের অনুরোধে সেইখানেই থাকিয়া গেছে; সে গোকুলচাঁদের প্রসাদ পায় আর সকালে বিকালে ঠাকুরবাড়ীর নাটমন্দিরের চাঁদনীতে বসিয়া হয় বাউলের গান করে নয়

ভক্তিরসতত্ব বর্ণনা করে। সন্ন্যাসীর শ্রোতার সংখ্যা রোজ রোজ বাড়িয়াই চলিয়াছে, আশেপাশের চারপাঁচখানা গ্রামের লোক এই অসাধারণ সন্ন্যাসীর বচনামৃত শুনিবার জন্য আসিয়া জড়ো হয়।

সন্ন্যাসী শুধু কথা বলিয়াই লোকের মন হরণ করিতেছিল না, কর্ম্মের দ্বারাও সে সকলকার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছিল। সে গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিয়া প্রত্যেক গ্রামে ছেলে ও মেয়েদের পড়িবার পাঠশালা করিয়াছে, প্রত্যেক পাঠশালায় তিন জন করিয়া শিক্ষক তিনবার করিয়া ছাত্রদের পড়ায়; ছাত্রদের যার যখন সুবিধা সে তখন আসে, সকাল দুপুর সন্ধ্যা তিনবার পাঠশালা বসে। বয়স্ক চাষাভুষারাও ছাত্র, বয়স্কা মেয়েরাও ছাত্রী। সন্ন্যাসীর অনুরোধে ও দৃষ্টান্তে প্রত্যেক গ্রামেই বিনা বেতনের শিক্ষক অনেক পাওয়া গেছে; সকলের মনেই উৎসাহের আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে। সন্ন্যাসী নিজেও পালা করিয়া প্রত্যেক পাঠশালাতেই সকাল দুপুর সন্ধ্যার প্রত্যেক দলের ছেলে-মেয়েদের পড়াইয়া থাকে। যেখানে আগে ছেলেমেয়েরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া অকাজে কুকাজে রত থাকিত, সেখানকার আবহাওয়াই যেন বদ্‌লাইয়া গেল; চারিদিকে লেখাপড়ার চর্চ্চা, সকলের মনে ধর্ম্মভাব, মুখে শুচি বাক্য।

সন্ন্যাসীর একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের বাক্‌সও ছিল; সেইটা ঘাড়ে করিয়া সে গ্রামে গ্রামে পীড়িতের ঘরে ঘরে ঘুরে। যেখানে পীড়িত সেখানে সন্ন্যাসীর ডাক পড়ে—শুধু চিকিৎসার জন্য নয়, এমন সেবা-নিপুণ মমতাময় মিষ্টস্বভাব লোকের আবির্ভাবেই রোগী আপনাকে সুস্থ মনে করে। সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলা হাতের স্পর্শ পাওয়াই যথেষ্ট বিবেচিত হয়, তাঁর চরণামৃতই পান করিবার বিশেষ আগ্রহ, তিনি বাক্‌স খুলিয়া এক ফোঁটা ঔষধ দিলেন বা না দিলেন তার জন্য কারো বিশেষ আগ্রহ নাই।

গ্রামের বিবাদে-বিসম্বাদেও সন্ন্যাসীই সালিস, তাঁর মীমাংসাই সকলের শিরোধার্য্য। আগে লোকে কথায় কথায় মহকুমায় ছুটিত, এখন বেখরচায় নি-খিরখিচে সকল দ্বন্দ্বের সমাধান হয়।

আভার অসুখ সারিয়া গেলে রাসমণি বলিলেন—বৌমা, চলো সন্ন্যাসী-ঠাকুরের কথা শুনিগে।

আভা গ্রামে আসা অবধি বড় একটা কোথাও বাহির হইত না; বিধবা হওয়ার পরে যখন তার শাশুড়ীর কথায় সায় দিয়া গ্রামের প্রায় সকলেই তাকে স্বামী-হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিল, তখন হইতে সে আর কাকেও মুখ দেখাইতেও লজ্জা বোধ করিত। সুতরাং শাশুড়ীর প্রস্তাব শুনিয়া সে মিনতি করিয়া বলিল—না মা, আমি কোথাও যাব না।

রাসমণি তাকে ভেঙাইয়া বলিয়া উঠিলেন—তা যাবে কেন? ধর্ম্মকথা শুন্‌লে যে পুণ্যি হবে। না না, একলা তোমার বাড়ীতে থাকা চল্‌বে না, আমি যাচ্ছি, তুমিও চলো।

আভার উপর গোবিন্দর টান দেখিয়া রাসমণি মনে মনে অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁরা গোবিন্দর সঙ্গে কথা বলাইতে আভাকে কত পীড়াপীড়ি করিয়াছেন, আভা তাঁদের অনুরোধ শোনে নাই বলিয়া কত ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিয়াছেন; কিন্তু এখন রাসমণি দেখিতেছেন আভা যে গোবিন্দর সঙ্গে কথা বলে না, সেটা একটা মস্ত বাঁচোয়া। আভা যখন গোবিন্দর সঙ্গে কথাই বলে না তখন তাকে মুখ ফুটিয়া সাবধান করিবার আবশ্যক না থাকাতেই তাঁর মনের মধ্যে একটা ভয় ও অবিশ্বাস ক্রমশঃই বেশী প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। তাই তিনি সর্ব্বদা আভাকে চোখে চোখে রাখিতেন, গোবিন্দ বাড়ীতে আসিলেই উভয়ের উপর অকারণে উগ্র হইয়া উঠিতেন। আভা তাঁর সঙ্গে

ঠাকুরবাড়ীতে সন্ন্যাসীর কথা শুনিতে যাইতে অস্বীকার করিলে রাজ-মণির মনের মধ্যে ভয় ও অবিশ্বাস ছাঁত করিয়া উঠিল। তিনি বিরক্ত হইয়া জোর করিয়া বলিলেন—তোমাকে যেতে হবে।

সন্ন্যাসীকে দেখিবার বা তার কথা শুনিবার জন্য আভার বিশেষ আগ্রহ ছিল না; সে মনে করিয়াছিল, সাধারণ একটা সন্ন্যাসীর অতি সাধারণ জানা-কথার মধ্যে নূতন কিছু শিক্ষা বা আনন্দ পাইবার সম্ভাবনাই নাই। তার উপর লোকালয়ে তার মুখ দেখাইবার লজ্জা তাকে নিবারণ করিতেছিল। কিন্তু তার শাশুড়ীর জেদে বাধ্য হইয়া বিরক্ত মনে লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া আভা শাশুড়ীর পিছনে পিছনে ঠাকুর-বাড়ীতে গেল।

আভা দূর হইতেই শুনিতে পাইল সন্ন্যাসী অতি সুমিষ্ট মিহি গলায় গান করিতেছে—

ওরে ভাঙ বেড়া তোর, ভাঙ বেড়া তোর, তোর বিহান জেগেছে,
ওগো সকল ফুলের হৃদয়-দ্বারে সুবাস মেগেছে!
ফুলের ঘরে ঘরে বাতাস সুবাস মেগেছে!
তুই কি শুধু হবি বিফল
রুদ্ধ রেখে হৃদয়-দল,
তোর পরাণে লুকানো যে ফল, তাই নিতে হাত পেতেছে,
কোন্ অকূলের অচিন আলোর ঝারা প্রাণে লেগেছে।

আভা ঠাকুরবাড়ীর দালানে উঠিয়াই দেখিল সন্ন্যাসী একেবারেই সাধারণ নয়;—তার চেহারা অসাধারণ প্রদীপ্ত, কণ্ঠস্বর অসাধারণ সুমিষ্ট, গানের পদ অসাধারণ ললিত, ও ভাব অসাধারণ গভীর। আভার মন পুলকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল না-আসিলে বড় ঠকাটাই ঠকিতে হইত। ঠাকুরদালান ভরিয়া অনেক মেয়ে বসিয়া

আছে; রাসমণি গিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া জায়গা করিয়া বসিলেন; কিন্তু আভা অবাক মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল, সে একদৃষ্টে সন্ন্যাসীকে দেখিতেছিল, সন্ন্যাসীর গানটি শুনিতে শুনিতে তার মনে হইতেছিল এ অনুরোধ যেন তারই হৃদয়-দ্বারে হইতেছে; সে ত এত দিন তার হৃদয়-দল রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া বিফল হইয়া আছে, তার হৃদয়ের যে সুবাস তাহা ত সে কারো কাছে মুক্ত করিয়া ধরিতে পারে নাই, যে আলোর ঝারার স্পর্শে মুকুলদল মুক্ত হয় সেই অকূলের অচিন স্পর্শ ত তার হৃদয়ে লাগে নাই। এতকালের কঠিন অবরুদ্ধ তরুণ হৃদয়ের নিষ্ফলতার দুঃখরাশি আভার চক্ষু ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ন্যাসীও গান গাহিতে গাহিতে এই তরুণী রূপসীর অকারণ অশ্রুপাত দেখিয়া মুগ্ধ দ্রব দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তাঁর গান হইতে তাঁর চিত্ত পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ন্যাসীকে অন্যমনস্ক হইতে দেখিয়া সকল পুরুষ শ্রোতার দৃষ্টি সন্ন্যাসীর দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া আভাকে দেখিতে লাগিল। আভার সংজ্ঞা নাই যে তার ঘোম্‌টা খুলিয়া গিয়াছে, তার মুখের দিকে শত শত দৃষ্টি উৎসুক হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। আভার কাছেই কমলা বসিয়া ছিলেন; তিনি তার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বৌমা, বোসো।' আভা চেতনা পাইয়া লজ্জিত হইল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। রাসমণি তাকে তিরস্কার করিবেন মনে করিয়া তার দিকে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু আভার চোখে আজ এই প্রথম জল পড়িতে দেখিয়া তিনি খুসী হইয়া উদ্যত কটু বাক্য সম্বরণ করিলেন।

সেইদিন হইতে আভা বিকালের প্রতীক্ষায় উৎসুক হইয়া থাকিত, কখন্ শাশুড়ী তাকে যাইতে ডাকিবেন ভাবিয়া ব্যস্ত হইত। প্রথম

প্রথম সে নিজের ব্যগ্রতা গোপনই রাখিয়া চলিতেছিল; কিন্তু কয়েক দিন পরে আর তাহা গোপনও থাকিল না—রাসমণির একটু বিলম্ব হইলেই সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করে—'মা, ঠাকুরবাড়ীতে কখন্ যাবেন ?' রাসমণির দেরী থাকিলে সে বলে—"আপনার ত এখনো দেরী আছে, আমি এগিয়ে যাব মা ?"

রাসমণি বধূর এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইতেছিলেন। তার মরুভূমির মতন শুষ্ক প্রাণে যে রসের উদ্রেক হইয়াছে, ইহা সন্ন্যাসীরই মাহাত্ম্য ও আশীর্ব্বাদ মনে করিতেছিলেন; আভার ধর্ম্মে মতি ও অনুরাগ হইয়াছে, হৃদয় কোমল হইয়াছে—অনেক দিন রাসমণি টের পাইয়াছেন আভা এখন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদে; ইহাতে রাসমণির মন বধূর উপর খুসী হইয়া উঠিয়াছিল। আরো বেশী খুসীর কারণ হইয়াছিল যে গোবিন্দ আসিয়া আভাকে আর দেখিতে পাইতেছিল না, আভার কাছে বেশীক্ষণ থাকিবার সুবিধা পাইতেছিল না। আভা এখন যখন-তখনই সন্ন্যাসীর গান বা উপদেশ শুনিতে যায়। গোবিন্দ যখন আসিয়া একথা সেকথা পাড়িয়া চারিদিকে বারবার চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আভাকে দেখিতে পায় না, তখন রাসমণির অত্যন্ত হাসি পায়; যখন গোবিন্দ চলিয়া যাইবার জন্য পশ্চাৎ ফিরে তখন রাসমণির কঠোর আঁটালো মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। কোনো কোনো দিন বা গোবিন্দ লজ্জার সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া মুখ ফুটিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে—'জেঠিমা, বৌদিদি কোথায় ?' তাহা হইলে রাসমণির এমন হাসি পায় যে তিনি চট করিয়া জবাব দিতেও পারেন না।

গোবিন্দ একদিন আভাকে বলিল—বৌদি, তোমারও শেষে এমন দুর্ম্মতি হল যে ধর্ম্মে মতি গেল ?

আভা মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল। রাসমণি ক্রুদ্ধ হইয়া

বলিলেন—ধর্ম্মে মতি যাবে না ত কি তোর মতন নাস্তিক হবে? ধর্ম্মে মতি হয় অনেক ভাগ্যে! ওরকম কুপরামর্শ দিতে তুমি আমার বাড়ীতে এসো না বল্‌ছি। আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে [illegible], বারণ করেছি, তুমি শোনো না কেন বলো ত?

রাসমণির বেশী রাগ হইলেই তিনি গোবিন্দকে তুমি বলিতেন। গোবিন্দ তাহা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল—আমি নাস্তিক কি সাধে জেঠিমা? যা কিছু যাচাই কর্‌তে যাই তাই দেখি ভুয়ো মেকি; তাই সব-কিছুতেই অবিশ্বাস করি। যেদিন খাঁটি জিনিস আপনাকে প্রমাণ কোরে দেবার, সেদিন তাকে মাথা নত কোরে স্বীকার কর্‌ব। বৌদিকে একটু বুদ্ধিমতী বলে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তিনিও শেষে ঐ ভণ্ড বুজ্‌রুকটার ওপর-চটক গিল্টি দেখে সোনা মেনে ঠকে গেলেন, তাই ওঁকে সাবধান কোরে দিচ্ছি।

আভা সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। রাসমণি তাতে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—দেশ-সুদ্ধ সবাই যাকে ভক্তি কর্‌ছে তাকে একা তুই বল্‌ছিস ভণ্ড জোচ্চোর। অমন কথা কানে শুন্‌লেও পাপ হয়। তুই দূর হ আমার বাড়ী থেকে।

গোবিন্দ নড়িবার নাম না করিয়া যেমন ছিল তেম্‌নি বসিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিল। গোবিন্দ আগে একটুতেই রুষ্ট হইত, লোকের সঙ্গে কথা বলা বা বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিত। কিন্তু এখন তাকে এমন দুর্ব্বাক্য বলিয়া ও অপমান করিয়াও দূর করা যায় না। রাসমণি রুষ্ট হইয়া বলিলেন—তুই ত আচ্ছা নেই-আঁকড়া! যেন ময়রার দোকানের ভীম্‌রুল।

তার জেঠিমার মুখে এই উপমা শুনিয়া গোবিন্দর অত্যন্ত হাসি পাইল, লজ্জাও বোধ হইল। তার জেঠিমা যে কোন্ মিষ্টান্নের ইঙ্গিত

করিতে চাহিলেন তাহা বুঝিতে পারিয়া গোবিন্দ অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল। স্থির করিয়া গেল এ বাড়ীতে আর সে আসিবে না, আসিবার বেশী দরকারও নাই, এখন আভার উপর রাসমণি তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব প্রসন্নই আছেন।

ষোল

যে জন্মদুর্ভাগা, তার কিছুতেই সুখ নাই; আভা জন্মের অল্পকাল পরেই মাকে হারাইয়াছিল, বিবাহের পর তার দুঃখদুর্গতির অন্ত ছিল না, স্বামী মরিয়া তাকে নূতন দুঃখে ফেলিয়া গিয়াছিল—গাঁয়ের যত যুবক ঐ সুন্দরী মেয়েটিকে বিধবা দেখিয়া তার প্রতি মমতায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গোবিন্দকে যে মন্মথ আর হারাধন মেস হইতে তাড়াইয়াছিল তারা আবার এল-এ ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া গাঁয়ে আসিয়া বসিয়াছিল; তাদের হাতে এখন অপর কোনো কাজ না থাকাতে আভার সৌন্দর্য্যলোলুপ যুবকদলের সর্দ্দারিতে উৎসাহের সঙ্গে লাগিয়া গেল। তারা ছুতায় নাতায় এখন রাসমণির বাড়ীতে খুব যাওয়া আসা আরম্ভ করিয়াছে। জগন্নাথ-দাদার অকালমৃত্যুতে সন্তপ্ত হইয়া তারা জেঠিমাকে সান্ত্বনা দিতে আসে, তারা থাকিতে জেঠিমার কোনো ভয় নাই বলিয়া রাসমণিকে সাহস দ্যায়। তারা আভার ঘাটের পথে, ঠাকুরবাড়ী যাইবার পথে ওত পাতিয়া থাকে, একলা পাইলে বৌদিদি বলিয়া আত্মীয়তা দেখাইয়া আলাপ করিবার চেষ্টা করে। স্বামীর প্রতি আভার যখন একটুও মমতা বা টান ছিল না, তখন এই বিধবার শূন্য মনখানি সহজেই দখল করিবার সম্ভাবনা তাদের মনকে আশান্বিত করিয়া তুলিত, কিন্তু তাদের সিদ্ধির পথের অন্তরায় ছিল ঐ গোবিন্দটা; তারা রাসমণির বাড়ীতে বেশ করিয়া জমাইয়া বসিতে না

বসিতে গোবিন্দ গিয়া উপস্থিত হয় এবং তাকে দেখিয়া তাদের উদ্‌যোগপর্ব্বেই সভা ভঙ্গ করিয়া পলায়ন করিতে হয়। আর-একটা অসুবিধা হইতেছিল আভার উদাসীন উপেক্ষায়; আভার জন্য তারা মমতা ও আত্মীয়তা দেখাইয়া বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করিবার যত রকম চেষ্টাই করিত, আভার কিছুতেই আগ্রহ দেখা যাইত না. সে ঘোমটা দিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইত।

অবশেষে আভার সহিত আলাপ করিবার সকল চেষ্টায় পরাস্ত মানিয়া তাবা স্থির করিল আভাকে চিঠি দিতে হইবে। কাকে দিয়া দেওয়া যায়? স্থির হইল সৌরভীকে অর্থ দিয়া বশ করিতে হইবে। এবং তার জন্য তখনই দশ টাকা চাঁদা উঠিয়া গেল। তারপর মন্মথ ও হারাধন অনেক কষ্ট করিয়া সংযত ভাষার মধ্যে যতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে পারা যায় তার এক মুসাবিদা অনেক অদলবদল ও কাটাকুটি করিয়া দাঁড় করাইল; তারপর অন্য একখানি রঙিন-ছবি-দেওয়া কাগজে পরিষ্কার করিয়া চিঠিখানির একটা কথা মন্মথ ও একটা কথা হারাধন পালা করিয়া লিখিল, যেন চিঠি ধরা পড়িলেও লেখক ধরা না পড়ে। মন্মথ চিঠির কাগজের ছবির তলে একটু কবিতাও উদ্ধৃত করিয়া বসাইল —"যাও চিঠি বোলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।" এবং চিঠির শেষেও কবিতা বসাইল—

"কি জানি কি ঘুমঘোরে কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে বুঝি ওরে ভুলিব না আর!"

এইরূপে চিঠিখানিকে খুব সরস করিয়া তুলিয়া তারা আনন্দিত হইল, এ চিঠি পড়িবামাত্র আভার মন সেই রসে লেপ্‌টাইয়া আট্‌কাইয়া আর নড়িতে পারিবে না কিছুতেই।

চিঠিখানি লিখিয়াই তারা স্থির করিয়া ফেলিল তাদের সিদ্ধির সম্ভাবনা

পনেরো আনা অবধারিত, বাকী একআনা একটু তদ্‌বিরের অপেক্ষা রাখে। সেটুকুও তারা প্রাণপণে করিবে ভাবিয়া তারা উল্লসিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলা মন্মথ ও হারাধন দলের দূত হইয়া চিঠিখানি লইয়া রাসমণির বাড়ীর পিছন দিকে পুকুরপাড়ে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় রাত্রির জন্য জল লইতে সৌরভী ঘাটে যাইতেই মন্মথ হাতছানি দিয়া সৌরভীকে ডাকিল। সৌরভী ঘড়াটা ঘাটে নামাইয়া রাখিয়া পাড়ের উপর উঠিয়া গেল। মন্মথ ও হারাধন একবার সন্তর্পণে চারিদিকে দেখিয়া সৌরভীর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিল,—তুমি যদি আমাদের একটি উপকার করতে পারো সৈরবী, ত আরো পাঁচ টাকা তোমাকে দেবো।

সৌরভী এই অপ্রত্যাশিত লাভে আনন্দিত হইয়া বলিল—কি করতে হবে বলো।

মন্মথ চিঠিখানি বাহির করিয়া তার হাতে দিয়া বলিল—এই চিঠিখানি তোমাদের বৌকে লুকিয়ে দেবে, আর যা জবাব দেবে চুপিচুপি এনে আমাদের দেবে! আমাদের খুসী করলে তোমাকেও খুসী......

মন্মথর কথা শেষ না হইতেই হঠাৎ মন্মথ ও হারাধনের মাথায় মাথায় ভয়ানক জোরে জোরে ঠকাঠক ঠকাঠক করিয়া ঠোকাঠুকি লাগিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ঠোকাঠুকির পরে যখন তাদের মাথা দুটা ঠোকাঠুকি হইতে বিরত হইল, তখনো তাদের মাথার মধ্যে ঝুমঝুমি বাজিতেছে, তারা চোখে অন্ধকার দেখিতেছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন ঝিম্‌ঝিম করিতেছে। ভরসন্ধ্যেবেলা ভূতের উপদ্রব মনে করিয়া তাদের মনের ভিতরটাও ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল। একটু সম্বিত পাইয়া যখন তারা সামনের জিনিস দেখিতে পাইল তখন তারা দেখিল তাদের

সামনে চিঠি হাতে করিয়া সৌরভীর জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে উগ্রমূর্ত্তি গোবিন্দ, সৌরভীর কোথাও চিহ্ন মাত্রও নাই। তাদের ভয় ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, তবে কি সন্ধ্যার অন্ধকারে সৌরভী মনে করিয়া ভুলিয়া গোবিন্দকে চিঠি দিয়া হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গেছে!

যেখানে দাঁড়াইয়া মন্মথ ও হারাধন সৌরভীকে চিঠির কথা বলিতে-ছিল তার পাশেই গোবিন্দর বাগান। গোবিন্দ বেড়ার ঠিক ধারে বসিয়া বেড়া বাঁধিতেছিল; মন্মথ বা হারাধন সেইজন্য তাকে দেখিতে পায় নাই, এবং অমন সন্ধ্যাবেলা যে গোবিন্দ সেখানে থাকিতে পারে সে আশঙ্কাও করে নাই। গোবিন্দ তাদের দুষ্ট অভিসন্ধি শুনিয়াই এক লাফে বেড়া ডিঙাইয়া আসিয়া তাদের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগাইয়া মাথার মধ্যে যখন ঝুমঝুমি বাজাইয়া তুলিয়াছিল তখন সৌরভী সেইখানে চিঠি ফেলিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইয়াছে। সে টাকা কটি পেটকাপড়ে লুকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাসমণির কাছে গিয়া কাঁদিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িল—গাঙ্গুলী-বাড়ীর মোনা আর হরা কিনা আমায় লোভ ছাখায়! বলে বৌমাকে চিঠি এনে দিতে! এতবড় তাদের আস্পর্দ্ধা মা! আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে দিব্যি গেলে বল্‌ছি, এতে আমার কিছু দোষ নেই—তোমায় আমি আগে থাক্‌তেই সব বোলে রাখ্‌লাম।

সৌরভী নিজের চক্ষে গোবিন্দর হাতে মন্মথ ও হারাধনের যে দুর্দ্দশা হইতে দেখিয়া আসিয়াছে তারই সম্ভাবনায় তার হৃৎকম্প হইতেছিল; না জানি গোবিন্দ তার কি শাস্তি করিবে। তবু যতটা পারে সে সাফাই হইয়া থাকিবার জন্য রাসমণিকে সব কথা বলিয়া ফেলিল। রাসমণি তাকে ও মন্মথ-হারাধনকে নিষ্কৃতি দিয়া বলিলেন—তোর এতে দোষ কি? আর মোনা-হরাকেও দোষ দেওয়া যায় না, তারা পুরুষমানুষ; মেয়েমানুষের আস্কারা না পেলে কি ওরা এতটা

সাহস করে। বৌটোর বেচাল দেখেই ওরা ঝুঁকেছে। এই ত আমরা রয়েছি, আমাদের দেখে ত কেউ চিঠিও পাঠায় না, বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরঘুরও করে না।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া অতি রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও আভা হাসিয়া ফেলিল।

মন্মথ ও হারাধনকে তাদের লেখা চিঠিখানি দেখাইয়া গোবিন্দ বলিল—তোরা যা, তোদের এই মৃত্যুবাণ আমার কাছে রইল। ফের যদি কিছু অন্যায় দেখি ত একেবারে মারা যাবি।

সতেরো

তারপর আভার নিরুপদ্রব শান্তিতে মাস আষ্টেক কাটিয়া গেল। এক-দিন সকাল-বেলা আভা রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছিল, এমন সময় রাস-মণি ঘাট হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই গামছা-জড়ানো ভিজা কাপড়ের পোঁট্‌লাটা দালানে আছ্‌ড়াইয়া ফেলিলেন, তারপর মুখ একেবারে কালো আর তোলো-পানা করিয়া হন্‌হন্ করিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিলেন। কঠোর দৃষ্টিতে একবার আভার দিকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইলেন; তারপর না কিছু বলা না কিছু কহা, আভার হাত ধরিয়া এক হেঁচ্‌কা টান মারিয়া তাকে দাঁড় করাইয়া একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। আভা অবাক হইয়া ম্লান মুখে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। রাসমণি কঠিন কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—হ্যাঁলা, সৈরবীর কাছে এ কি সর্ব্বনেশে কথা শুন্‌লাম! আমার জোগুকে খেয়েও বুঝি তোর আশ মিট্‌ল না, শেষকালে তার নামটাও ডুবুলি, কুলে কলঙ্ক দিলি।......

এই কথা শুনিয়া আভা মাথা নত করিল।

রাসমণি মাটি হইতে একখানা খুন্তি কুড়াইয়া লইয়া আস্ফালন করিয়া বলিলেন—বল্, সৈরবী যা বলেছে তা সত্যি কি না?

আভা একবার চকিত দৃষ্টিতে শাশুড়ীর হাতের উদ্যত অস্ত্র দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া মৃদু অথচ দৃঢ় কম্পিত স্বরে বলিল—সত্যি।

সেই কথা কানে পৌঁছিতে-না পৌঁছিতে রাসমণি খুন্তি দিয়া আভাকে প্রথমটা খুব এক চোট পিটাইয়া দিয়া তার পায়ের কাছে গড় হইয়া দুমদুম দুমদুম করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন. আভা আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। সৌরভী রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া চুপিচুপি বলিল—মা-ঠাকরুণ, একটু থির হও। এখন মার্লেও কিছু হবে নি, মাথা খুঁড়্লেও যা হয়েছে তা ফির্বেনি। এখন যাতে জানাজানি না হয় তার একটা উপায় ঠাওরাও। আতুরী হাড়িনের ওষুধটা খুব জবর! একটা ট্যাকা দাও আমি চুপুচুপু এনে দেবো।

রাসমণি যেখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতেছিলেন, উঠিয়া সেইখানেই স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর তাঁর মুখ দেখিতে দেখিতে আবার কঠোর হইয়া উঠিল, তিনি আপন মনেই বলিতে লাগিলেন—আমি তখনই জানি এম্নি একটা অনাছিষ্টি কাণ্ড কিছু ঘট্বে। গোবিন্দ একেবারে বৌদিদি বল্তে অজ্ঞান, বৌদিদির ওপর অমন টান, এর কারণ কে না বুঝ্তে পারে! তবে দেখ্তাম কিনা যে বৌ-ছুঁড়ি গোবিন্দর সাম্নে ঘোম্টা দেয়, কথা কয় না, তাইতে নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু সে যে শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার কৌশল, তা ত তখন বুঝ্তে পারিনি। এতটুকু মেয়ের পেটে-পেটে যে এতখানি সয়-তানি তা কে জান্ত?

সৌরভী বলিল—আমি কিন্তু আগেই এঁচেলাম, ছোট দাদাবাবুর বৌদিদির ওপর যখন্ এত আত্তি তখন এর ভেতর কিছু মেচ্কো-ফের

আছেই আছে। কথায় বলে ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও তা টের পায় না, আমরা ত মনিষ্যি। এখন এর প্রতিকারের পথ দ্যাখো—আমায় একটা ট্যাকা দাও, ওষুধটো নিয়ে আসি। খালি পেটে খেতে হয়; বৌমা, তুমি এখন কিছু খেয়ো নি যেন, আমি যাবো আর আস্‌ব।

রাসমণি একবার কঠোর দৃষ্টিতে আভার দিকে চাহিয়া উঠিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেলেন—দেখ্ সৈরবী, এমন ওষুধ আন্‌বি যাতে ধাড়ি সুদ্ধ নিকেশ হয়ে যায়।

রাসমণি চলিয়া গেলে, সৌরভী চুপিচুপি বলিল—ছি বৌমা, কথাটা যদি আমায় এর আগে চুপিচুপি বল্‌তে তোমার শাশুড়ীকেও টের পেতে দিতাম না। এ যে পেরায় ভরা হয়ে এসেছে, তাইতে ত তানাকে জানাতে হল। কিন্তু ভেবো না কিচ্ছু, আমি রয়েছি, ভয় কি!

সৌরভী আশ্বাস দিয়া রাসমণির নিকট হইতে টাকা লইতে চলিয়া গেল। আভার মুখ ভয়ে দুঃখে লজ্জায় শুকাইয়া ম্লান হইয়া উঠিল; তার মুখে চিন্তার উদ্বেগ দেখা দিল। সে ক্ষণকাল সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইল। ধীরে ধীরে গিয়া শাশুড়ীকে বলিল—মা, ওষুধ আন্‌তে দেবেন না, আমি খাবো না।

আভার কথা শুনিয়া সৌরভী চোখ কপালে তুলিয়া যাইতে যাইতে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া রাসমণি কঠোর স্বরে বলিলেন—তুই যা না সৈরবী, খাবে কি খাবে না সে আমি দেখে নেবো।

আভা স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে বলিল—মিছে পয়সা নষ্ট কর্‌বেন্, আমি কিছুতেই খাবো না, মেরে কেটে ফেল্‌লেও না।

আভা এতকাল মুখ বুজিয়া নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে, মার খাইয়া পুড়িয়া গিয়াও সে কথা কহে নাই। আজ তাকে কথা বলিতে দেখিয়া

ও সেই কথার দৃঢ়তা স্পষ্ট অনুভব করিয়া রাসমণি অত্যন্ত ভীত হইলেন। আভার অসাধারণ সহ্য করিবার শক্তির পরিচয় তিনি ত বহুবার পাইয়াছেন; তাতে তাকে তিনি একগুঁয়ে জেদী বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন। সেই আভা যখন স্পষ্ট করিয়া নিজের সঙ্কল্প শুনাইয়া দিল, তখন অমন যে কঠোর রাসমণি তিনিও একটু দমিয়া গেলেন। তিনি ক্ষণকাল অবাক হইয়া আভার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সৌরভীকে বলিলেন—তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন, তুই যা না নিজের কাজে!

আভাকে দৃঢ় হইতে দেখিয়া তাকে দমন করিবার জেদ রাসমণির বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই তিনি আভার কথায় কোনো জবাব দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। আভাও আর কিছু না বলিয়া রান্না ঘরে ফিরিয়া গেল। সৌরভী তা দেখিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল।

আভা রান্নাঘরে গিয়া দেখিল যে-তরকারীটা সে উননের উপর চড়াইয়াছিল, তা পুড়িয়া চোঁচোঁ শব্দ করিতেছে। আভা কড়াখানা ঝুম্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি আপনার ভাত বাড়িয়া লইয়া খাইতে বসিল।

রাসমণি সৌরভীকে টাকা দিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, আভা তাঁর জন্য অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া লইতেছে। তা দেখিয়া রাসমণির আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, গুরুজনের আগ্ খাওয়া আর গুরুজনকে উচ্ছিষ্ট খাওয়ানো ত সমান! কিন্তু পরক্ষণেই যখন তিনি বুঝিলেন যে কেন আভা এত তাড়াতাড়ি খাইতে বসিয়াছে তখন তাঁর রাগ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি আভাকে একটিও কটু বাক্য শুনাইতে পারিলেন না; তিনি হনহন করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আঠারো

গোবিন্দর মা গোবিন্দকে বলিতেছিলেন—গোবিন্, তুই মত্ত দে, আমি করালী মুখুয্যের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক করি—রূপে গুণে সোনার মেয়ে!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—হীরের মেয়ে হলেও নয় মা, বিয়েতে আমার রুচি নেই। . . . .

এমন সময় রাসমণি তাদের উঠানে ঢুকিয়াই কর্কশ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—তা থাক্‌বে কেন? ভদ্দর লোকের বৌ-ঝির জাত খেতে খুব রুচি আছে ত?

গোবিন্দ ও কমলা অবাক আশ্চর্য্য হইয়া রাসমণির মুখের দিকে চাহিল। কমলার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, তিনি গোবিন্দর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন গোবিন্দর মুখ লজ্জায় আর রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

রাসমণি উহাদিগকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া চাপা গলায় যতখানি সম্ভব ঝাল মিশাইয়া বলিতে লাগিলেন—এমন কোরেই কি দেইজিপনা সাধ্‌তে হয় রে। শেষে কুলে কালী দিলি, আমার জোগুর নাম পর্য্যন্ত ডুবুলি। এই জন্মেই বৌদিদির ওপর অত দরদ! এই মৎলব মনে ছিল বোলেই জোগুকে বোকা পেয়ে তার সঙ্গে এই সর্ব্বনেশে কুল-মজানী মেয়ের ঘট্‌কালি করা হয়েছিল!

গোবিন্দর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তার মুখ ছাইএর মতন শাদা হইয়া গেল; সে রাসমণির মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল, সে যেন সমস্ত কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছিল না। কমলা আবার সংশয় ও বিস্ময় লইয়া গোবিন্দর দিকে চাহিলেন। গোবিন্দ

শুষ্ক ওষ্ঠ জিভ দিয়া ভিজাইয়া বলিল—জেঠিমা, আমি বৌদিদিকে বিয়ে করব, তাকে আমায় দিয়ে দাও।

রাসমণি মুখ ভেঙাইয়া বলিলেন—কিবে কথাটাই বল্লেন! ওসব জাত-খাওয়া খিষ্টানী কথা আমি শুনিনে। যাতে গাঁয়ে ঢিঢিক্কার না পড়ে তার বিহিত করো, নইলে তোমাদের পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা হয়ে মরব।

বলিতে বলিতেই রাসমণি কমলা ও গোবিন্দর পায়ের গোড়ায় ঢিপঢিপ করিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাসমণিকে ধরিয়া তুলিলেন। তিনি যেন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। চেষ্টা করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন—এত উতলা হয়ো না দিদি।

রাসমণি বলিয়া উঠিলেন—উতলা হব না! আমার যে ডুক্‌রে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে করছে। আমার যে গবা হারামজাদাকে কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করতে ইচ্ছে করছে! আমার যে হয়েছে চোরের মায়ের কান্না! শেষে কি আমি এই বুড়ো বয়সে বিষ খেয়ে আগুহত্যে কোরে মরব! এমন কলঙ্ক তোরা আমার কুলে দিলি!·········

এতক্ষণে রাসমণির চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। কতখানি লজ্জা আর ক্ষোভে যে কঠোর রাসমণির চোখের জল পড়িল তাহা কমলা বুঝিতে পারিয়া আর একটিও সান্ত্বনার কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি কঠোর দৃষ্টিতে গোবিন্দর দিকে চাহিলেন।

সেই দৃষ্টিতে আহত হইয়া গোবিন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বৌদিদির বিয়ে দেওয়া ছাড়া ত এখন আর কোনো উপায় নেই জেঠিমা। আমাকে অনুমতি দাও, আমি বৌদিদিকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

রাসমণি চট করিয়া চোখের জল মুছিয়া কর্কশ তীক্ষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আর গাঁয়ে টিটিক্কার পড়ে যাক! এও কি একটা কথা হলো ছোট-বৌ?

কমলা নিরুপায় দ্বিধায় পড়িয়া শুধু ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন—না।

রাসমণি বলিলেন—আমি সৈরবীকে চুপিচুপি ওষুধ আন্‌তে পাঠিয়েছি। কিন্তু এমনি হারামজাদা বেহায়া মেয়ে, যে, তাড়াতাড়ি ভাত গিল্‌তে বসেছে—খালি পেটে না খেলে ত ওষুধ ধর্‌বে না। আমার কথা ত ও গেরাহ্যি করে না, খোট ধোরে বসেছে ওষুধ গিল্‌বে না, মেরে ফেল্‌লেও না। যে জেদী মেয়ে, যা বল্‌বে তাই কর্‌বে। এখন এ কলঙ্ক ত আমার একার নয়, তোমাদেরও ত। এক গোবিন্দর কথা শোনে, ও একবার বুঝিয়ে বলুক। তবে তোমরা বল্‌তে পারো ছেলে পরশমণি, তার আবার কলঙ্ক কি, গরজই বা কি! কিন্তু সেইটে কি উচিত হবে, ধর্ম্মে সইবে?

কমলা আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া শুধু ঘাড় নাড়িতেছিলেন। গোবিন্দ বলিয়া উঠিল—আর একটা প্রাণীহত্যা করা ধর্ম্মে সইবে জেঠিমা!

রাসমণি রাগে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। তিনি চেঁচাইয়া গাঁ মাথায় করিতে পারিতেছিলেন না বলিয়া তাঁর ক্রোধ আরো উগ্র ও অসহ্য বোধ হইতেছিল। তিনি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে চাপা গলায় বলিয়া গেলেন—আজ বেঁচে থাক্‌ত জোগু ত কাত্তানের এক কোপে সকল তর্ক থামিয়ে দিত! আমার যদি মুখ হেঁট হয় দশের কাছে, তবে জেনে রাখিস্ তোদের দুটোকে কেটে আমি ফাঁশি যাবো—অম্‌নি ছাড়্‌বার মেয়ে আমি নই।

রাসমণি বেগে গোবিন্দর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

কমলা আর গোবিন্দ আড়ষ্ট হইয়া নিশ্চল নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল; যেন রাসমণি তাদের প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কমলা লজ্জায় ঘৃণায় দুঃখে ছেলের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিলেন না; সৎপুত্রের মা'তা বলিয়া তাঁর যে গর্ব্ব ছিল, তা আজ অকস্মাৎ অতি-রূঢ় আঘাতে একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল। এমন অপকর্ম্ম তাঁর পুত্র হইয়া গোবিন্দ করিতে পারিল!—এই ভাবিয়া তিনি নিজেকেও ধিক্কার দিতেছিলেন, অপরাধী মনে করিতেছিলেন। আর গোবিন্দও মায়ের মুখের দিকে তাকাইতে পারিতেছিল না, যে কলঙ্ক তার চরিত্র মলিন করিয়া দিয়াছে তা ত সে একরকম স্বীকার করিয়াই লইয়াছে, এ নিদারুণ পঙ্কিলতা তার মায়ের সামনে উদ্‌ঘাটিত হইল! গোবিন্দ ভাবিতেছিল, মা তাকে তিরস্কার করুন। আর কমলা ভাবিতেছিলেন, গোবিন্দ একবার মিথ্যা করিয়াও বলুক এ অপবাদ, এ কলঙ্ক মিথ্যা! আবার তখনি তাঁর মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিল পাছে তাঁর পুত্র মিথ্যা দিয়া কৃত অপরাধকে ঘৃণ্যতর করিয়া তোলে।

জোর করিয়া দ্বিধা সঙ্কোচ সরাইয়া ফেলিয়া গোবিন্দ মায়ের দিকে হঠাৎ ফিরিয়া বলিয়া উঠিল --মা, এখন আমাকে কি করতে বলো?

কমলার একবার মনে হইল বলেন—তুই আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যা।—কিন্তু গোবিন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সে কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। চুপ করিয়া তার মুখের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গোবিন্দ মাকে কথা বলাইতে না পারিয়া একটু অপ্রতিভ ও সঙ্কুচিত-ভাবে আবার বলিল—আভাকে রক্ষা করতে হবে আমাকেই—তা বিয়ে কোরেই হোক বা আশ্রয় দিয়েই হোক। কিন্তু সে কি আমার মায়ের অমতেই করতে হবে মা?

কমলা গোবিন্দর অকম্পিত স্পষ্ট স্বর শুনিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন, তাঁর মনের মেঘ অনেকখানি কাটিয়া গেল। তিনি গোবিন্দর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তুই আগে বল্ তোর মায়ের মাথা হেঁট হয় এমন কোনো অন্যায় তুই করিস্‌নি।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ছেলের মাথা হেঁট যে হচ্ছে তাতে মায়ের দুঃখ্ নেই, মায়ের ভাবনা যে তাঁর মাথা হেঁট হচ্ছে কি না। তোমার ছেলেকে আমার চেয়ে তোমারই ত ভালো কোরে জানার কথা মা!

গোবিন্দকে সহজ স্বরে রহস্য করিতে শুনিয়া কমলা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন; পুত্রের উপর সন্দেহ অনেকখানি দূর হইয়া গেল; তথাপি তিনি প্রসন্ন হইয়া উঠিতে পারিলেন না। গম্ভীর থাকিয়াই বলিলেন—শেষ কালে বিধবা বিয়ে কর্‌বি? গাঁয়ে একঘরে ঠেলা হয়ে থাক্‌বি?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ঐ ত তোমাদের দোষ মা—ছেলের যাকে পছন্দ তাকে বিয়ে কর্‌তে দেবে না, বিয়ে কর্‌তে বল্‌বে কোথাকার এক অজানা অচেনা করালী মুখুয্যের মেয়েকে! আর বিয়েই যে হবে তাই বা জান্‌ছ কি কোরে, কনের মত নাও হতে পারে ত। কিন্তু তাতেও একঘরে হওয়া আট্‌কাবে না।

কমলা খানিক চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন—যা কর্‌বি বেশ ভেবে চিন্তে করিস্, তোর ইচ্ছা প্রবৃত্তি তোর, তাতে আমার আপত্তি কর্‌বার অধিকার কি?

গোবিন্দ প্রফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল—এই ত আমার মায়ের মতন কথা—গোঁয়ার গোবিন্দর মা বটে!

তবুও কমলার হাসি আসিল না। তাঁর মনের কোণে একটু খট্‌কা লাগিয়াই ছিল; তার উপর অন্তঃসত্ত্বা বিধবার বিয়ে, সকলের নিন্দিতাকে আশ্রয় দেওয়া ও পুত্রের অপবাদ লইয়া অবিলম্বে গ্রামে যে তুমুল আলো-

জনা চলিবে তার ভয় ও হিন্দুঘরের আচারনিষ্ঠ বিধবার সংস্কার তাঁকে অত্যন্ত পীড়া দিতেছিল; কিন্তু পুত্রের প্রতি বিশ্বাস ও স্নেহ, আভার প্রতি মমতা, একটি অজাত প্রাণীকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা তাঁকে ভয় ও সংস্কারের সঙ্কোচ দমন করিয়া প্রবল হইতে বলিতেছিল।

গোবিন্দ মাকে চিন্তাকুল দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। কমলা তেম্‌নি দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উনিশ

রাসমণি গোবিন্দর বাড়ী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন আভার খাওয়া হইয়া গিয়াছে। সে নিজের ঘরের দেয়ালে ঠেসান দিয়া মুখখানি উঁচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তিনি তাকে শুনাইয়া শুনাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—আজকালকার ছেলে মেয়ে সব সমান বেহায়া, মা জেঠীর সাম্‌নে সমীহ নেই! লজ্জার কথা শুনে কোথায় অহল্যা পাষাণী হয়ে থাক্‌বে, না, বলে কিনা বৌদিদিকে আমি বিয়ে কর্‌ব! সৈরবী হতচ্ছাড়ী সেই যে গেল আর ফের্‌বার নামটি নেই। একটা যা হোক হেস্তনেস্ত হয়ে গেলে যে গোকুলচাঁদকে ঘৃত-পরমান্ন ভোগ দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।......

রাসমণি আপন মনে অনর্গল বকিয়াই যাইতেন, কিন্তু বাড়ীতে কার পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলেন। ঝুঁকিয়া দেখিলেন গোবিন্দ আসিতেছে। তাকে আসিতে দেখিয়াই রাসমণি ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

গোবিন্দ একবার চারিদিকে চাহিয়া অনুসন্ধান করিল আভা কোথায় আছে। দেখিল আভা ঘরের মধ্যে জড়োসড়ো হইয়া দেয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে। গোবিন্দ আস্তে আস্তে গিয়া ঘরের দরজার ভিতর দাঁড়াইল।

আভা সেদিকে পাশ ফিরিয়া বসিয়া ভাবনায় ডুবিয়া গিয়াছিল; গোবিন্দর আসা টের পাইল না। গোবিন্দ অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া আভাকে দেখিয়া দেখিয়া মমতায় দ্রব স্বরে ডাকিল—বৌদি।

আভা চম্‌কিয়া ফিরিয়া গোবিন্দকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সে গোবিন্দকে দেখিয়া নত মুখে ঘোম্‌টা টানিয়া সরিয়া গেল না, তার দিকে দৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—ভৎর্সনা করতে এসেছ ঠাকুরপো?

গোবিন্দ একটি গভীর বেদনা গোপন করিয়া বলিল—না বৌদি, আমি তোমায় আমার বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।

আভা গোবিন্দর কাছেও এতখানি ক্ষমা প্রত্যাশা করে নাই। সে এই স্নেহের স্পর্শে একেবারে অভিভূত হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল আর দুই হাতে আঁচল ধরিয়া চোখে চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। গোবিন্দ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তার কান্না দেখিতে লাগিল, তার মনের মধ্যেও এত বিরুদ্ধ ভাবের ঝড় বহিতেছিল যে সেও কোনো কথা বলিতে পারিতেছিল না। ক্ষণেক পরে আভা নিজেকে একটু সম্বরণ করিয়া লইয়া চোখ মুছিয়া আবার গোবিন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া কাতর স্বরে বলিল—তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না। আমি কোনো অপকর্ম্ম করিনি।

গোবিন্দ ম্লান মুখে বলিল—তোমার ওপর রাগ করি এমন সাধ্য আমার নেই। একটু দুঃখ হয়েছিল, আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এমন ভুল তুমি করলে কেমন কোরে—জেনে বুঝে অপকর্ম্ম তুমি করতে পারো না, তা আমি জানি।

আভা আজ বড় মুখরা হইয়া উঠিয়াছে, সে গোবিন্দর সঙ্গে আজ স্বচ্ছন্দে সকল কথা কহিয়া যাইতেছে। সে বলিল—ভুলও আমি করিনি ঠাকুরপো। যাকে আমি ভালোবেসেছি, ভক্তি করেছি, যার ভালোবাসা

পেয়েছি, তাকেই আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে দান করেছি, সমস্ত পরিণাম জেনে বুঝে।

•গোবিন্দ বিরক্ত হইয়া বলিল—সে তোমায় ককৃখনো ভালোবাসে না, যদি বাস্‌ত তা হলে চোরের মতন নিজেকে লুকিয়ে রাখ্‌ত না, তোমায় সে বিয়ে কোরে তোমার সঙ্গেই সমাজের লাঞ্ছনা ভাগ কোরে নিত। সে কাপুরুষ! সে নরাধম!

আভার মুখ প্রথম মুহূর্ত্তে রাগে লাল হইয়া উঠিল; পর মুহূর্ত্তে তা ক্ষীণ হাসিতে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; আভা বলিল—না জেনে শুনে আমার সাম্‌নে তাঁকে গাল দিয়ো না ঠাকুরপো। তাঁর মন কত বড় উঁচু, কত কোমল, তা আমি জানি। আমি তাঁকে সবার বেশী ভালোবেসেছি বোলেই আমিই তাঁকে অপদস্থ অপমানিত হতে দিইনি; নইলে তিনি ত প্রস্তুত আছেন।

একটা অত্যন্ত কটু উত্তর গোবিন্দর ক্রুদ্ধ মনের মধ্যে আস্ফালন করিয়া উঠিল; কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া কোমল স্বরে বলিল—থাক্ ওসব তর্কের কথা বৌদি। এখন তুমি চলো।

আভা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—এ বাড়ী ছেড়ে আমি যাব না।

গোবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া আভার মুখের দিকে তাকাইল, তার মুখে দৃঢ় সঙ্কল্প স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিল—এরা যে তোমাকে কষ্ট দেবে, পীড়ন করবে।

আভা হাসিয়া উত্তর করিল—তা ত করবেই। আমি এদের কাছে অন্যায় করেছি, অপরাধ করেছি, তার শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হবে না? সমস্ত কষ্ট সহ্য কোরে আমাকে এখানে থাকতে হবে। আর তোমার বাড়ীতে গিয়ে তোমাদের এর মধ্যে জড়াব না।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—তুমি জড়াবার আগে লোকে জড়িয়ে

বোসে আছে। আমিও যে অপবাদকে দেবতার আশীর্ব্বাদ বোলে মাথা পেতে নিয়েছি।

আভা এতক্ষণ যে ঝড়ের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পড়িয়াছিল তাতে সে কারো কথা ভালো করিয়া শুনিতে পায় নাই, শুনিলেও বুঝিবার অবসর পায় নাই। এতক্ষণে স্থির মুহূর্ত্তে তার মনে পড়িল তার শাশুড়ী ও সৌরভী কি সন্দেহ ব্যক্ত করিয়াছে এবং গোবিন্দকে তার শাশুড়ী অপরাধী করিলে গোবিন্দ আভাকে বিবাহ করিতে চাহিয়া প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। গোবিন্দ কেবল মাত্র আভাকে দুর্ণাম ও পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য যে কত বড় কঠিন কাজ করিতে অক্লেশে স্বীকার করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া আভার মন গোবিন্দর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল, গোবিন্দর প্রতি তার অনুরাগ দ্বিগুণ হইয়া গেল। সে মৃদু কোমল স্বরে বলিল—ছি ঠাকুরপো, তুমি এমন কাজ কেন কর্‌লে? লোকের সন্দেহ যে মিথ্যা তা বল্‌লেই ত চুকে যেত।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—সন্দেহ জিনিসটা অত সহজে চোকে না। এ গাঁয়ে আমার চেয়ে তোমায় যে কে বেশী ভালো বাসে তা যখন জানা নেই, তখন আমারই নিজের ওপর একএকবার সন্দেহ হচ্ছে, লোকের ত হবারই কথা।

আভা লজ্জিত হইয়া মাথা নত করিল দেখিয়া গোবিন্দও একটু লজ্জিত হইল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—বৌদি, আমার বাড়ীতে না গেলে তোমার যে বিপদ হবে, ওরা সব ভয়ানক ষড়যন্ত্রের উদ্‌যোগ আয়োজন কর্‌ছে।

আভা অত্যন্ত সহজ ভাবে বলিল—যেটা ওরা লজ্জার কথা বোলে ঢাক্‌তে চাচ্ছে, সেই সংবাদটা গাঁয়ে রটে গেলে আর ত ঢাক্‌বার দর্‌কার থাক্‌বে না, আমারও আর বিপদের ভয় থাক্‌বে না।

গোবিন্দ আভার সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাকে যাচাই করিবার জন্য বলিল—তখন এরা যদি তোমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দ্যায় ?

আভা হাসিয়া বলিল—গাঁয়ে গাছতলার ত অভাব নেই।

—তার চেয়ে তুমি বাপের বাড়ী চলে যাও না।

বাপের বাড়ীর নামে আভা ম্লান গম্ভীর হইয়া গেল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না, সেখানেও আমি যেতে পার্‌ব না। এই গ্রাম আমার পরম তীর্থ, এইখানেই আমি থাক্‌ব।

গোবিন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিল—তবে আমার বাড়ীতে গেলেই ভালো হত বৌদি।

আভা মাটির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শুধু ঘাড় নাড়িল। গোবিন্দ হতাশ হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে চলিয়া গেল। গোবিন্দর মনের ভিতরটা তখন তোল-পাড় করিতেছিল। তার কেবলি মনে হইতেছিল গ্রামের মধ্যে সেই ভাগ্যবান কে যে বিনা সাধনায় আভার মতন মেয়ের মন হরণ করিতে পারিল ? ঈর্ষায় তার মন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। একএকবার মনে হইতেছিল সেই নরাধম কাপুরুষটাকে ধরিতে পারিলে তার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া ফেলে। তার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল ঐ সন্ন্যাসীটা নয় ত। সে রুদ্ধ রোষে আপন মনেই বলিয়া উঠিল—ভণ্ড! চোর! কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হইল, না সে হওয়া সম্ভব নয়। তবে কে? গ্রামে আভার মন হরণ করিতে পারে এমন কে আছে? মন্মথ কি হারাধনটা নয় ত? এইরূপে কত নামই তার মনে আসিতে লাগিল, আবার তখনই সেই অনুমানে আভাকে অপমান করিতেছে মনে করিয়া সে-সব সন্দেহ মন হইতে দূর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল। গোবিন্দ ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাকুল বিষণ্ণ মুখে বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিল তার

মা সেই জায়গাতেই ম্লান ভয়ার্ত্ত মুখে উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। গোবিন্দকে আসিতে দেখিয়াই তিনি ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—আভা আস্‌ছে?

গোবিন্দ কাতর স্বরে বলিল—না মা, সে এল না।

কমলা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি পুত্রের আগ্রহ দেখিয়া আভাকে আনিতে পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বেশ প্রসন্ন মনে নহে; লোকনিন্দার ভয়, নিজের মনের সংস্কার ও সন্দেহের সঙ্কোচ তাঁকে নিবারণ করিতেছিল; এখন আভা নিজে হইতে আসিল না ইহা একটা পরম নিষ্কৃতি বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিলেন—কেন এল না?

—সে বল্‌লে এদের কাছে আমি অন্যায় করেছি, এদের হাতে শাস্তি ভোগ আমাকে কর্‌তেই হবে। বাপের বাড়ীও সে যাবে না। তার শাশুড়ী যে অন্যায় গোপন কর্‌বার জন্যে অপর একটা অন্যায়ের আয়োজন কর্‌ছেন, তা নিবারণ কর্‌বে গোপন কথা গাঁয়ের সকলের কাছে প্রকাশ কোরে দিয়ে। তখন যদি তাকে ঘরে ঠাঁই না দেয় তাতেও সে ডরায় না।

আভার সাহস তেজ ও দৃঢ়তা দেখিয়া কমলা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি নিজেও এম্‌নি তেজী দৃঢ় লোক বলিয়া আভাকে খুব শীঘ্র বুঝিতে পারিলেন। তার প্রতি মমতায় তাঁর মন তাকে আশ্রয় দিবার জন্য উৎসুক হইতে লাগিল। কিন্তু তাকে আশ্রয় দিলে তাঁর পুত্রের কলঙ্ক ও অপবাদ যে সন্দেহ হইতে লোকের মনে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে এই সম্ভাবনাই তাঁকে নিরস্ত করিতে লাগিল। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, গোবিন্দ দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ী হইতে আভার ভয়ার্ত্ত ব্যাকুল আহ্বান শোনা গেল—ঠাকুরপো!

কমলা ও গোবিন্দ কান খাড়া করিয়া উঠিল। আর কিছু শোনা

গেল না, কেবল যেন একটা চাপা গেঙানি ও দুপ দুপ শব্দ ক্ষীণ অস্পষ্ট তাদের কানে আসিতে লাগিল। গোবিন্দ ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিয়া বলিয়া উঠিল—মা, জেঠিমা বোধ হয় বৌদিদিকে মারছে!

কথা বলিতে-বলিতেই গোবিন্দ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কমলাও গেলেন।

গোবিন্দ গিয়া দেখিল রাসমণির বাড়ীর সদর দরজা খিল দিয়া বন্ধ। সে ছুটিয়া ঘুরিয়া খিড়্কি দরজায় গেল। তাও বন্ধ। সে প্রাণপণ শক্তিতে দরজা ধরিয়া নাড়া দিয়া তুমুল শব্দে পাড়া কাঁপাইয়া তুলিল। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল। কিন্তু দরজা খুলিল না। লোক জড়ো হইয়া সকলে ব্যগ্র কৌতুক প্রকাশ করিয়া গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি হয়েছে? এঁ? কি হয়েছে?—কিন্তু গোবিন্দর কাহারো কথার জবাব দিবার কি এই সময়? সে সকলকে দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া ছুটিয়া নিজের বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল। তখন সমবেত লোকদের একজন বলিয়া উঠিল—দজ্জাল বৌ-কাঁট্কী শাশুড়ী বৌটোকে ঠেঙাচ্ছে বুঝি।

অপরজন বলিয়া উঠিল—শুধু মাগীর দোষ দেওয়া যায় না বাপু, ছুঁড়িই কি কম দজ্জাল? বিধবা মানুষের অত ভাবন কেনরে বাপু? ফর্‌সা কাপড়, আবার শেমিজ!

অন্যজন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, গোবিন্দটা অমন হন্যে কুকুরের মতন ছট্‌ফট্ কোরে ছুটোছুটি কর্‌ছে কেন?

সকলে হাসিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল—বৌদিদির দরদে!

গাঁয়ের সকল মেয়ে যখন রাসমণির বাড়ীর রুদ্ধ দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আভা ও গোবিন্দকে লইয়া হাসাহাসি করিতেছিল তখন তাদের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ম্লান উৎসুক চিন্তাকুল মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন কমলা।

গোবিন্দ নিজের বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া গিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া রাসমণির বাড়ীর মধ্যে যাইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড মই ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল। গোবিন্দ মইখানাকে টানিয়া আনিয়া প্রাচীরের গায়ে লাগাইয়া তরতর করিয়া প্রাচীরের উপর উঠিল, এবং সেখান হইতে এক লাফে রাসমণির উঠানে নামিয়াই ছুটিয়া যে-ঘর হইতে আভার গোঁ গোঁ শব্দ আসিতেছিল সেই ঘরে গিয়া ঢুকিল।

গোবিন্দ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল আভাকে মাটিতে চিত করিয়া ফেলিয়া রাসমণি তার বুকের উপর হাঁটু গাড়িয়া দুই হাত চাপিয়া বসিয়াছেন, সৌরভী আভার পা দুটা মাটির সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া আছে, রাসমণি একটা ঝিনুকে খানিকটা ঔষধ গুলিয়া আভার মুখে ঢালিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, আভা দাঁতে দাঁতে চাপিয়া ক্রমাগত মাথা নাড়িয়া ঔষধ ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, তাতে তার দুই কশ কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে এবং পরাভূত হইয়া ক্রুদ্ধ রাসমণি থাকিয়া থাকিয়া তার বুকের উপর বসিয়া দমক দিতেছেন, তাতেই আভা গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। গোবিন্দ এই অমানুষিক ব্যাপার দেখিয়া এক নিমেষে রাসমণিকে ঠেলিয়া আভার বুক হইতে নামাইয়া দিল, সৌরভীকে এক ধাক্কায় কাত করিয়া ফেলিল ও ঔষধ-সুদ্ধ ঝিনুকটা এমন টান মারিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল যে তা জান্‌লা দিয়া ছিট্‌কাইয়া রুদ্ধ দরজার বাহিরে জটল্লাকারিণীদের একজনের রগে লাগিয়া ঠং করিয়া বাজিয়া উঠিল।

আভা ছাড়া-পাইয়াই চট করিয়া কাপড়-চোপড় সাম্‌লাইয়া উঠিয়া বসিল। রাসমণি টাল সাম্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন— কী! এতবড় তোর আস্পর্দ্ধা যে তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্‌!

গোবিন্দ চোখ দুটা করম্‌চার মতন লাল করিয়া বলিল—তুমি জেঠিমা, তাই আমার হাতে বেঁচে গেছ, আর কথাটি কয়ো না, চুপ

কোরে থাকো। ফের যদি এ রকম উৎপাত করো আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দিয়ে ছাড়্‌ব।

পুলিশের নামে সৌরভীর মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল, সে গোবিন্দর ভয়ে আধমরা হইয়াই ছিল, এখন পুলিশের ভয়ে মরিতে মাত্র বাকী থাকিয়া রাসমণির মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিল। রাসমণি ভয়ে দমিবার লোক নন, তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—কে কাকে পুলিশে দ্যায় দেখে নেবো। বেহায়া চোখখেকো, এমন কাজ কোরে কোথায় লজ্জায় মাটি হয়ে থাক্‌বি, না পাঁচিল ডিঙিয়ে মদ্দানি দেখাতে এসেছিস্—মা-জেঠিকে পুলিশে দিবি! তুই যে আমার বাড়ীতে টেরেস্‌পাস্ করেছিস্, ভদ্রঘরের বৌএর ধম্ম নষ্ট করেছিস্ তার জন্যে তোকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়্‌ব ছাড়্‌ব ছাড়্‌ব!—এই তে সত্যি কর্‌ছি।

গোবিন্দ রাসমণির বক্‌বকানির কোনো উত্তর না দিয়া আভাকে বলিল—বৌদিদি, তুমি চলো আমার বাড়ীতে।

আভা ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল। সে অস্বীকার যে কতখানি দৃঢ় তাহা গোবিন্দ বুঝিতে পারিল, তাই সে আর কোনো অনুরোধ উপরোধ না করিয়া বলিল—তবে এইখানে থেকে মরো। আমি চল্‌লাম পুলিশে খবর দিতে। চোখের সাম্‌নে খুন ত দেখা যায় না।

গোবিন্দ সদর দরজার খিল হড়াৎ করিয়া খুলিয়া বেগে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি? সে কোনো উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কমলা বুঝিয়াছিলেন ব্যাপার কি, তিনি আস্তে আস্তে নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন, আর সকলে কৌতুক দেখিবার ও মজ্‌লিস-জমানো আলোচনার খোরাক সংগ্রহের জন্য পিল-পিল করিয়া রাসমণির বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

কুড়ি

রাসমণি যাহা ঢাকিবার জন্য আভার উপর উৎপীড়ন করিতেছিলেন তাহা সকলের কাছেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আভা মনে করিল এই বারে সে বাঁচিল। কিন্তু তার অনুমান অত্যন্ত মিথ্যা হইয়া গেল। গাঁয়ের প্রত্যেক মেয়ে পুরুষ জানিল, গোবিন্দ ও আভার আলোচনায় গ্রাম সর্‌গরম হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রত্যেকেই রাসমণির আচরণ ও চেষ্টাকেই সমর্থন করিতে লাগিল, সকলেই তাঁর উপর দরদ দেখাইয়া বলিল—সত্যিই ত, বিধবা বৌ, ছেলে কোলে কোরে বেড়াবে নাকি?

সকলের এই সমর্থনে সাহস পাইয়া রাসমণি আভাকে ঔষধ গিলাইবার জন্য নিত্য পীড়ন করিতে লাগিলেন। গ্রামের লোকে পালা করিয়া তাঁকে সাহায্য করিতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দ প্রত্যহই গিয়া তাতে বাধা দিতে লাগিল আর আভাকে তার বাড়ীতে যাইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু আভা কিছুতেই সম্মত হইল না।

বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ একদিন গিয়া থানায় খবর দিল। কিঞ্চিৎ লাভ করিবার আশায় হৃষ্ট হইয়া দারোগা গ্রামে দেখা দিতেই সকলের মুখ চুনপানা হইয়া গেল। রাসমণি গোকুলের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন—গোবিন্দি আমার অমন সব্বনাশ কোরেও তিরিপ্তি হয়নি, আবার দারোগা ডেকে এনেছে—আপনি থাক্‌তে কি শেষে আমরা বে-ইজ্জত হব?

গোকুল তাঁর নেড়া মাথাটি নাড়িয়া বলিলেন—শ দুই টাকা বার কোরে দেবে চলো আমি ঐ গোঁয়ারটাকে কিছুদিনের জন্যে জেলে ঠেলে দিয়ে আস্‌ছি।

—গবা আমাদের ধনে-প্রাণে মজালে—বলিয়া গনগন করিতে করিতে রাসমণি বাড়ী ফিরিলেন।

গাঁয়ের মাতব্বর মোড়ল গোকুল মুখুজ্জে। তিনি হরিনামের ছাপ সর্ব্বাঙ্গে আঁকিয়া হরিনামের মালার ঝুলিটি হাতে লাগাইয়া একখানি তসরের কাপড় ও এক জোড়া খড়ম পরিয়া দারোগার কাছে আসিলেন। দারোগা উঠিয়া নমস্কার করিল। খানিকক্ষণ উভয়ের মৃদু আলাপের পর গোকুল হরিনামের মালার ঝুলির ভিতর হইতে মুঠিকরা হাত বাহির করিয়া দারোগার বিস্তৃত করতলের উপর রাখিলেন. দারোগার হাত অম্‌নি জাঁতিকলের মতন মুঠি বাঁধিয়া পকেটে ঢুকিল। দারোগা হাসিমুখে উঠিয়া গোবিন্দকে বলিল—ভদ্দরলোকের নামে মিথ্যে নালিশ করার মজাটা তোমায় টের পাইয়ে দেবো—তোমায় আমি গেরেপ্তার কর্‌লাম।

গোবিন্দ শুধু একটু হাসিল।

দারোগা বলিল—চৌকীদার, নিয়ে চলো একে হাজতে।

পাড়ার সকল লোক খুব খুসী হইয়া গেল; বিশেষ করিয়া খুসী হইলেন রাসমণি—যাক্‌, এতদিনে কণ্টক বিদায় হইতেছে।

একটি মহিলা রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে ছুটাছুটি গিয়া কমলাকে এই খবর দিল। কমলা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেলেন. কিন্তু তখনি সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন—আমার ছেলে যদি ভালো কাজ কর্‌তে গিয়ে জেলে যায় তাতে আমার লজ্জা, নেই দুঃখও নেই।

কমলা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া গোবিন্দর পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—এতে তোর কিছু লজ্জা নেই বাবা, তোর মা তোকে সহজে কষ্ট পেতে দেবে না।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—আমাকে কদিনই বা এরা আট্‌কে রাখ্‌তে

পারবে মা, বড় জোর একমাস। সে কদিন তুমি বৌদিদিকে দেখো, আর বোলো গোবিন্দ নেই যে তাকে বাঁচাবে, সে যেন তোমার কাছে গিয়েই থাকে।

গোবিন্দকে লইয়া দারোগা চলিয়া গেল, সমস্ত গ্রামটা যেন একটা উপদ্রবের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দারোগার সঙ্গে যাইতে যাইতে গোবিন্দ দেখিল ঠাকুরবাড়ীর রাস-মণ্ডপের উপর একাকী চুপ করিয়া ম্লান মুখে বসিয়া সন্ন্যাসী কি ভাবিতেছে। তার সেই সদা প্রফুল্ল মুখের উজ্জ্বল দীপ্তি যেন নিবিয়া গেছে, তার সুন্দর মুখে কে যেন কালী মাড়িয়া দিয়াছে; তাকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় একটা প্রবল দুশ্চিন্তা তাকে দগ্ধ করিতেছে।

পোষাক-আঁটা দারোগা নানারকম কসরতে নিজেকে নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। গোবিন্দ মাথা উঁচু করিয়া সটান দাঁড়াইয়া রহিল। গোবিন্দকে দেখিয়াই সন্ন্যাসী একটু চমকিয়া উঠিয়া চেষ্টার হাসি হাসিয়া বলিল—কি ভাই গোবিন্দ-বাবু, কোথায় যাচ্ছ?

গোবিন্দ রূঢ় স্বরে বলিয়া উঠিল—ভণ্ড জোচ্চোর কোথাকার! বোসে বোসে লোকের ভক্তি কুড়ুচ্ছ আর পায়ের ধুলো দিচ্ছ; ওদিকে যে গাঁয়ের সকল লোকে মিলে একটা মেয়েকে বধ করছে তার বেলা তুমি একটি কথা বলতে পারো না? ধিক্ থাক্ তোমার সন্ন্যাসে! ঘৃণা করি তোমার ঐ সাধুতার ভড়ংকে! তোমার মতন নিশ্চেষ্ট যে, সে আবার সাধু?

সন্ন্যাসীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, তার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, সে ব্যথিত স্বরে বলিল—আমার কথা গাঁয়ের লোকে শুনবে কেন?

গোবিন্দ চীৎকার করিয়া ধমকাইয়া বলিল—রেখে দাও তোমার

বাজে ওজর! কখনো বোলে দেখেছ? একটু চেষ্টা করেছ? পাপ নিবারণ কর্‌বার জন্যে কী দুঃখ লাঞ্ছনা স্বীকার করেছ তুমি? লোকে যদি তোমার কথা শুন্‌বে না জানো, তবে লোকের মিথ্যা ভক্তি সহ্য করো কি কোরে? মিথ্যা প্রণাম পদাঘাতে প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারো না?

বজ্রগম্ভীর বাক্যের প্রবল বেগে সন্ন্যাসীকে একেবারে নির্ব্বাক ও দারোগাকে স্তম্ভিত করিয়া গোবিন্দ জোরে জোরে পা ফেলিয়া হাঁটিয়া চলিল, যেন দারোগাকেই বন্দী করিয়া লইয়া গোবিন্দ সদর্পে চলিয়াছে।

যে অবধি দারোগা গোবিন্দকে গেরেপ্তার করিয়াছে তখন হইতে তার প্রতি গোবিন্দর পরম উপেক্ষা দারোগাকে কেমন কাবু করিয়া ফেলিতেছিল; গোবিন্দর চারিদিকে এমন একটা সতেজ বলিষ্ঠতা ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছিল যে তার কাছে পুলিশের দারোগাও সঙ্কুচিত হইয়া নিজেকে ক্ষুদ্র দুর্ব্বল অনুভব করিতেছিল, সে গোবিন্দকে বন্দী করিয়া একটি অস্বীকৃত লজ্জায় পীড়িত হইতেছিল। তার পর যে সন্ন্যাসীকে সকলে অমন ভক্তি করে তার মুখের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া চোটপাট শুনাইয়া দিয়া গোবিন্দ তাকে একেবারে থ করিয়া দিয়া গেল দেখিয়া দারোগা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। দারোগা গোবিন্দর পিছনে-পিছনে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল—ইহাকে জব্দ করিতে গিয়া নিজে না ফেসাদে পড়িয়া যাই। যে-রকম শুনিলাম তাহাতে বৌটিকে সাক্ষী মানিলে সব সত্য কথা ফাঁস হইয়া যাইবে; সন্ন্যাসীকে সাক্ষী মানিলে তিনিও ত মিথ্যা কথা বলিবেন না; সবার উপর ইহার মাকে যে রকম দেখিলাম সে ত বড় সোজা মেয়ে নয়। কাজ নাই ইহাকে ঘাঁটাইয়া, আমার যাহা পাইবার তাহা ত পাইয়া গিয়াছি।

দারোগা হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দেখুন গোবিন্দ-বাবু, আপনি ফিরে বাড়ী যান।

১২

গোবিন্দ আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল—অকস্মাৎ ?

দারোগা লজ্জিত হইয়া বলিল—আপনাকে আর বিপদে ফেল্‌তে চাইনে।

—যমের প্রাণীবধে অরুচি ! তবে ফির্‌তে পারি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এর পর বল্‌বেন না ত যে escaped from *lawful* custody ? আপনারা ন্যায়ের অবতার কিনা !

গোবিন্দ lawful ও ন্যায়ের শব্দ দুটি এমন একটু জোর দিয়া উচ্চারণ করিল যে তার খোঁচা দারোগার কঠিন মনেও বিঁধিল। সে লজ্জিত হইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—দেখুন ভদ্রলোকের বাড়ীর কুচ্ছো নিয়ে আপনি হৈচৈ কর্‌ছিলেন তাইতে আপনাকে একটু ভয় দেখাবার জন্যে……

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ভারী ভুল করেছিলেন দারোগা-বাবু। আমাকে গাঁয়ের লোকে নাম দিয়েছে গোঁয়ার-গোবিন্দ, ছেলে বেলায় জুজুর ভয় দেখালে আমি জুজু দেখ্‌বার জন্যেই বিষম বায়না ধর্‌তাম। ভয় কাকে বলে আমি জানিনে।………তা আপনি সরল মনেই ছেড়ে দিচ্ছেন ত ? তবে নমস্কার।

—নমস্কার। কিছু মনে কর্‌বেন না।—বলিয়া দারোগা চলিয়া গেল।

গোবিন্দ মনে মনে বলিল—মনে বিলক্ষণই কর্‌ব, যদি পারি তোমার ঐ ঘুষ খাওয়া বের কোরে ছাড়্‌ব।

গোবিন্দ হনহন করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। দূর হইতে

শুনিল সন্ন্যাসী সেই রাসমঞ্চে বসিয়া করুণ সুরে গান ধরিয়াছে—

আমি বাছিয়া লব না তোমার দান, (তুমি) যাহা দাও তাই ভালো—
তুমি বিষাদের পাশে রেখেছ হরষ, আঁধারের পাশে আলো।
এ প্রাণ-প্রদীপে দুঃখের শিখা
জ্বেলে যদি দাও দহনের টীকা,
অথবা ললাটে এঁকে দিয়ে যাও কাজল-তিলক কালো,
সবো হাসিমুখে, জানি তুমি প্রভু শুভাশিষ শিরে ঢালো!

গোবিন্দ থমকিয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত গানটা শুনিল। তারপর সন্ন্যাসীকে কিছু না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ প্রথমেই বাড়ীতে গিয়া ডাকিল—মা।

কমলা তার গলা শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—কিরে! ফিরে এলি যে?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—দারোগা দেখ্‌লে আমাকে হজম করা সহজ হবে না, তাই ছেড়ে দিলে। যাই একবার বৌদিদিকে অভয় দিয়ে আসি।

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে রাসমণির বাড়ীতে গিয়া ঢুকিল। সৌরভী শিলে নোড়া দিয়া ঔষধ ছেঁচিতেছিল, সে গোবিন্দকে দেখিয়া নিজের হাতের উপরই মথ্‌থম ঘা দিয়া বসিল; রাসমণি সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি নিজের কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—যমের অরুচি আবার জ্বালাতে এল! পুলিশে ধর্‌লে, মনে করেছিলাম নিশ্চিন্দি হলাম!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—কি কর্‌ব জেঠিমা, তোমরা ত চেষ্টায় কসুর করো নি, দারোগা কিছুতেই নিয়ে গেল না।

তার গলা শুনিয়া আভা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া পরম আনন্দে বলিয়া উঠিল—তুমি এসেছ ঠাকুরপো! আমাকে এরা গাঁ-সুদ্ধ ঘিরে রইল, কিছুতেই আমাকে দারোগার কাছে যেতে দিলে না, নইলে...

গোবিন্দ হাসিতে-হাসিতেই বলিল—তুমি গেলেও কিছু ফল হত না, জেঠিমার অনেকগুলি নোট যে দারোগার পকেটে ঢুকেছে!

গোবিন্দ আর কিছু না বলিয়া সৌরভী ও রাসমণির সাম্‌নে বসিয়া শিল হইতে সমস্ত শিকড় বাকড় তুলিয়া লইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। রাসমণি এমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন, যে, তিনি আর দ্বিরুক্তি করিতেও পারিলেন না।

গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছে, ওদিকে গোকুল রাসমণির বাড়ীতে ঢুকিতেছেন, দুজনে একেবারে মুখোমুখি। গোবিন্দকে দেখিয়াই গোকুল চম্‌কাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ! তুই কোথা থেকে!" তাঁর হাতে একটা শিশি ছিল, সেটা সানের উপর ঠস্ করিয়া পড়িয়া ভাঙিয়া গেল, তার ভিতর কি খানিকটা আরক ছিল চারিদিকে উগ্রগন্ধ ছড়াইয়া ছত্রাকার হইয়া গেল। গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—দাদামশায়, বেশ! আপনি না বোষ্টম! প্রাণীহত্যা করা না আপনাদের শাস্ত্রের নিষেধ!

গোকুল তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—দুশ্চরিত্র পাষণ্ড, তোকে দেখ্‌লে পাপ হয়! তোকে আমি একঘরে কর্‌লাম।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—জল্লাদ কশাইদের দলে গোবিন্দ কোনো-দিনই ছিল না।

গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। গোকুল আসিয়া রাস-মণির দালানে চুপ করিয়া বসিলেন। রাসমণিও ঘোমটা টানিয়া বসিয়া রহিলেন। একে একে গাঁয়ের লোক আসিয়া সেইখানে জড়ো হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গোকুল মৃদুস্বরে বলিলেন—গোবিন্দ ত আবার ফিরে এল! যেমন দজ্জাল বৌ তেম্‌নি গুণ্ডা গোবিন্দটা। গাঁ-সুদ্ধু লোক আমরা ত হিমসিম খেয়ে হার মেনে গেলাম। এখন এক কাজ করা যাক। বৌএর বাপ ত ডাক্তার, তাকে আস্‌তে লেখো, সে এসে চুপিচুপি কাজটা চুকিয়ে দিয়ে যাক—এ লজ্জা ত তারও লজ্জা!

কথাটা রাসমণির মনঃপূত হইল, সমস্ত সমবেত লোকেরাও তাহা সমর্থন করিল। তখনি গোকুলের আদেশে মন্মথ রাসমণির জবানিতে দ্বারকেশ্বর ডাক্তারকে তাঁর কন্যার আচরণ বিস্তারিত করিয়া চিঠি লিখিল। অতগুলি লোকের কারো এ জ্ঞান হইল না যে ঐ চিঠি কন্যার পিতাকে লেখা হইতেছে।

চিঠি লেখা হইলে গোকুল বলিলেন—গোবিন্দকে আমি একঘরে করেছি। ওর ধোপা নাপিত ঘাট বন্ধ। কিন্তু ও যে রকম গোঁয়ার তাতে ওর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করা যায় কি কোরে?

মন্মথ বলিল—আমরা রয়েছি দাদামশায়, এ চৌকাঠ ডিঙোলে আমরা ওর ঠ্যাং খোঁড়া কোরে দেবো, ট্রেস্‌পাস করেছে বোলে পুলিশে দেবো।

হারাধন বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ, ওকে দমন করা খুব দর্‌কার। ওর এমন আস্পর্দ্ধা বেড়ে উঠেছে যে ও আজ প্রভুকে মুখের ওপর যাচ্ছেতাই অপমান কর্‌লে!

মন্মথ হাতের কলম ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—সত্যি নাকি! প্রভুকে অপমান কর্‌লে আর তোমরা ওর মাথাটা এখনো আস্ত রেখেছ? আমি ওকে মেরে ভূত ভাগিয়ে না দি ত আমার নাম মন্মথ নয়।

মন্মথ রাগের বেগে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল; আরো যত

যুবক ছিল তারাও মন্মথর সঙ্গে ছুটিল, তারা সকলে মন্মথর দিকে, গোবিন্দকে আজ ঘা-কতক দিবার প্রলোভনে সকলে উন্মত্ত।

তারা গোবিন্দর বাড়ীর সাম্‌নে গিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, কারণ দলপতি মন্মথই থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া আইনের প্রশ্ন করিল—লোকের বাড়ী চড়াও কোরে মারাটা বে-আইনী কি না।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল তাহা বে-আইনী বটে।

তবে গোবিন্দকে মারা যায় কেমন করিয়া?

স্থির হইল তাকে রাস্তায় পাইলে সকলে মিলিয়া আচ্ছা করিয়া ঠেঙাইয়া দিবে।

যখন এই-সব মীমাংসা হইতেছে, তখনই গোবিন্দ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু গোবিন্দকে দেখিয়াই তারা মার মার করিয়া আক্রমণ করিতে পারিল না, পুত্তলিকার মতন নিশ্চেষ্ট দাঁড়াইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তার দিকে চাহিয়া রহিল। গোবিন্দ আজ কোথা হইতে জোগাড় করিয়া একখানা লাল চেলি পরিয়াছে, চেলির লাল চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়াছে; গলায় তার বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, আর আজানুলম্বিত জবাফুলের মালা; কানে একগোছা বিল্বপত্র, কপালে রক্তচন্দনের মস্ত বড় ফোঁটা; তার বাঁ হাতে দড়িতে বাঁধা একটি ছাগশিশু, ও ডাহিন হাতে একখানা চক্‌চকে ধারালো প্রকাণ্ড খাঁড়া সিঁদূরে রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত। সে এই বৈষ্ণব গ্রামের মধ্যে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহমূর্ত্তিতে শাক্ত বেশে আবির্ভূত হইয়া সকলের চমক লাগাইয়া সকলকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। গোবিন্দ তার দরজার কাছে গাঁয়ের যুবকদের ভিড় দেখিয়া তাদের উদ্দেশ্য কতকটা আন্দাজে বুঝিতে পারিল; কিন্তু সে তাদের যেন দেখেই নাই এম্‌নি ভাবে উঁচু করিয়া খাঁড়াটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া

যায় দেখিয়া মন্মথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—এ বেশে তুমি কোথায় চলেছ গোবিন্দ ?

গোবিন্দ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছাগল-বাঁধা দড়িটি একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল—গোকুলচাঁদের মন্দিরে একে বলি দিতে নিয়ে যাচ্ছি।

সকলে কানে হাত দিয়া বলিল—রামঃ! রামঃ! তুমি ক্ষেপেছ নাকি ?

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—ক্ষ্যাপার লক্ষণটা কি দেখ্‌লে শুনি।

মন্মথ বলিল—তুমি না বোষ্টমের ছেলে ? প্রাণীহত্যা কর্‌বে ?

গোবিন্দ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—তোমরাও ত সবাই পরম বোষ্টম ? তোমরা নরহত্যা কর্‌ছ দেখেই ত আমি হাত মক্‌স কর্‌তে যাচ্ছি—নরহত্যা ত চট কোরে কর্‌তে পার্‌ব না, তাই ছাগহত্যা দিয়ে সুরু কর্‌ছি। আর তোমাদের ঠাকুরকে নিবেদন কোরেই আমি একে বধ কর্‌ব, তোমাদের মতন আমি বৃথামাংস ত খেতে পার্‌ব না!

সকলে গোবিন্দর মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গোবিন্দ ঠাকুরবাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

গোবিন্দ যে-রকম গোঁয়ার তাতে সে ঠাকুরবাড়ী রক্তপাতে কলঙ্কিত করিতে পারে এ সম্ভাবনা সকলের মনেই হইতেছিল, কিন্তু যার হাতে খাঁড়া তার হাত হইতে কেউই ছাগশিশুটিকে ছিনাইয়া লইতে সাহস করিল না। গোবিন্দ চক্ষের অন্তরালে চলিয়া গেলে তারা ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া গোকুলকে খবর দিল—সর্ব্বনাশ হল দাদামশায়, গোবিন্দ ঠাকুরবাড়ীতে পাঁঠা কাট্‌তে যাচ্ছে !

"অ্যাঃ!" বলিয়া চম্‌কাইয়া গোকুল দাঁড়াইয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, এই অবিশ্বাস্য কথা তিনি ধারণাই করিতে পারিতেছিলেন না।

মন্মথ বলিল—দাদামশায়, শিগ্‌গির চলুন, এতক্ষণে সে হয়ত সাব্‌ড়ে ফেল্‌লে।

গোকুল তাদের আকর্ষণে চলিতে চলিতে বলিলেন—তোরা কি কর্‌ছিলি? পাঁঠাটাকে কেড়ে নিয়ে ওর মাথাটা কেটে ফেল্‌তে পার্‌লিনে?

মন্মথ বলিল—কি কোরে কাটি দাদামশায়, ওরই হাতে যে খাঁড়া!

গোকুল বুঝিলেন—হঁা, খাঁড়াটা যখন উহার হাতে তখন উহার মাথাটা কাটা সহজ নয়।

গোকুল প্রভৃতি ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া দেখিল গোবিন্দ ঠাকুরবাড়ীর সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া একটা আমের ডাল লইয়া ছাগলটিকে পাতা খাওয়াইতেছে ও তার গায়ে হাত বুলাইতেছে; খাঁড়াখানা তার পাশে পড়িয়া আছে, ছাগলের গলার দড়ি সে খুলিয়া দিয়াছে। গোকুলরা নিকটে আসিতেই গোবিন্দ সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিল —এই নিরীহ জীবটিকে মার্‌তে কিছুতেই হাত উঠ্‌ল না। আমায় দিয়ে প্রাণীবধের মক্‌স চল্‌ল না, আমি আপনাদের দলে থাক্‌বার মোটেই উপযুক্ত নই, আমি একঘরে হয়েই থাক্‌ব দাদামশায়।

মন্মথ তাকে-তাকে আগাইয়া গিয়া খাঁড়াখানা চট করিয়া উঠাইয়া লইল এবং তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল—মেরে তোমার মাথা ভেঙে দেবো, রক্তের সঙ্গে সকল তাতে ইয়ারকি করা বের হয়ে যাবে।

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—তোমাদের উপযুক্ত কাজই কর্‌বে ভাই। তোমাদের গোকুলচাঁদ যে-রকম রক্ত-লোলুপ হয়ে উঠেছেন দেখ্‌ছি তাতে হয় অজাত শিশুর রক্ত, নয় এই পাঁঠার রক্ত, নয় ত নিদেন পক্ষে আমার রক্ত তাঁর চাই বৈকি।

অপমানিত হইয়াও গোঁয়ার-গোবিন্দকে হাসিয়া বিদ্রূপ করিতে দেখিয়া যুবকদের আর আস্ফালন করা চলিল না। কথার বদলে কোঁদল চলে, কোঁদলের বদলে ঘুষিচড় মারা চলে, ঘুষিচড়ের বদলে খুন করা চলে; কিন্তু হাসির বদলে তর্কও চলে না। মন্মথ তবু একটু বল সংগ্রহ করিয়া বলিল—তুমি দুশ্চরিত্র অপবিত্র, তুমি ঠাকুরবাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও।

এই তিরস্কারের কথাগুলা যেমন জোরে বাহির হওয়া উচিত ছিল তেমন বল তাতে বাজিল না। গোবিন্দ হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠাকুরবাড়ীতে এইসব গোলমাল শুনিয়া সন্ন্যাসী মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিল। গোবিন্দর বেশ দেখিয়া সে বুঝিল গোবিন্দর এ বিদ্রোহ-বেশ। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়া গোবিন্দকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল এবং মন্মথর দিকে ফিরিয়া বলিল—ভাই, আমরা সবাই দুশ্চরিত্র, অপবিত্র, কম আর বেশী। তাই ভগবানের মন্দির আমাদের আশ্রয়। তোমরা যাও; মুখুজ্জে মশায়, আপনি যান; গোবিন্দ-বাবু কখনো কোনো অন্যায় করবেন না এ আমি বলছি।

গোবিন্দ সন্ন্যাসীর বাহুবেষ্টন হইতে শরীরের এক মোচড়ে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল—প্রভু, আপনার অনুগ্রহ আর-সবাইকে যত খুসী বিলোবেন, কেবল এই অভাজন গোবিন্দকে আপনার অনুগ্রহে অপমানিত করবেন না।

সন্ন্যাসী অপ্রতিভ হইয়া মাথা নত করিল। আর সকলে কোলা-হল করিয়া উঠিল—মার্ মার্। ওর হাড় গুঁড়ো কোরে তবে ছাড়্‌ব, আমাদের সাম্‌নে প্রভুকে অপমান!

গোবিন্দ একবার সন্ন্যাসী ও একবার সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—প্রভুর ওপর এই শ্রদ্ধা সম্মান শেষ পর্য্যন্ত টিক্‌বে ত? না বুঝে যারা ভক্তি করে, না বুঝে তারাই বেশী অপমান করে।

মন্মথ প্রভৃতি লাফাইয়া আসিয়া গোবিন্দকে ধরিল। গোবিন্দ হাসিয়া এক ঝট্‌কায় সব কটাকে দূরে ছিট্‌কাইয়া দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল। সন্ন্যাসী আদেশের স্বরে বলিলেন—তোমরা কেউ ওঁর গায়ে হাত তুল্‌তে পার্‌বে না।

সকলে প্রভুর অসাধারণ ক্ষমা দেখিয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া তাঁকে প্রণাম করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন গুনগুন করিয়া গান ধরিয়াছে—

ওরে কেই বা আপন কেই বা যে পর
মন জানে রে মন জানে।
শিশু মায়ের মারে মাকেই ধরে
পরের আদর ডর মানে!

একুশ

দ্বারকেশ্বর-ডাক্তার রাসমণির চিঠি পাইয়া প্রথমটা বিশ্বাস করিতেই পারেন না যে তাঁর আভা অমন অন্যায় করিতেই পারে। বার বার চিঠি পড়িয়া অল্পে অল্পে তাঁর সন্দেহ হইতে লাগিল, কিন্তু প্রত্যয় কিছুতেই হইতেছিল না। আধা সন্দেহ ও আধা অবিশ্বাসে তিনি একেবারে পাগলের মতন হইয়া উঠিলেন; তিনি অরুণকে কলিকাতায় রাখিয়া একলাই বাসুদেবপুরে যাত্রা করিলেন; সেখানে যে কলুষের ঘূর্ণী পাকাইয়া উঠিতেছে তার মাঝখানে কোমল মুকুল অরুণকে তিনি লইয়া যাইতে পারিলেন না।

গ্রামে ঢুকিতে দ্বারকেশ্বরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল; যেন তিনিই দুষ্কৃতিতে কলঙ্কিত হইয়া লোকের ঘৃণা ও বিদ্রূপভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। চোরের মতন নিজেকে যথাসম্ভব লোকের দৃষ্টি হইতে

বাঁচাইয়া, তিনি রাসমণির বাড়ীর উঠানে আসিয়া ম্লান লজ্জিত মুখে কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কাকেও ডাকিতে পারিলেন না। পায়ের শব্দ শুনিয়া রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন—কে?

দ্বারকেশ্বর অতি কাতর মৃদু রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—আমি বেয়ান!

তাঁর সাড়া পাইয়াই রায়বাঘিনীর মতন রাসমণি এক লাফে উঠানে নামিয়া তাঁর হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিতে টানিতে বলিলেন—দেখবে এস তোমার কন্যের কীর্ত্তি!

রাসমণি তাঁকে টানিয়া একেবারে আভার সামনে আনিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আভা মাথা নত করিয়া বসিয়া ছিল, বাবার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না।

আভাকে নিরুত্তর অধোবদন দেখিয়াই দ্বারকেশ্বর কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে-কাঁদিতেই বলিলেন—এমন দুর্মতি হবার আগে তুমি বিষ খেয়ে মরতে পারনি?

আভা নতবদনে বসিয়াই রহিল। দ্বারকেশ্বর মাথায় হাত দিয়া সেই-খানে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।

রাসমণি বলিয়া উঠিলেন—অমন হাতাকাতা ছেড়ে বসে পড়লে ত চলবে না। তুমি ডাক্তার, এর একটা বিহিত করো।

এই অপমানের আঘাতে দ্বারকেশ্বর মাথা তুলিয়া রুষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আমি আভার বাবা বেয়ান। আমি ওর আবার বিয়ে দেবো।

দ্বারকেশ্বরের লজ্জা ভদ্রতা ও পিতৃত্ব অপমানের আঘাতে জাগ্রত হইয়া তাঁর হিন্দুয়ানির চিরদিনপুষ্ট সংস্কারকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া তাঁর মুখ দিয়া বলাইল—আমি ওর আবার বিয়ে দেবো!

রাসমণি দ্বারকেশ্বরের কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—সব শেয়ালের এক রা দেখ্‌ছি! গোবিন্দ বলে আমি বিয়ে করব, তুমি বল্‌ছ বিয়ে

দেবো! ইংরিজি পড়্লেই কি এম্নি খিষ্টান হতে হয়! বিধবা মাগীর আবার বিয়ে, কি ঘেন্নার কথা! ওসব আমার বাড়ী থেকে হবে না বল্ছি। তুমি তবে মেয়ে নিয়ে এখুনি চলে যাও।

দ্বারকেশ্বর শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে গোবিন্দ আভাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে। তিনি বলিলেন—গোবিন্দর হাতে একে সঁপে দিয়েই আমি চোলে যাবো······

গোবিন্দ বাড়ী হইতেই দ্বারকেশ্বরের কথা শুনিতে পাইয়াছিল। দ্বারকেশ্বরের কথা শেষ না হইতেই উৎফুল্ল মুখে সে সেখানে আসিল, এবং দ্বারকেশ্বরকে প্রণাম করিল। এতক্ষণ যার হাতে কন্যাসম্প্রদানের সঙ্কল্প করিতেছিলেন তাকে সম্মুখে দেখিয়াই দ্বারকেশ্বর প্রসন্ন না হইয়া রুষ্ট ভৎর্সনার স্বরে বলিয়া উঠিলেন—তুমি যে অত্যন্ত পাজি তা তোমায় প্রথম দিন দেখেই আমি টের পেয়েছিলাম!

গোবিন্দ হাসিমুখে বলিল—সেই হতেই ত আমার দুর্ভাগ্যের সূত্রপাত!

গোবিন্দর হাসি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দ্বারকেশ্বর বলিলেন—আভাকে তোমার বিয়ে কর্তে হবে, অস্বীকার কর্লে আমি তোমার নামে নালিশ কর্ব।

গোবিন্দ তেম্নি হাসিয়াই বলিল—ভয় দেখাবার কিছু দর্কার নেই। গোবিন্দ যা করে স্বেচ্ছায় করে, ভয়ে সে দমে না। প্রথম দিন ত এই বিয়ে কর্বার দুরাশা নিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয় কর্তে গিয়েছিলাম; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে আপনার কন্যাকে পেলাম না, পেলাম গলা-ধাক্কা!

দ্বারকেশ্বর রুষ্ট স্বরেই বলিলেন—তোমার মতন অসৎ অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান কর্তে কোনো মেয়ের বাপ স্বীকার কর্তে পারে না।

গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল—অথচ আজ শুধু স্বীকার নয়, বাধ্য

কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন, যদি অস্বীকার করি নালিশ কর্‌বার ভয় দেখাচ্ছেন, অর্থাৎ কি না, এখন মনে কর্‌ছেন যে, মেয়ে যাকে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাচন করেছে তাকেই কন্যাসম্প্রদান করা ছাড়া উপায় নেই। বাপের নির্ব্বাচনের চেয়ে যার বিয়ে তার নির্ব্বাচনের মূল্য যে বেশী এ কথাটা আগে বুঝ্‌লে এসব দুঃখ ভোগ কর্‌তে হত না।

দ্বারকেশ্বর একটু অপ্রস্তুত হইয়া দমিয়া গিয়া বলিলেন—তা তুমি যত তর্কই করো, কাজটা অত্যন্ত গর্হিত করেছ……

গোবিন্দও একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—আজ্ঞে সেটা স্বীকার করা ছাড়া আর ত এখন আর উপায় নেই……

গোবিন্দর কথা শুনিয়া আভা মাথা তুলিয়া স্পষ্ট কথায় বলিল—যা মিথ্যা তার কলঙ্ক কেন স্বীকার কর্‌ছ ঠাকুরপো? তুমি যে মিথ্যাচারকে ঘৃণা করো।

গোবিন্দ গর্ব্বের আনন্দে হাসিয়া হতাশার দীন স্বরে বলিল—এই মিথ্যা কলঙ্কের পঙ্ক-তিলক যে আমার কাছে সৌভাগ্যের চন্দন-তিলকের মতন স্পৃহণীয়। তোমাকে পত্নীরূপে পাবার বহুদিনসঞ্চিত দুরাশা এতেই যদি সফল হয়ে যায়!

আভা গোবিন্দর বেদনায় ব্যথিত হইয়া আর্দ্র অথচ দৃঢ় স্বরে বলিল—আমি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে পার্‌ব না ঠাকুরপো, তুমি আমাকে কি দ্বিচারিণী কর্‌বে?

গোবিন্দর মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, সে আভার কথায় সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল, তার নিজের স্বার্থান্ধতা তাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। এদিকে দ্বারকেশ্বরের সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিল। তবে আভা কাকে স্বয়ম্বরণ করিয়াছে?

আজকাল মজা দেখিতে রাসমণির বাড়ীতে কখনোই লোকের অভাব

থাকে না, সমস্ত দিনই গাঁয়ের মেয়ে পুরুষ আসিতেছে যাইতেছে; দ্বারকেশ্বর আসিয়াছেন খবর পাইয়াই পাড়া ঝাঁটাইয়া সকলে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বারকেশ্বর নিরুপায় বিপন্নের ন্যায় সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া আভার দিকে চাহিলেন; আভা সমস্ত জনতার মধ্যে অকুণ্ঠিত হইয়া মাথা সোজা করিয়া বসিয়া আছে, সে শ্বশুর-ভাসুর-সম্পর্কীয় পুরুষদের দেখিয়াও মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দ্যায় নাই। এই বিপুল জনতার মধ্যে কোন্ লোকটি যে আভার স্বয়ম্বৃত স্বামী তাহা জানিবার জন্য দ্বারকেশ্বরের কৌতূহল তাঁকে পীড়া দিতেছিল, কিন্তু সেই প্রশ্ন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁর লজ্জায় বাধিতেছিল। তাঁকে অব্যাহতি দিয়া গোকুল বলিয়া উঠিলেন—গোবিন্দ নয় ত আবার কে?

গোবিন্দ একবার কটমট করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মন্মথর দিকে তাকাইল। আভা স্পষ্ট অসঙ্কোচে বলিল—সে আমি বল্‌ব না।

দ্বারকেশ্বর অত্যন্ত কাতর হইয়া আভার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—লক্ষ্মীটি বলো মা। এই অপমান এই লজ্জা বিবাহে ঢাকা পড়ুক।

আভা ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ় ভাবে বলিল—সে আমি কিছুতেই বল্‌তে পার্‌ব না।

এই অভাবনীয় উৎকট ব্যাপারে সকলের লজ্জাসরম ঘুচিয়া গিয়াছিল; যে রাসমণি গোকুলের সাম্‌নে বাহির হইতেন না, কেবল মাত্র ঝগড়ার দর্‌কার হইলে ঘোম্‌টার আড়াল হইতে ঝগড়া করিতেন, তিনিও আজ সকলের সাম্‌নে ঘোম্‌টা খুলিয়া উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন—ও তেমন সোজা মেয়েই নয় যে এক কথায় কথা শুন্‌বে! ও একবার 'না' বল্‌লে আমার মতন লোকও ওকে হাঁ বলাতে পারে না, হার মেনে যায়। তবে এক উপায় আছে যদি প্রভু এসে আদেশ করেন।

আভা ব্যাকুল হইয়া শ্বেতপদ্মের কলির মতন দুই হাত জোড় করিয়া

ছলছল চোখে মিনতি করিয়া বলিল—না না, তাঁকে আপনারা এর মধ্যে জড়াবেন না; আমি তাঁর সাম্‌নে বেরুতে পার্‌ব না।

পাষাণের মতন দৃঢ় আভার উদ্বেগ আকুলতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দ্বারকেশ্বর বলিলেন—প্রভু লোকটি কে?

গোকুল বলিলেন—সে একজন মহাপুরুষ! .....

গোবিন্দ বলিয়া উঠিল—ভণ্ড সন্ন্যাসী একটা!

দ্বারকেশ্বর সেই সন্ন্যাসীর প্রতি কন্যার শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া একটু মর্ম্মাহত হইলেন; তাঁর স্নেহ অভিমানে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি পিতা, তাঁর চেয়েও আভা এই একটি অচেনা অজানা সন্ন্যাসীকে বেশী ভয় করে লজ্জা করে, তার অনুরোধ অবহেলা করিতে কাতর হইতেছে। তিনি আভার ব্যাকুলতায় দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া বুঝিলেন সেই লোকটি আসিয়া বলিলেই সকল রহস্যের মীমাংসা হইতে পারিবে। তখন তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিলেন—তবে তাঁকেই ডাকা হোক।

তাঁর বলিবার অপেক্ষা ছিল না, অনেক আগেই মন্মথ হারাধন প্রভৃতি গ্রামের যুবকেরা দারুণ কৌতুক ও কৌতূহলের তাগাদায় সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইতেই সমস্ত লোক দাঁড়াইয়া উঠিল, আভাও দাঁড়াইয়া উঠিল, দেখাদেখি দ্বারকেশ্বরও দাঁড়াইলেন। দ্বারকেশ্বর দেখিলেন এই সন্ন্যাসীর অঙ্গে গেরুয়া কাপড় বা ছাইভস্ম নাই, তিলক-ছাপা বা জটা শিখাও নাই; সাধারণ মোটা একখানা ধোয়া থান ধুতি পরণে, ও একখানা থানের চাদর গায়ে। তিনি দীর্ঘ ঋজু একহারা; যৌবনের অন্তসীমায় উপস্থিত হইলেও তাঁর চেহারাটি চমৎকার তরুণ সুকুমার আছে; তাঁর শ্যামবর্ণের এমন একটি ললিত লাবণ্য ও দীপ্তি আছে যে তাতে মন মুগ্ধ হয়; সুন্দর চোখ দুটি

মণিদর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল, একটি নিগূঢ় বেদনায় যেন আর্দ্র করুণামাখা। তাঁর মুখে এমন একটি শিশুর মতন সরলতা ও রমণীর মতন কমনীয়তার সঙ্গে ভাবুকতার আবেশ ও নিষ্ঠার দৃঢ়তা দীপ্যমান যে তাঁর কাছে একেবারে আপনাকে বিকাইয়া দিতে ইচ্ছা করে। সেই অপরূপ আশ্চর্য্য তরুণ সন্ন্যাসীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়াই সকল বৃদ্ধ বালক যুবা মেয়ে পুরুষ তাঁর পায়ের কাছে ভিড় করিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিতে লাগিল আর তিনি অত্যন্ত কুণ্ঠিত বিব্রত হইয়া হাত জোড় করিয়া একটু নত হইয়া সেই অযাচিত প্রণামের সম্মান রক্ষা করিলেন। সকলের দেখাদেখি দ্বারকেশ্বরও তাঁকে প্রণাম করিয়া পাশে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পথ মুক্ত দেখিয়া সকলের শেষে আভা কুণ্ঠিত মৃদু চরণে একটু আগাইয়া আসিল, তারপর গলায় আঁচল দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। যে অবধি তার চারিদিকে সংক্ষোভের আবর্ত্ত ফেনাইয়া উঠিয়াছে সেইদিন হইতে সে সন্ন্যাসীর কাছে যাইতে পারে নাই। আজ সমস্ত কলঙ্কের ও লজ্জার পসরা মাথায় করিয়া সে তাঁর সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল করুণাকাতর দৃষ্টিতে আভার দিকে চাহিয়া থাকিলেন। তারপর ছলছল চোখে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—আভা, এঁরা জান্‌তে চাচ্ছেন কে তোমাকে কলঙ্কিত করেছে।

আভা হাত দুখানি জোড় করিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল; তার চোখ দিয়া শত লাঞ্ছনাতেও জল পড়ে নাই, এখন তার দুই চোখ দিয়া ধারা বহিতেছে। সে বলিল—আমি তা বল্‌তে পার্‌ব না, আপনি আমাকে আদেশ কর্‌বেন না।

আভার চোখে জল দেখিয়া সন্ন্যাসীরও চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মন্মথ ও হারাধন বলিয়া উঠিল—আহা!

প্রভুর কি দয়া ! স্বয়ং চৈতন্য-দেবের অবতার ! পতিতকেও ঘৃণা নেই—পতিতপাবন !

সন্ন্যাসী আভাকে বলিল—আমি তোমাকে আদেশ কর্‌তে পারি না, অনুরোধ কর্‌ছি, বলো তুমি তার নাম। সে যদি নিজে সাহস কোরে তোমার সঙ্গে অপমান কলঙ্ক বরণ কর্‌তে না পারে, তবে তুমি সেই অবোধকে তার কর্ত্তব্য বুঝিয়ে দাও।

আভা মাথা নাড়িয়া বলিল—না না, সে আমি পার্‌ব না, কিছুতেই পার্‌ব না, আপনি বল্‌লেও পার্‌ব না।

সন্ন্যাসী বলিল—সকলে গোবিন্দকে যে অপরাধী কর্‌ছে ? তা কি সত্য ?

—মিথ্যা মিথ্যা একেবারে মিথ্যা। সে যে কতবড় মিথ্যা আপনার ত অগোচর নেই। আপনি ত তাকে ভালো কোরেই চেনেন।

আভার এ কথা শুনিয়া মন্মথ ও হারাধন শ্লেষ ও ব্যঙ্গের স্বরে বলিয়া উঠিল—প্রভুর ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব নখদর্পণে, তিনি অবশ্যই জানেন গোবিন্দ কেমন সাধু !

গোবিন্দর ইচ্ছা হইল মন্মথ ও হারাধনের মাথা দুটা দুহাতে ধরিয়া আর-একবার খুব জোরে ঠোকাঠুকি লাগাইয়া দ্যায়। কিন্তু সে একবার তাদের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল।

গোকুল বলিয়া উঠিলেন—প্রভু ত ত্রিকালজ্ঞ, আপনিই বোলে দিন না সেই পাষণ্ডটার নাম।

সন্ন্যাসী একটু স্তব্ধ হইয়া মাথা নত করিয়া ভাবিল, একবার আভার মুখের দিকে চাহিল। সকলে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল সন্ন্যাসী এইবার কাহার নাম না-জানি বলিবেন। কিন্তু হঠাৎ আভা সন্ন্যাসীর পায়ের উপর গিয়া পড়িল এবং অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি

সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল—আপনার পায়ে পড়ি, আপনি কিছু বল্‌বেন না, আপনি চোলে যান এখান থেকে।

সন্ন্যাসী অশ্রুধৌত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আভার দিকে তাকাইয়া একটু নত হইয়া দক্ষিণ হাত তার মাথায় রাখিল; তারপর হঠাৎ ফিরিয়া সেখান হইতে ভিড় ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

মাটিতে সন্ন্যাসীর যেখানে পা ছিল সেখানে মাথা ঠেকাইয়া আভা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত জনতা একেবারে অবাক অস্পন্দ! সকলেই ভাবিতেছিল, এ কী দস্যু মেয়ে রে বাবা, যার কাছে প্রভুকে পর্য্যন্ত পরাভব মানিয়া পলায়ন করিতে হইল!

সকলের আগে মুখ ফুটিল রাসমণির। তিনি দ্বারকেশ্বরকে বলিলেন—বেয়াই, দেখ্‌লে ত তোমার মেয়ের কাণ্ডখানা! এখন তোমার মেয়েকে নিয়ে তুমি আলায় আলায় পথ দ্যাখো।

দ্বারকেশ্বর বেহানের এই অপমানের উত্তরে বলিতে পারিলেন না যে, হ্যাঁ আমার মেয়ে আমি লইয়া যাইব বৈ কি? তাঁর মনে হইতে লাগিল, এই পাপের দৃষ্টান্ত অরুণের সাম্‌নে কেমন করিয়া ধরিবেন? সে শিশু, এখন যদিও কিছু বুঝিবে না, কিন্তু পাপের ছোঁয়াচ যে বড় ভয়ানক, তাতে কিছুই যে অম্লান থাকিতে পারে না। তিনি কন্যা ও পুত্রের স্নেহের দোটানায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন।

তাঁকে নির্ব্বাক দেখিয়া রাসমণি আবার বলিলেন—একটু জল খাবার এনে দি; খেয়ে যাও। এই সন্ধ্যের গাড়ীতেই তুমি তা হলে মেয়েকে নিয়ে কল্‌কাতা চোলে যাও।

দ্বারকেশ্বর স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই করিতে না পারিয়া অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতেছিলেন। আভা তাঁহাকে মুক্তি দিয়া মাটি হইতে মাথা তুলিয়া বলিল—আমি এ গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাব না।

রাসমণি মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিলেন—এ গাঁয়ে যদি এত মধু তবে বাজারে ঘর ভাড়া নিয়ে সদাব্রত খোলোগে—আমার বাড়ীতে থেকে ও-সব বাষ্টমো চল্‌বে না।

আভা ধনুক-ছাড়া বাণের মতন চক্ষের পলকে সোজা হইয়া দাড়াইয়া উঠিল। তারপর একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ভৎ‍ঁসনা ভরিয়া শাশুড়ীর দিকে তাকাইয়া বাড়ী হইতে দৃঢ়পদে বাহির হইয়া গেল। এতদিনের উৎপীড়ন লাঞ্ছনা সহিয়া আভা শাশুড়ীর বাড়ীতেই পড়িয়া ছিল, গোবিন্দর কাতর অনুনয় ও অনুরোধেও এই বাড়ী সে ত্যাগ করিতে চাহে নাই। কিন্তু আজ শাশুড়ীর মুখে অকথ্য অপমানের আঘাত সে আর সহ্য করিতে পারিল না, সে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

তার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দও বাহিরে গিয়া দেখিল আভা হনহন করিয়া ঠাকুরবাড়ীর দিকে চলিয়াছে। গোবিন্দ ছুটিয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বৌদি, কোথায় যাচ্ছ ?

আভা না ফিরিয়াই বলিল—ঠাকুরবাড়ীর অতিথ-শালার সাম্‌নের বটগাছতলায়।

আজ গোবিন্দ আভার হাত ধরিল। মিনতি করিয়া বলিল—তুমি আমার বাড়ীতে চলো বৌদি।

আভা মাথা নাড়িয়া বলিল—তোমাকে আর বিপদে ফেল্‌ব না; আমার জন্যে তুমি ঢের সয়েছ !

গোবিন্দ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—তোমার জন্যে যেটুকু দুঃখ সইতে পেয়েছি সেইটুকুই ত আমার এই ব্যর্থ জীবনটার চরম পুরস্কার ! আমাকে সেই গৌরব থেকে বঞ্চিত কোরো না।

আভা গোবিন্দর কথায় ব্যথিত হইয়া মমতায় নম্র হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—খুড়িমা কি আমায় নিতে চাইবেন ?

গোবিন্দ গর্ব্বিতভাবে বলিল—আমার যে তিনি মা, তিনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।

আভা বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতেই সমবেত সকল মেয়েপুরুষ গোবিন্দর পিছে পিছে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল; গোবিন্দ আভাকে ফিরাইয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিতেছে শুনিয়াই মন্মথ আর হারাধন দৌড়িয়া গোবিন্দর মাকে সতর্ক করিতে গিয়াছিল, যেন তিনি ঐ কুলটা স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান না দেন। সকল লোক আভার দুর্দ্দশা দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল, আসেন নাই কেবল কমলা, তিনি বাড়ীর দরজার কাছেই গোবিন্দর ফিরিবার প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া ছিলেন। মন্মথ ও হারাধন ছুটিয়া গিয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা তাঁকে বলিতেই তিনি দ্রুত বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আভার কাছে গিয়া তাকে একহাতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া স্নেহার্দ্র স্বরে ডাকিলেন—চলো মা, বাড়ীতে চলো।

আভা কমলার কাঁধে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আভা গোবিন্দর বাড়ীতে আশ্রয় পাইল দেখিয়া দ্বারকেশ্বর নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিলেন; তিনি গোবিন্দর বাড়ীতে গিয়া তার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন —তুমি আভার জন্যে অনেক করেছ শুনলাম। আভা তোমার আশ্রয়ে রইল জেনে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চললাম, অরুণকে একলা রেখে এসেছি।

গোবিন্দ দ্বারকেশ্বরকে হঠাৎ তার উপর প্রসন্ন হইয়া উঠিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান, বৌদিদির কোনো কষ্ট আমি হতে দেবো না।

দ্বারকেশ্বর কন্যাকে আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নীরবে তার দিকে চাহিয়া জানাইলেন, তিনি যাইতেছেন।

আভাও কিছু না বলিয়া বাবাকে শুধু একটি প্রণাম করিল।

বাইশ

গোকুলচাঁদ ঠাকুরের যিনি সেবায়েত মোহান্ত, তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; সন্ন্যাসীকে তিনি নিজের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া মারা গেছেন। আজ রাসপূর্ণিমার দিন গদীতে সন্ন্যাসীর অভিষেক হইবে, এবং আজ গ্রামের বহু নরনারী তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিবে স্থির হইয়াছে।

প্রত্যুষেই সমস্ত গ্রাম জাগ্রত হইয়াছে ; সকল মেয়ে পুরুষ গঙ্গাস্নান করিয়া শুচি পট্টবস্ত্র পরিয়াছে ; কেহ ফুল তুলিতেছে, কেহ চন্দন ঘষিতেছে, কেহ মালা গাঁথিতেছে, কেহ নৈবেদ্য সাজাইতেছে ; কে কোন্ ফুল দিয়া সন্ন্যাসীর চরণ পূজা করিবে তাহা স্থির করিয়া বাছিয়া বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিতেছে।

সন্ন্যাসীও আজ অতি প্রত্যুষে স্নান করিয়া রাসমঞ্চের সম্মুখে আসিয়া বসিয়াছে। তার চেলারা মোহান্তর ভাণ্ডার হইতে নূতন গরদের জোড় বাহির করিয়া তাকে সাজাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করে নাই, সেই চিরকেলে থান ধুতি আর থান চাদর আজকের গদীতে অভিষেকের ও গুরুপদে বরণের দিনেও তার পরিচ্ছদ। ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সন্ন্যাসী গাহিতেছিল—

তুম্হরে কারণ সব সুখ ছোড়িয়াঁ
অব্ মোহে কেঁও তরসাও ?
বিরহ-বিথা লাগি উর-অন্দর
পীতম, সো তুম আয়ো বুঝাও।
অব্ ছোড়িয়াঁ নহি বনে প্রভুজী,
তুম্ চরণন পাশ বুলাও,
মীরা দাসী জনম-জনমকী

অঙ্গস্থ অঙ্গ লগাও।
মম চিত্তস্থ চিত্ত লগাও!

আজকের দিনে আভাও নিশ্চিন্ত নাই। তার একটি মেয়ে হইয়াছে; সে ভোরে উঠিয়া নিজে স্নান করিয়াছে, নিজের শিশুটিকে জল গরম করিয়া স্নান করাইয়াছে; আজ সেও তার মেয়েটিকে একটি লাল শাটিনের জামা পরাইয়া, কাজল টিপ দিয়া সাজাইয়াছে।

আজকার এই উৎসবের দিনে উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল না কেবল গোবিন্দর আর কমলার; কমলার উৎসাহ ছিল না—তিনি একঘরে, সকলের সঙ্গে মিলিতে পাইবেন না বলিয়া; আর গোবিন্দর উৎসাহ ছিল না সে ঐসব হুজুককে শ্রদ্ধা করিতে পারিতেছিল না বলিয়া। গোবিন্দ যথাসময়ে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল আভা কন্যাকে কোলে লইয়া আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের স্বাভাবিক মণ্ডনে অপরূপ শোভায় ঝলমল করিতেছে। গোবিন্দ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—ওকি বৌদি! তুমিও প্রভুর কাছে দীক্ষা নিতে যাবে নাকি?

আভা স্মিত মুখ নত করিয়া বলিল— হ্যাঁ।

—তুমি ত ঠাকুরবাড়ীতে উঠতে পাবে না, তুমি যে অস্পৃশ্যা।

—ঠাকুরবাড়ী ছোঁব না, দূরে দাঁড়িয়ে দীক্ষা নিয়ে আসব।

—প্রভু অস্পৃশ্যাকে দীক্ষা দেবেন?

—না দ্যান, অমনি ফিরে আসব—আমি কেন চেষ্টার ত্রুটি করব?

—তুমি এইসব দীক্ষা-ফিক্ষা ক্লীং শ্রীং মন্তর মানো?

—অন্যের মুখে সে সব মানিনে, কিন্তু প্রভু যদি দয়া কোরে আমায় দীক্ষা দ্যান তবে সেই মন্ত্র আমি মানব।

গোবিন্দ এতক্ষণ প্রভু শব্দটাকে ব্যঙ্গ করিয়াই উচ্চারণ করিতেছিল; কিন্তু আভা সেই শব্দটিকে এমন পরিপূর্ণ ভক্তির সহিত উচ্চারণ করিল

যে তার মনে আঘাত লাগিবার ভয়ে গোবিন্দ সন্ন্যাসীর আর কোনো উল্লেখ না করিয়া বলিল—কথা শোনো বৌদি, আজকের দিনে তুমি বাইরে যেয়ো না।

আভা মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—কেন? আজকের এই শুচিতার মাঝখানে আমার পঙ্কিলতা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠবে? তাই ত আমি চাই। আমার যেটা জীবনের সবার চেয়ে গর্ব্বের আর গৌরবের জিনিস সেই কলঙ্কতিলক ত আজকের দিনেই লোককে আমি দেখাতে চাই।

গোবিন্দ আর তর্ক করিল না, বলিল—তবে আমি তোমার রক্ষী হয়ে সঙ্গে যাব, আমি না আসা পর্য্যন্ত তুমি ঠাকুরবাড়ীতে যেয়ো না।

গোবিন্দ তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে গোবিন্দ ফিরিয়া আসিল। তাকে দেখিয়া ত আভা হাসিয়াই খুন। সে মুসলমান-পাড়া হইতে একটা রঙিন লুঙ্গি, একটা ফতুয়া ও একটা লাল ফেজ টুপি সংগ্রহ করিয়া পরিয়া আসিয়াছে। তার এই মুসলমানী বেশ দেখিয়া কমলা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কি রে!

গোবিন্দ হাসিয়া বলিল—গুরু-ঠাকুরের দেখেই বুঝতে পারা চাই ত যে এই শিষ্যটি কিরকম ভক্তিমান! ভেক নইলে পরিচয় পাবেন কেমন কোরে?

কমলা পুত্রের অদ্ভুত বিদ্রোহ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন; আভাও তার উপর রাগ করিতে পারিল না, সেও খুব হাসিতে লাগিল।

গোবিন্দ বলিল—এইবার চলো বৌদি। যেমন তুমি অস্পৃশ্যা, তোমার সেথোও তেমনি অস্পৃশ্য!

যাইবার ঠিক সময় যখন আসিল তখন যাইতে হইবে ভাবিয়া আভার মুখ আবার মলিন হইয়া গেল, বহুকাল পরে আজ আবার

কন্যাকে কোলে করিয়া লোকের সম্মুখে বাহির হইতে তার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু সে তাহা দমন করিয়া মেয়েকে কোলে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর দৃঢ় পদক্ষেপে ঠাকুরবাড়ীর দিকে চলিল। গোবিন্দ একগাছা বাঁশের লাঠি উঠাইয়া লইয়া আভার পিছনে পিছনে গেল।

আভা ও গোবিন্দ ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনীর বাহিরে দূরে গিয়া দাঁড়াইল। তারা দেখিল প্রশস্ত চাঁদনীর মেঝে ফুল নৈবেদ্য অর্ঘ্যপাত্র বস্ত্র সিধা প্রভৃতিতে ভরিয়া গিয়াছে; চাঁদনীর থামে থামে ফুলের মালা, সোলার ফুল ঝারা পাখী ফানুষ লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে; চাঁদনীর মধ্যস্থলে সন্ন্যাসীকে মোহান্তের গদীতে অভিষেকের জন্য একখানি মৃগচর্ম্মে-আচ্ছাদিত চন্দন-কাঠের সিংহাসন পাতা হইয়াছে, সিংহাসনের উপরে গেরুয়া রঙের গরদের চন্দ্রাতপ। সিংহাসনের সম্মুখে রূপার ঘটে তীর্থবারি, কর্পূর-দীপ, ধূপদানী রাখা হইয়াছে। মোহান্তের চেলারা সিংহাসনের দুপাশে দুজন গেরুয়া রঙে ছোপানো চামর, দুজন গেরুয়া ছত্র, ও দুজন মুক্তার ঝালর-দেওয়া অভ্রের তৈয়ারি আড়ানি পাখা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশপাশের অনেক গ্রামের সমস্ত মেয়ে পুরুষ বালক বালিকা আসিয়া জমা হইয়াছে; মন্দিরের সম্মুখের মাঠে বটগাছতলায় দোকান পসার মেলা লাগিয়াছে; জনস্রোত অবিশ্রাম বহিয়া আসিতেছে। চারিদিকে কলরব, অবিশ্রান্ত কোলাহল।

আভা ও গোবিন্দকে ঠাকুরবাড়ীর সীমানায় দেখিয়া কোলাহল আরো বাড়িয়া উঠিল। তাদের দুজনের নাম কলঙ্কে জড়িত হইয়া গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছিল; আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য সকল লোক তাহাদিগের কাছেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল; সকলেই তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় অশ্রাব্য কথায় ধিক্কার দিল। আজ তারা সমস্ত লোককে

গোকুলচাঁদের রাস, নূতন মোহান্তের অভিষেক, সন্ন্যাসী প্রভুর মাহাত্ম্য, মেলায় বেচা কেনা ভুলাইয়া দিয়া তাদের কাছে নিজেরাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সেই জনতার কৌতূহল ও ধিক্কার সহ্য করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা অসহ্য বোধ হইতেছিল বলিযাই আভা জোর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; আভা আছে বলিয়া গোবিন্দও রহিল।

এ সকলের দিকে কিন্তু সন্ন্যাসীর লক্ষ্য ছিল না, সে ঠাকুরের দিকে মুখ করিয়া হাত জোড় করিয়া মধুর কণ্ঠে ভাবগদ্গদ হইয়া গাহিতেছিল—

জ্ঞানের অগম্য তুমি, প্রেমেতে ভিখারী—প্রভু প্রেমের ভি॰

কোথা রইল ছত্রদণ্ড, কোথা সিংহাসন,
কাঙালের সভার মাঝে পেতেছ আসন গো
কোথা রইল ছত্রদণ্ড, ধূলাতে লুটায়,
পাতকীর চরণ-রেণু উড়ে পড়ে গায়,
পতিতের চরণ-রেণু শোভে তোমার গায়!
জ্ঞানের অগম্য, প্রেমে দাসের অনুদাস,
সবার চরণতলে প্রভু তোমার বাস।
তুমি প্রেমের ভিখারী!

সন্ন্যাসীর গানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিয়া তাঁর চেলা শিষ্য ও দর্শক ভক্তেরা দাঁড়াইয়া ছিল। সন্ন্যাসী গীত বন্ধ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর জনতার দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া সন্ন্যাসী মোহান্তের গেরুয়া-ঢাকা মৃগচর্ম্ম-পাতা চন্দনকাঠের সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চেলারা শঙ্খ ঘণ্টা তীর্থজলের ঘট কর্পূরদীপ ধূপদান তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল; প্রধান চেলা তার ললাটে গোপীচন্দনের তিলক দিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল।

হঠাৎ সন্ন্যাসীর দৃষ্টি পড়িল যেখানে কুণ্ঠিত প্রফুল্ল মুখে আভা কন্যাকে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তার পিছনে জ্বলন্ত রোষ রুদ্ধ রাখিয়া উগ্র বিদ্রোহের প্রতিমূর্ত্তির মতন গোবিন্দ চোখ পাকাইয়া স্তব্ধ হইয়া সন্ন্যাসীর দিকেই দেখিতেছে। ইহা দেখিয়াই সন্ন্যাসী অভিষেকের তিলক দানে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—আমার কিছু বল্‌বার আছে!

সকল লোক স্তব্ধ উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী একবার চারি-দিকে চাহিয়া চাঁদনী হইতে নামিয়া যেখানে আভা ও গোবিন্দ দাঁড়াইয়া ছিল বরাবর সেইখানে গেল। একেবারে আভার পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী বলিল—এই দুটি লোককে আপনারা অপবিত্র মনে কোরে দূরে রেখেছেন। আমিও পবিত্র নই। এই কন্যা আমার, আভা আমার গন্ধর্ব্ব বিবাহের পত্নী!.....

সমস্ত জনতার মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, সকলে স্তম্ভিত আড়ষ্ট! সন্ন্যাসী বলিতে লাগিল—আমি এতদিন পসার আর প্রতিষ্ঠার মোহে, মোহান্তগিরির লোভে ভীরু কাপুরুষের মতন এ কথা স্বীকার কর্‌তে পারিনি। আমার পাপে অবলাকে উৎপীড়িত দেখে অন্তরে অন্তরে পীড়িত হয়েছি, কিন্তু দুর্ব্বল আমি প্রতীকার কর্‌তে পারিনি। পাছে আমার এই প্রতিষ্ঠার হানি হয়, তাই ভেবে আভা সকল দুঃখ লাঞ্ছনা কলঙ্ক নিজে বহন করেছে। আমি আজ আমার এই মহৎ প্রতিষ্ঠার দিনে আমার সমস্ত মহৎ অপরাধের মহৎ প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছি এই স্বীকার কোরে যে আমি ভক্তির অপাত্র অভাজন অপবিত্র। আজ এই পঙ্ক-তিলকে অপমানের সিংহাসনে আমার অভিষেক হোক!.....

জনতা ক্ষুব্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল—বেটা ভণ্ড! জোচ্চোর! মেরে বেটার মাথার খুলি ফাটিয়ে দে!

মন্মথ ও হারাধন একেবারে রুখিয়া মার মার করিতে করিতে সাম্‌নে

আসিয়া পড়িল—গোবিন্দর কথাই ঠিক দেখ্‌ছি, বেটা ভণ্ড জোচ্চোর! গোবিন্দকে আমরা মিছে দোষ দিতাম! গোবিন্দ, দাঁড়িয়ে দেখছ কি? মারো বেটাকে!

গোবিন্দ সম্মুখে আসিয়া পথ আগ্‌লাইয়া লাঠি তুলিয়া বলিল—খবরদার!

মন্মথ আর হারাধন গোবিন্দর জটিল চরিত্র কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া অবাক আশ্চর্য্য হইয়া থম্‌কিয়া চুপ। পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী সংক্ষুব্ধ জনতার উদ্ধত আক্রমণে বিচলিত না হইয়া গোবিন্দর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল—এই একটিমাত্র লোক যে আমাকে প্রথম দিনই চিনেছিল, আমাকে ভণ্ড জোচ্চোর ওয়ারেণ্টের ফেরারী আসামী বোলে ধর্‌তে পেরেছিল। আমি বাস্তবিকই ওয়ারেণ্টের ফেরারী আসামী। আমি গণেশগঞ্জের স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলাম; আমার নাম নির্ম্মলচন্দ্র মজুমদার। সেখানকার জমিদার এক ভদ্রলোকের কন্যার জন্য লোলুপ হয়ে তাঁর বাড়ীতে ডাকাতি করে; ভদ্রলোক মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে বেঁচে-ছিল, কিন্তু একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়; আমার কাছে তখন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ছাত্রদের ফি আর স্কুলের তহবিল মিলিয়ে সাতশো টাকা ছিল; আমি তাই দিয়ে সেই ভদ্রলোকদের সে গ্রাম থেকে পালিয়ে ইজ্জত বাঁচাবার উপায় কোরে দি; তাইতে জাতক্রোধ হয়ে জমিদার আমার নামে তহবিল তস্রুপের নালিশ করে; আমি মনে করেছিলাম টাকাটা আমি কোথাও থেকে ধার নিয়ে তহবিল পূরিয়ে দেবো আর মাইনে থেকে ক্রমে ক্রমে ধার শোধ করব; কিন্তু জমিদার সে তল্লাটে আমার ধার পাওয়া অসম্ভব কোরে দিলে; তখন আমি রাতারাতি পালিয়ে এলাম। ওয়ারেণ্ট এখনো আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। এইবার ধরা দিয়ে কোনো অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত বাকী রাখ্‌ব না।

গোবিন্দ হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—গুরুদেব, আমি আপনার কাছে সত্য-মন্ত্রের দীক্ষা পেলাম। পরিপূর্ণ মহিমার মাঝখানে নিজের ক্ষতিকর সত্য স্বীকার করবার শিক্ষা লাভ করলাম। আমি আপনাকে ভুল বুঝে যত কটু কথা বোলে অপমান করেছি তা আজ মার্জ্জনা করুন।

নির্ম্মল তাকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ভাই, তুমিই আমার গুরু। তোমার সাহস আর প্রেমের নিষ্ঠাই আমাকে অভয় শিক্ষা দিয়েছে। কলঙ্কের পঙ্ককে যে তিলক করতে পারলাম তা তোমারি দৃষ্টান্তে।

গোবিন্দর আনন্দ-উদ্বেলতা মুখে চোখে ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। সে হাসিমুখে বলিল—তবে কারোই কারো গুরু হয়ে কাজ নেই। আপনি দাদা, আমি ভাই—দুইই সমান কলঙ্কিত। আর তবে এইসব শুচি লোকের সঙ্গে কাজ কি? আমার কলঙ্ক-লাঞ্ছিত ঘরেই কলঙ্কিত সন্ন্যাসীর আজ সংসারাশ্রম আরম্ভ হোক। আমার হাজার-কতক টাকা পুঁজি আছে—তাতে আপনার ঋণশোধ আর ঘরকন্না পাতা এক রকমে হয়ে যাবে।

আভা এতক্ষণ সুখের আনন্দের আতিশয্যে শুধু চোখের জলে তাহা প্রকাশ করিতেছিল, এখন গোবিন্দর কথা শুনিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া হাসিয়া বলিল—তোমার টাকার চেয়ে তোমার কাছ থেকে অনেক বড় যৌতুক আমরা পেয়েছি ঠাকুরপো; ঐ টাকায় আমার জায়ের ঘরকন্না পাতা হবে।

গোবিন্দ ম্লান ভাবে হাসিয়া বলিল—না বৌদি, তোমার এই সবার-ঘৃণিত হতভাগা ঠাকুরপোটিকে তোমাদেরই পরিবারভুক্ত কোরে নিয়ো—তোমার ছেলেমেয়েদের একটি খেলুড়ের ত দরকার হবে!

আভার এই বিবাহ-দিবসের মহামহোৎসবের সমারোহ ও আনন্দ গোবিন্দর নিরাশাকাতর ব্যথিত কথায় বড় করুণ ও ম্লান হইয়া উঠিল। সে ছলছল চোখে গোবিন্দর দিকে চাহিয়া বলিল—ঠাকুরপো, আমাদের বাড়ী নিয়ে চলো।

গোবিন্দ সমস্ত জনতা দুই হাতে ঠেলিয়া পথ করিয়া নির্ম্মল ও আভাকে লইয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। নির্ম্মল ও আভাকে আগ্‌লাইয়া লইয়া গোবিন্দ যখন চলিয়া গেল, তখন স্তব্ধ জনতার যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তারা এই বিষম কাণ্ডটা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না—নির্ম্মলকে ও গোবিন্দকে তারা প্রশংসা করিবে কি গালি দিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না—একবার গালিও দিতেছিল, আবার প্রশংসাও করিতেছিল; কিন্তু আভাকে নিন্দা ও ধিক্কার দিতেছিল সকলেই—কারণ, সে যে মেয়েমানুষ। রাসমণি বলিলেন—"তাই ত ভাব্‌তাম যে গোবিন্দ ঘরের ছেলে, সে কি এমন কাজটা কর্‌তে পারে? কিন্তু বৌ ছুঁড়ির যে পেটে পেটে এতখানি শয়তানী তা কে জান্‌ত?" গোকুল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ও লোকটা যে ভণ্ড সন্ন্যাসী তা ত স্বপ্নেও ভাবিনি, গোবিন্দ গোড়াতেই ধরেছিল কিন্তু।" মন্মথ ও হারাধন বলিল—"কিন্তু গোবিন্দটার মতিস্থির নেই—আমাদের ঠিক উল্টো চল্‌বার জন্যেই ও কোমর বেঁধে আছে—আমরা যখন সন্ন্যাসীকে ভক্তি কর্‌তাম, তখন ও কর্‌ত তাকে অপমান; আমরা যখন ভণ্ড সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিতে উদ্যত, তখন ও ভক্তিতে তার পায় লুটিয়ে পড়্‌ল!" মোহান্তের চেলারা প্রত্যেকেই গদী পাইবার অধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টায় তুমুল কলহ বাধাইয়া তুলিল, এবং দীক্ষার্থী শিষ্যরা যে কাহাকে ভক্তি করিবে তাহার ঠিক পাইতেছিল না। এ যেন কোন্ পূতনা রাক্ষসীর আগমনে রাসযাত্রার সমস্ত উৎসব ও মেলা একেবারে পণ্ড ও শ্রীহীন হইয়া গেল।

গোবিন্দর বাড়ীতে কমলা নব দম্পতিকে সাদরে আবাহন করিয়া লইয়া তাদের মিলনের আনন্দ-উৎসব সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন। সকলের বাগানের ফুল উজাড় করিয়া তোলা হইয়াছিল গুরুর চরণপূজার জন্য. তাহা এখন ব্যর্থ হইয়া ঠাকুরবাড়ীর চাঁদনীতে পড়িয়া পড়িয়া শুকাইতেছে। কেবল গোবিন্দর বাগানেই ফুল মজুদ ছিল। সে এখন এক ঝুড়ি ফুল তুলিয়া আনিয়া আভার সামনে ঢালিয়া দিয়া হাসিয়া বলিল —আজ বৌদিদির ফুলশয্যা!

তখন পাশের ঘর থেকে নির্ম্মলের মধুর কণ্ঠের গান বাড়ী ভরিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।—

আমি মজেছি মনে—
না জানি মন মজ্‌ল কিসে, আনন্দে কি মরণে!
ওগো এখন মোরে ডাকা মিছে,
আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,—
আনন্দে এই মন নাচিছে
তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে—
আনন্দে পাগল নাচিছে,
তুই শোন না ঘুঙুর রাত্রে দিনে।
আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে,—
কই সে সাগর, কই এ নদী,
তবু চল্‌ছে খবর নিরবধি,
এ তরঙ্গ দেখ্‌বি যদি
মিলা নয়ন হৃদয় সনে—
এত রঙ্গ দেখ্‌বি যদি
মিলা না মন হৃদয়-নয়নে!